প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ

আদিকাল থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ এ
পিএইচ. ডি কোর্স-এর অংশ হিসেবে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ শাহানারা হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

গুলনাহার বেগম
পিএইচ.ডি গবেষক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষনা

''প্রাচীন বাঙ্গালী রমনীর বেশ ও ভূষণঃ আদিকাল থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ ভাবে আমার একক প্রচেষ্টায় লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ পান্ডুলিপি বা ইহার কোন অংশ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সাময়িকীতে প্রকাশনার জন্য প্রদান করা হয়নি। ইহা কোন ডিপ্লোমা, ডিগ্রী অথবা বৃত্তির জন্য ইতিপূর্বে কোথাও পেশ করা হয়নি।

(গুলনাহার বেগম)
পিএইচ. ডি গবেষক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অভিজ্ঞান পত্র

মিসেস গুলনাহার বেগম কর্তৃক পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত **"প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণঃ আদিকাল থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে আমি এই মর্মে নিশ্চয় রূপে জ্ঞাত করছি যে,

ক. এই অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় লিখিত হয়েছে;

খ. এই অভিসন্দর্ভটি প্রার্থীর একক গবেষণাকর্ম এবং ইহা কোন যুগ্ম গবেষণাকর্ম নয়;

গ. এই অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম;

অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং ইহা পেশ করার জন্য আমি অনুমোদন করছি।

[illegible]
[illegible]

ডঃ শাহানারা হোসেন
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণঃ আদিকাল থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত" শিরোনামে এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে আমি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা শাহানারা হোসেন-এর নিকট থেকে নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং কর্মক্ষেত্রের বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ লাভ করেছি। তিনি আমার বহু অস্বচ্ছ, অজ্ঞাত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করেছেন এবং অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তনে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি মূল্যবান উপদেশ, নির্দেশ দিয়ে এবং তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পুস্তক দিয়ে আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা দান করেছেন। তাঁর দিক নির্দেশনা পাওয়ায় গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ এই শিক্ষিকার কাছে আমার ঋণ নিরবধি। আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আই.বি.এস.)কর্তৃপক্ষ আমাকে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে ফেলোশীপ প্রদান করে আমাকে অর্থনৈতিক সাহায্য করেছেন। গবেষণা ক্ষেত্রে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানেও এ প্রতিষ্ঠানের ঋণ অনেক। এজন্য আমি প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞতা বোধে আবদ্ধ হয়েছি। আই.বি.এস-এর পরিচালক অধ্যাপক মাহমুদ শাহ কোরেশী'র সহযোগিতামূলক দৃষ্টি আর উৎসাহ আমার গবেষণাকর্মে অনুপ্রেরণা যোগিয়েছে। প্রাক্তন পরিচালক ও বর্তমান অধ্যাপক সফর আলী আকন্দের স্নেহদৃষ্টি আমাকে একাজে উৎসাহিত করেছে। এছাড়া কোর্স ওয়ার্কে তাঁদের নিকট হতে আমি শিক্ষা ও পরামর্শ লাভ করেছি। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদ্বয় ও কর্তৃপক্ষের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

আই.বি.এস-এর নিয়ম অনুসারে এক বৎসর ব্যাপী কোর্স ওয়ার্কে আমাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পন্ডিতবর্গের নিকট বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাঠ নিতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ইংরেজীর অধ্যাপক সদরুদ্দিন আহমেদ, ইতিহাসের অধ্যাপক ও আমার গবেষণা নির্দেশক ডঃ শাহানারা হোসেন, অধ্যাপক ওয়াজেদ আলী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আ.ন.ম.সামসুল হক, সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল কাদির ভূঁইয়া, গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে ডঃ প্রীতি কুমার মিত্র ও প্রাক্তন শিক্ষক ডঃ আমিনুল ইসলাম প্রমুখ বিভিন্নভাবে আমার চিন্তা শক্তিকে প্রসারিত করেছেন।

তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা চির দিনের। আই. বি. এস-এর প্রাক্তন সিনিয়র ফেলো প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আবদুল করিম আমাকে গবেষণা বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিয়ে সাহায্য করেছেন। গবেষণা বিষয়ে কিছু উপদেশ পেয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজুল ইসলাম এর কাছ থেকে। গবেষণাকর্মে নিয়োজিত থাকাকালে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন বিজ্ঞ শিক্ষক যেমন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ডঃ এ. বি. এম. হোসেন, ইতিহাসের ডঃ আবু ইমাম, ডঃ শমসের আলী, জনাব আবদুল বারী, ডঃ আতফুল হাই শিবলী, বাংলা বিভাগের ডঃ আবদুল আউয়াল, ডঃ আবদুল খালেক, ডঃ অনীক মাহমুদ, ডঃ সফিকুন্নবী সামাদির উৎসাহ পেয়েছি। তাঁরা আমার কর্মের অগ্রগতির খোঁজখবর প্রায়শঃই নিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। এছাড়া আমার সহকর্মী চারুকলা বিভাগের শিক্ষকগণ আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যে আন্তরিকতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

আই. বি. এস-এর আয়োজিত সেমিনারে আমন্ত্রিত ভারতের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ও ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক প্রণব কুমার ভট্টাচার্যের সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। এ সময় আমি তাঁর নিকট হতে গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ ও জ্ঞান লাভ করেছি। তাঁর সহায়তাকে আমি আশীর্বাদ তুল্য গণ্য করি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন ব্যক্তিত্বের কথা আমাকে উল্লেখ করতে হয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তা রেজিষ্ট্রার জনাব ওমর ফারুক আমাকে গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মনসুর আহমেদ আমার গবেষণার অগ্রগতির খোঁজ প্রায়ই নিয়েছেন এবং উৎসাহিত করেছেন। বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার সংস্কৃতি প্রিয় জনাব মোস্তাক আলী আমার গবেষণা বিষয়টির উপর আগ্রহী হয়ে আমাকে কর্মে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর প্রশাসন ও গ্রন্থাগার শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আমাকে গবেষণাকর্মের বিভিন্ন কাজে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। আমার এ কাজের সার্থকতায় তাঁদের অবদান উজ্জ্বল হয়ে রইল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর দুর্লভ শাখায় গবেষণা তথ্য সংগ্রহ করতে আমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের

সাহায্য পেয়েছি। রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ লাইব্রেরী ও যাদুঘরে তথ্য সংগ্রহ ও প্রত্ন উপাদান নিরীক্ষণ করার সময় আমি মিউজিয়াম পরিচালক ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী এবং পাঠ কক্ষের কর্মচারীদের সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়া চারুকলা বিভাগ, ইতিহাস ও বাংলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সেমিনার কক্ষে তথ্য সংগ্রহে আমি সেমিনার সহকারীদের সাহায্য পেয়েছি সব সময়। তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের আর্কাইভস ও পাঠকক্ষে কাজ করার জন্য লাইব্রেরীর উপ-পরিচালক শাহাবুদ্দীন খান ও কর্মকর্তা ডঃ রওশন আরা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদ, সোসাইটির লাইব্রেরী পাঠ কক্ষে আমাকে তথ্য সংগ্রহের এবং পড়াশুনার জন্য সুযোগ ও সুবিধা দিয়েছেন। বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের মোহম্মদপুরে (ঢাকা) সংরক্ষিত প্রত্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ ও সংগৃহীত ফটোগ্রাফসমূহ অবলোকন করার এবং পাঠকক্ষে পাঠ নিতে সেখানকার কর্মকর্তা ও কর্মচারী আমার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন। ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত প্রত্নবস্তু সমূহ নিরীক্ষণ এবং লাইব্রেরীর দুর্লভ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নকালে যাদুঘরের গ্রন্থাগারিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী আমাকে সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ রইল। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমাকে তথ্য সংগ্রহের জন্যে কিছু অর্থ প্রদান করায় আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগার ও সংগ্রহাগারে গবেষণা তথ্য সংগ্রহকালে আমি চারুকলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুর্তজা বশীরের উপদেশ লাভ করেছি। তিনি গবেষণা সহায়ক বেশ কিছু পুস্তকের তালিকা দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতীর শিল্প নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে ও ফটোগ্রাফ নিতে আমি সেখানকার সংগ্রহশালার কিউরেটর এবং ফটোগ্রাফারের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। এছাড়া দেশের বাইরে কলিকাতাস্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পাঠকক্ষে এবং এনেক্স ভবনে কাজ করতে লাইব্রেরীর কর্মকর্তা রঞ্জিত সরকার ও অন্যান্যরা আইনানুগ ব্যবস্থা করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের পাঠকক্ষেও

কাজ করতে আমি বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলাম। কলিকাতা আশুতোষ মিউজিয়ামের প্রাচীন প্রত্নসমূহ নিরীক্ষণের সুযোগ আমাকে করে দিয়েছিলেন মিউজিয়ামের শিক্ষা কর্মকর্তা ডঃ কৃষ্ণ-জীবন ভট্টাচার্য। কলিকাতাস্থ স্টেট মিউজিয়ামের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী থেকে প্রত্নসমূহ নিরীক্ষাকালে ও ফটোগ্রাফ নিতে আমি সাহায্য পেয়েছিলাম মিউজিয়ামের কনজারভেটর ডি. দত্ত গুপ্ত এবং শান্তিনিকেতনের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র মোঃ শফিক এর কাছ থেকে। কলিকাতা ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের প্রত্নসাক্ষ্য সমূহ অবলোকন ও ফটোগ্রাফ নেয়ার জন্য মিউজিয়াম কর্তৃক সাধারণ ব্যবস্থা থাকায় এ কাজে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। উল্লেখিত দেশের ভিতরে ও বাইরের বিভিন্ন লাইব্রেরী এবং মিউজিয়ামের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অপরিমেয় সাহায্য সহযোগিতা আমি পেয়েছি। আমি তাঁদের কাছে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আই. বি. এস-এর কর্মরত মোঃ আবদুস ছালাম আকনকে। তিনি সযত্নে এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে আমার অভিসন্দর্ভটি সুন্দরভাবে টাইপ করেছেন। অভিসন্দর্ভের সংশ্লিষ্ট ছবি স্কেচিং এবং ডিজাইনে সহযোগিতা করেছেন আমার স্নেহভাজন চারুকলা বিভাগের ছাত্র শমন ও ডাইনো সোহাগ এবং প্রিন্স। তাদেরকে আমার ধন্যবাদ রইল।

আমার শ্রদ্ধেয় মা মিসেস আমেনা খাতুন আমাকে গবেষণাকর্মে সব সময়ই উৎসাহ দান করেছেন। ছোট ভাই নুরুজ্জামান এ কর্মের প্রতি সর্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমার সংসার সংগী মোঃ হামিদুল আলম এ কাজের প্রতি সদা উদ্যোগী ও সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সদিচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় আমি গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ করার অবারিত সুযোগ পেয়েছি। ওঁদের সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা স্বীকারের উর্ধ্বে। পরিবারের আলেয়া নাম্নী মেয়েটি আমার সাংসারিক কর্মকান্ডের প্রতি যত্নশীল হয়ে আমাকে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সময় তৈরীতে সাহায্য করেছে। এছাড়া পুত্র 'শুভ্র' আমার কর্ম ব্যস্ততার মাঝে অধিকাংশ সময় ধৈর্য্য ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। তাদের সুন্দর জীবনই আমার কাম্য।

গুলনাহার বেগম, ৪/০২/৯৫

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সমাজের রীতিসিদ্ধ, চিরাচরিত ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। সভ্যতার সূচনা থেকে প্রাকৃতিক নিয়মেই পোষাক পরিচ্ছদ নারী পুরুষ সকল মানব-জাতির প্রয়োজন হয়েছিল। তাই আদিকাল থেকে মানুষ দেহকে প্রথমে গাছের পাতা, ছাল, পাখীর পালক, জীবজন্তুর চামড়া ইত্যাদি দিয়ে আবৃত করেছিল। ক্রমে পোষাক পরিধানের জন্য বস্ত্রের উদ্ভাবন এবং সভ্য জীবনের অগ্রযাত্রা হয়েছে।

বেশ ভূষণের ব্যবহার মানব জীবনের একটি সামাজিক বিধান যা মানুষকে আত্মমর্যাদা ও সুশোভিত করে। মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ তার পোশাক আষাকের মাঝেই। তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে মানুষের ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাষা, ধর্ম, সমাজ, শিল্প। বেশ ও ভূষণের মাঝে মানুষের রুচিবোধ ও সৌন্দর্য জ্ঞান সম্পর্কিত। আর যে কোন রুচিশীল, সুন্দর বিষয় শিল্প অনুভূতির প্রকাশ। সুতরাং বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে আমার গবেষণা-কর্মটি প্রাচীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানতে সহায়ক হতে পারে। এ বিষয়ে তথ্যবহুল ইতিহাস অদ্যাবধি পাওয়া যায়না। ঐতিহাসিকগণ তাঁদের ইতিহাস রচনায় এই বিষয়টিকে আংশিক মাত্রায় আলোচনা করেছেন। দেখা যায়, ইতিহাসমাত্রই রাজা-বাদশাগণের উত্থান-পতন, সাফল্য, ব্যর্থতার কাহিনী বা দেশের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা। এ বিষয়-গুলির মধ্যে সীমিত ইতিহাসে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, শিল্প, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট থেকে যায়। "প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণঃআদিকাল থেকে ১২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত" এ শিরোনামে তথ্য নির্ভর গবেষণার মাধ্যমে আমি সেকালের রমণীদের বেশ ও ভূষণে প্রতিফলিত সামাজিক রীতি, চিন্তাচেতনা ও সৌন্দর্যানুভূতির একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

শিল্পী, বণিক, ব্যবসায়ী, ভূমিবান, ভূমিহীন, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, সমাজসেবক অকীর্তিত জনসাধারণ সকলকে নিয়েই ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ। তাদের দ্বারা গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, অর্থ, শিল্পসাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুই। মানুষের এই কর্ম সমূহের একটি অন্য আর একটি কর্ম হতে বিচ্ছিন্ন নয়। বাঙালী রমণীর বেশ ভূষণের পাশাপাশি এই কর্মগুলি সমাজ জীবনের পরিচয় দিয়ে থাকে। রাষ্ট্র ও রাজা ছাড়া যেমন সমাজ ব্যবস্থা চলতে

পারেনা। তেমনি অর্থনৈতিক ব্যবস্হাও রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য বিষয়। আবার শিল্প সাহিত্য প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কেননা সামাজিক বিষয়াদি যা কিছুই হউক না শিল্প সাহিত্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন প্রাচীন প্রত্নসাক্ষ্য পোড়ামাটির ফলক, মূর্তি, চিত্রসম্বলিত পান্ডুলিপি, তাম্রলিপি প্রশস্তিতে, সাহিত্যে, সমাজের ধর্মবিশ্বাস, দেবদেবী, পূজানুষ্ঠানের কথা, বর্ণ, জাতি, রাষ্ট্র, অর্থ, সম্পদ, সাজ-পোশাক, অলঙ্কার, বিলাসিতার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ অর্থাৎ সমাজ জীবনের এই বিশেষ দিকটির কথা জানতে হলে দেশের ভৌগোলিক অবস্হা জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বাংলার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের বায়ু ও নদ-নদী দেশের অধিবাসীকে গড়ে তুলেছে। নদ-নদীগুলির গতি পথের দ্বারা নির্ণীত হয়েছে প্রাচীন জনপদসমূহ ও রাষ্ট্র। খাল-বিল, নদ-নদীবিধৌত নিম্নভূমি, বন-জঙ্গল, সমুদ্রোপকূল সবকিছুই এদেশের সমাজ বিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। তাই প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক পরিচয় এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া তৎকালীন রাজনৈতিক রূপ রেখার প্রতি আলোকপাত করেছি। এ অধ্যায়ে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্হার কথাও তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন বাংলার রাজা ও রাষ্ট্র বিন্যাসের স্বরূপ, বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক আদর্শ, রাষ্ট্র প্রধানদের পরিচয়, রাষ্ট্রের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্হার মান, ধর্ম-কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়াও হয়েছে এ অধ্যায়ে। বাংলার রাষ্ট্র ও রাজবংশের বেশীর ভাগ উপাদান যোগিয়েছে প্রাচীন লেখমালা। এর অধিকাংশই রাজকবি বিরচিত রাজবংশের প্রশস্তি অথবা মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি। এছাড়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, সাহিত্যিক উপাদান প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে জানার মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। সুতরাং প্রথম অধ্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উৎসের উল্লেখ আছে।

অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সমূহের প্রাপ্তি স্হানগুলি বিশেষতঃ বাংলাদেশের পাহাড়পুর, মহাস্হানগড়, ময়নামতী এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পান্ডুরাজার

ঢিবি ও চন্দ্রকেতুগড়ের অবস্থানসহ প্রত্ন নিদর্শনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহে প্রাপ্ত এবং বাংলাদেশের ও ভারতের বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত প্রত্নসাক্ষ্যের বিশ্লেষণ করে বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের তথ্যের ও চিত্রের উপস্থাপন করেছি। এই অধ্যায়ে প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কিত লিপি সাক্ষ্যেরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবনের অভিব্যক্তি ধরা পড়ে সমসাময়িক সাহিত্যকর্মে। এই সকল সাহিত্য গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ করে অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে সমসাময়িক সাহিত্যে উল্লেখিত রমণীর বেশ ও ভূষণের আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে প্রত্নউপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে বেশ ও ভূষণের বৈশিষ্ট্যাবলী এবং সমকালীন ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চলের রমণীর বেশ ভূষার সাথে বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করেছি। আমাদের জীবনের সৌন্দর্যবোধ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বিষয়বস্তু, বেশবাস, কেশবিন্যাস, দেহে অলংকার ব্যবহার, মুখের প্রসাধন সব কিছুতেই সৌন্দর্য রয়েছে। সৌন্দর্য বাসুর স্বরূপেরই অভিব্যক্তি। সুতরাং বেশ ও ভূষণের সমাজতাত্ত্বিক ও নন্দনতত্ত্বের পর্যালোচনা করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে। অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহারে গবেষিত বিষয়ের আলোকে রমণীর বেশ ও ভূষণের মূলগত বৈশিষ্ট্য, ধারা, সৌন্দর্য এবং ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দাঁড় করেছি। পরিশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা ও বিশ্লেষিত তথ্য নির্ভর প্রত্নসাক্ষ্য সমূহের চিত্র সংযোজিত হয়েছে।

সূচীপত্র

ঐ

সূচী/২

পৃষ্ঠা নং-

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

চিত্রসূচী

মানচিত্র — ক — প্রাচীন বাংলার জনপদ বিভাগ।

" — খ — বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গঃ প্রত্নাবশেষের অবস্থান।

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
১	পাখির ঠোঁট আকৃতির মাথা বিশিষ্ট রমণী	পান্ডুরাজার ঢিবি	S.S. Biswas, <u>T.A.B.</u>, pl. Ib, p. 149 (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
২ক	ডানাযুক্ত* যক্ষী রমণী	চন্দ্রকেতুগড়	" " pl-L-b, p. 186 (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
২খ	ডানাযুক্ত* রমণী	ঐ	" " pl. L-C, p. 186. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৩ক	হাত-পা-মাথাবিহীন রমণী মূর্তি	ঐ	" " pl. VI, p. 156. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৩খ	শিশু ও মা	ঐ	" " pl. XXXIb, p. 169 (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৪ক	যক্ষী রমণী	ঐ	" " pl. XVIIIb, p. 162.
৪খ	যক্ষী রমণী	ঐ	" " pl. XXb, p. 163. (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
৪গ	রমণীর মস্তক	ঐ	" " pl. IVa, p. 155. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৫ক	লক্ষী দেবী	ঐ	" " pl. IXa, p. 157. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৫খ	মাছ হাতে রমণী	ঐ	" " pl. XXXI, p. 170. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৫গ	রমণীর নিম্নাঙ্গ	ঐ	"" " pl. XXXI, p. 169. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৬ক	অলংকার পরিহিতা রমণীর মস্তক	ঐ	" " pl. XXVIIa, p. 166. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৬খ	টাসেল জাতীয় হার পরিহিতা রমণী	ঐ	" " pl. XXXVIb, p. 174. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
৬গ	পঞ্চলহর হার পরিহিতা রমণী	চন্দ্রকেতুগড়	S.S.Biswas, <u>T.A.B.</u>, Fig. 23, p. 125. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৬ঘ	রমণীর ভগ্নচিত্র	ঐ	" " pl. XXXVI-C, p. 174. (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
৭ক	যক্ষী রমণী	ঐ	" " pl. XXV, p. 165. (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
৭খ	রমণীর অলংকৃত খোঁপা	ঐ	" " pl. XXXIVC, p. 172. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৭গ	যক্ষী রমণী	ঐ	" " pl. XXIV, p. 165. (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
৮ক	অগ্নির সংগী রমণী	ঐ	" " pl. XIVb, p. 160. (ন্যাশনাল মিউজিয়াম, দিল্লী)
৮খ	রমণীর মস্তক	ঐ	" " pl. LVI a, p. 189. (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
৮গ	রমণীর মস্তক	ঐ	" " pl. LVIb, p. 190. (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
৯ক	সিঁড়িতে রমণী	ঐ	" " pl. XLV-C, p. 181. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৯খ	কলসী হাতে রমণী	ঐ	" " pl. LVIIId, p. 191. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৯গ	প্রসাধনরতা রমণী	ঐ	" " pl. XXXVIIa, p. 175. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৯ঘ	প্রসাধনরতা রমণী	ঐ	" " pl. XXVIIb, p. 176. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
১০ক	পাদুকা	ঐ	" " pl. XXXVVIC, p. 175. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
১০খ	পাদুকা	ঐ	" " pl. XXXVVId, p. 175. (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব গ্যালারী, কলিকাতা)
১০গ	দামী পোষাক পরিহিতা রমণীর নিম্নাঙ্গ	ঐ	" " pl. XXVIIIb, p. 167. (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
১১ক	জলকুম্ভ ধৃতা দন্ডায়মান রমণী	চন্দ্রকেতুগড়	নীহাররঞ্জন রায়, <u>বাঙ্গালীর ইতিহাস</u>, দে'জ প্রকাশনা, চিত্র - ২০। (আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা)
১১খ	রমণীদের ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র আকৃতির চুলের কাঁটা	ঐ	S.S. Biswas, <u>T.A.B.</u> Fig. 42, p. 132.
১২-১৫	বিভিন্ন রং-এর মূল্যবান পাথরের গুটিকার অলংকার	ঐ	" " " (পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব সরকারের গ্যালারী, কলিকাতা)
১৬	দম্পত্তি চিত্রে রমণী	মহাস্থানগড়	<u>A.S.I.A.R.</u> 1936-37. (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা),
১৭ক	মুকুট পরিহিত রমণীর মস্তক	ঐ	" " pl. Xv, d (এন. আহমেদ, <u>মহাস্থানগড়, ময়নামতী, পাহাড়পুর</u> চিত্র নং- ৪)।
১৭খ	পোড়ামাটির ফলকে শুঙ্গযুগীয় দেবী	ঐ	" " "
১৮	বৃহৎ মুকুট এবং অলংকার পরিহিতা গন্ধর্বী	ঐ	যাদুঘর, বগুড়া।
১৯ক	মায়াদেবী	ঐ	S.S.Biswas, <u>T.A.B.</u>, pl. LXi,a, p. 193.
১৯খ	হর গৌরী মূর্তি	ঐ	S.Hussain. <u>E.L.P.E.</u>,pl.LVI,I.
২০ক	শিব ও দুর্গামূর্তি	ঐ	" " pl. LVI, 2
২০খ	নাগিনী	ঐ	" " pl. LVIII, 1.
২১ক	অষ্টধাতুর বলয়	ঐ	এন. আহমেদ, <u>মহাস্থান, ময়নামতী, পাহাড়পুর</u>, চিত্র-৫।
২১খ	অলংকারের ছাঁচ	"	" " " " "
২২	প্রণয়রত রমণী(প্রস্তর)	পাহাড়পুর	S.K. Saraswati, <u>E.S.B.</u> pl. III, 10
২৩	যমুনা দেবী ও সংগী রমণী	ঐ	" " pl. IV, 13.
২৪	শিবের বিষপান দৃশ্যে রমণী	পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দির	" pl. V, 14

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
২৫	শিবের সংগী রমণীদ্বয়	পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দির	S.K. Saraswati, E.S.B., pl. V, 14.
২৬	নৃত্যরতা রমণী	কেন্দ্রীয় মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব দেয়াল	" " pl. XIII, 31.
২৭ক	নৃত্যরতা রমণী	ঐ	M.A.S.I., No. 55, pl. XXIX,d
২৭খ	যুগলমূর্তিতে রমণী	ঐ	" " pl. XXXVII,b
২৮	প্রণয়রত রমণী	পাহাড়পুর	" " pl. XXXVII,a
২৯ক	যম ও সংগী রমণী	ঐ	" " pl. XXXII,a
২৯খ	পদ্ম পানির সংগী রমণী	ঐ	" " pl. XXXIV,c
৩০	মনসা দেবী	ঐ	" " pl. XXXVII,a
৩১ক	হরগৌরীর যুগল মূর্তিতে গৌরী	ঐ	" " pl. LVIII,a,
৩১খ	মস্তকবিহীন রমণী মূর্তি	ঐ	" " pl. XXVIII,f
৩২	শাড়ী পরিহিতা দন্ডায়মান তারা	ঐ	" " pl. XLV, d.
৩৩ক	চলমান রমণী	ঐ	[illegible]. S. Hussain, S.L.W.E.M.B., pl. IX,1.
৩৩খ	শিশুর সঙ্গে রমণী	ঐ	" " pl. VI,I
৩৪ক	ওড়না পরিহিতা চলমান রমণী (সম্ভবতঃ তারা)	ঐ	" " pl. VI,2
৩৪খ	নৃত্যরতা রমণী	ঐ	" " pl. 11, 2
৩৪গ	নৃত্যরতা রমণী	ঐ	" " pl. II, 1
৩৫ক	বালি ও সুগ্রীব কর্তৃক অপহৃত রমণী (তারা)	ঐ	M.A.S.I., No. 55, pl. XXXIII,a.

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
৩৫খ	কটি হস্ত রমণী	পাহাড়পুর	S. Hussain, S.L.W.E.M.B., pl. IX,2.
৩৫গ	ঐ	ঐ	" " pl. IX, 3
৩৬ক	ওড়না পরিহিতা নৃত্যরতা রমণী	ঐ	M.A.S.I., No. 55, pl. XLI, C.
৩৬খ	কূপ হতে জল উত্তোলনরতা রমণী	ঐ	" " pl. XLIII,b
৩৭ক	পায়জামা পরিহিতা রমণী	ঐ	" " pl. XXXIX,e.
৩৭খ	বৃহৎ খোঁপা বাঁধা রমণী	ঐ	" " pl. XLIII, i.
৩৭গ	পায়জামা পরিহিতা চলমান রমণী	ঐ	" " pl. XLIII, i.
৩৮ক	যুগল মূর্তিতে চুড়া খোঁপা বাঁধা রমণী	ঐ	" " pl. XLVII,f.
৩৮খ	শবর দম্পত্তি চিত্রে খোঁপা বাঁধা শবরী রমণী	ঐ	" " pl. XLIX, e.
৩৯ক	পত্রের কটিবন্ধনী পরিহিতা দম্পত্তি চিত্রে শবরী	ঐ	" " pl. XLIX,e.
৩৯খ	উপবীত ও দেহে পাতার পোষাক পরিহিতা শবরী	ঐ	" pl. XLIX, f.
৪০	বক্ষবন্ধনী পরিহিতা শবরী	ঐ	" " pl.XLIX,b.
৪১ক	খোঁপা এবং কটিবন্ধনী পরিহিতা শবরী	ঐ	" " pl. XLIX,f.
৪১খ	যুগল দৃশ্যে খোঁপায় অলংকার পরিহিতা দন্ডায়মান শবরী	ঐ	" " pl. XXXIV,b.
৪২ক	দুরজার নিকট দন্ডায়মান খোঁপাবাধা রমণী	ঐ	" " pl. XL,e.
৪২খ	খোঁপাবাঁধা রমণী	ঐ	" " pl. XXXIX,d.
৪২গ	শাড়ী পরিহিতা তারা	ঐ	" " pl. XLIV,e.

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
৪৩ক	বক্ষবন্ধনী পরিহিতা রমণী (নাগিনী)	পাহাড়পুর	M.A.S.I., No. 55, pl. XLV,e.
৪৩খ	গন্ধর্ব দম্পত্তি চিত্রে নকশা-যুক্ত বসন পরিহিতা রমণী	ঐ	" " pl. XLVII,c.
৪৪ক	ওড়না পরিহিতা রমণী (বলরামের সংগী)	ঐ	S.K. Saraswati, E.S.B., pl.III,10.
৪৪খ	ওড়না পরিহিতা কৃষ্ণের সংগী রমণী	ঐ	" " pl. XXVIII,c.
৪৫ক	রঙিন টুপি পরিহিতা রমণী	ঐ	M.A.S.I., No. 55, pl. XXXIX.,c
৪৫খ	দম্পত্তি চিত্রে চূড়াখোঁপা বাঁধা রমণী	ঐ	" " pl. XLI,a
৪৫গ	ফিতা বাঁধা রমণীর বৃহৎ খোঁপা	ঐ	" " pl. L,d.
৪৬ক	বাসুদেবের সংগী খোঁপাবাঁধা রমণী	ঐ	" " pl. XXXIII.d.
৪৬খ	অপহৃত খোঁপাবাঁধা রমণী	ঐ	" " pl. XXXIII,c.
৪৭	সূর্য দেবতার সংগী রমণী	ময়নামতী	B.C.Law Volume, part.II, pl. IV.
৪৮ক	নকশী পায়জামা পরিহিতা পতাকা হাতে রমণী	ঐ	" " pl. XV,b.
৪৮খ	খোঁপায় অলঙ্কার পরিহিতা বিদ্যাধরী রমণী	ঐ	" " pl. IX,2.
৪৯ক	চিন্তাশীল রমণী	ঐ	" " pl. X.8.
৪৯খ	ওড়না পরিহিতা রমণী	ঐ	" " " (ময়নামতী যাদুঘর)
৪৯গ	শাড়ী পরিহিতা রমণী	ঐ	" "(ময়নামতী যাদুঘর)
৫০	পাথরের গুটিকার মালা পরিহিতা নারী মূর্তি	ঐ	" " " "
৫১	বড় পাথরের গুটিকার মালা ও তামার অলঙ্কার	ঐ	" " " "

চিত্র	বর্ণনা	স্হান	উৎস
৫২	বড় ও ছোট পাথরের গুটিকার বৃহৎ ঝুলন্ত লকেটসহ মালা	ময়নামতী	" ময়নামতী যাদুঘর
৫৩ক	মা ও শিশু	মহাস্হান	মহাস্হান যাদুঘর
৫৩খ	দম্পতি ভাস্কর্যে রমণী	ঐ	" "
৫৪	দেবী	অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পান্ডুলিপি চিত্র	সরসীকুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, চিত্র ৮, পৃ. ৪৭ (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহাগার)
৫৫	তারা দেবী	ঐ	" " চিত্র, ১৪, পৃ. ৬৫। (ভারত কলা ভবনের সংগ্রহাগার)
৫৬খ	মহিষমর্দিনী দেবী	ঐ	সরসী কুমার সরস্বতী, পালযুগের চিত্রকলা, চিত্র-৬, (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহাগার)
৫৬গ	দেবী মারীচীর বিমূর্তি	ঐ	S. Hussain, E.L.P.E., pl. LXXI.
৫৬ক	কাপড়ের নকশা	অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রিত পান্ডুলিপি	" " pl. LXXVIII-LXXXIII (original source V and A Museum, Room 41, Bay 1)
৫৭, ক ও খ	"	ঐ	" " "
৫৮ ক ও খ	"	ঐ	" " "
৫৯ ক ও খ	"	ঐ	" " "
৬০ ক ও খ	"	ঐ	" " "
৬১ক	মন ঠোকরানো হংস	চন্দ্রকেতুগড়	S.S. Biswas T.A.B., pl. XLVII,a
৬১খ	গুটিকার মালা ঠোঁটে হংস	মহাস্হান	J.D.M. vol. 1, 1975 pl. VII, fig.7.
৬২	অলঙ্কারের নকশা	মহাস্হানগড়, ময়নামতী ও পাহাড়পুর	M.A.S.I., No. 55, B.C. Law, Vol. II and A.S.I.A.R.
৬৩ক	গঙ্গাদেবী	দেওপাড়া, রাজশাহী	বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম, বাংলাদেশ, ভাস্কর্য-৩৫৪।

চিত্র	বর্ণনা	স্হান	উৎস
৬৩খ	রমণী	পাহাড়পুর	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘর
৬৪ক	বিনাবাদিনী সরস্বতী	২৪ পরগণা	আশুতোষ মিউজিয়াম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৬৪খ	লক্ষী দেবী	ঐ	" " " "
৬৫ক	নৃত্যরতা রমণী	মোহেনজোদড়ো	S.K. Saraswati, A.S.I.S., pl.II, fig. 18. (ন্যাশনাল মিউজিয়াম, নিউ দিল্লী)
৬৫খ	রমণী	ঐ	M.K. Dhavalikar, M.I.T. pl.IV (A.S.I. New Delhi)
৬৬ক	রমণীর কেশবিন্যাস	ঐ	S.K. Saraswati, A.S.I.S., pl. I, fig. 5.
৬৬খ	রমণীর বৃহৎ মস্তকাবরণ	বুলেন্দীবাগ	A.L. Basham, W.T.W.I., pl. LXII, a
৬৬গ	আলখাল্লা পরিহিতা রমণী	মোহেনজোদড়ো	S.Sahay. I.C.C.O., pl.II, fig.10.
৬৬ঘ	পূর্ণহাতা জামা পরিহিতা রমণী	ঐ	" " " pl.II, fig. 9.
৬৭ক	ঘাঘরা পরিহিতা নৃত্যরতা রমণী	ঐ	" " " pl.V, fig.25 (পাটনা মিউজিয়াম)
৬৭খ	শাড়ী পরিহিতা যক্ষী রমণী	দিদারগঞ্জ	S.K. Saraswati, A.S.I.S., pl.IX, fig. 47. (পাটনা মিউজিয়াম)
৬৮ক	চুলকোকা দেবী	ভারহুত	A.L. Basham, W.T.W.I., pl. XXV (ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা)
৬৮খ	দন্ডায়মান যক্ষী	ঐ	Charles, L. Fabri, D.I.S., pl.5
৬৯ক	শাড়ী পরিহিতা রমণী	গান্ধার	S. Sahay., I.C.C.O., pl.XVI, fig. 98.
৬৯খ	ঐ	ঐ	" " " pl.XVI, fig.99.
৬৯গ	ঐ	ঐ	Motichandra, C.T.C.C., fig.38
৬৯ঘ	ঐ	ঐ	" " " fig. 46.

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
৭০ক	শাড়ী পরিহিতা রমণী	গান্ধার	Motichandra. <u>C.T.C.C.</u>, fig. 49.
৭০খ	দোপাট্টা পরিহিতা রমণী	মথুরা	" " " fig. 72B
৭০গ	শাড়ী পরিহিতা রমণী	ঐ	" " " fig. 80
৭০ঘ	শাড়ী পরিহিতা রমণী	ঐ	" " " fig. 74.
৭১ক	কঞ্চুকী পরিহিতা রমণী	সমুদ্র গুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা	A.S. Altekar. <u>P.W.H.C.</u>, pl.V,B.
৭১খ	লক্ষী দেবী শাড়ী পরিহিতা	ঐ	Motichandra. <u>C.T.C.C.</u>, fig. 120.
৭১গ	শাড়ী পরিহিতা রমণী	পাটনা	S.Sahay., <u>I.C.C.O.</u>, fig. XV, pl. 93.
৭১ঘ	ওড়না পরিহিতা নৃত্যরতা রমণী	উড়িষ্যা	" " " fig. 146.
৭২ক	ঘাঘরা পরিহিতা রমণী	অজন্তা	Motichandra. <u>C.T.C.C.</u> fig. 128.
৭২খ	বক্ষবন্ধনী পরিহিতা রাজার সহচরী	ঐ	" " " fig. 123.
৭২গ	পরিচারিকা	ঐ	" " " fig. 153.
৭২ঘ	নৃত্যরতা রমণী	ঐ	" " " fig. 160.
৭৩ ক,খ,গ, ঘ,ঙ,চ,ছ	মধ্য, পূর্ব-দক্ষিণ ভারতীয় রমণীর কেশবিন্যাস	সাঁচী, ভারহুত, উড়িষ্যা এবং অজন্তা	S.Sahay., <u>I.C.C.O.</u>, fig. 81,83,86,144,145, Motichandra. <u>C.T.C.C.</u>, fig. 101, 104.
৭৪ক	তারা দেবী	উড়িষ্যা	S.Sahay. Pl. XXVIII, fig. 143.
৭৪খ	কুমারী দেবী	(Colgong)	" " " pl. XIX, fig. 114.
৭৪গ	লক্ষী দেবী	বুদ্ধগয়া রেলিং	" " " pl.VIII, fig.42.
৭৪ঘ	সুসজ্জিতা রমণী	পাটনা	" " " pl.VIII, fig.41.
৭৫ক	লেখনীরতা রমণী	খাজুরাহো	A.L. Basham. <u>W.T.W.I.</u>, pl. XLIX.
৭৫খ	গঙ্গা দেবী	কর্ণাটক, (মহানদ)	C.Savarama Murty. <u>I.S.</u>, pl. 43.
৭৬ক	পাবতীর খোঁপা	অহিচ্ছত্র	S.K. Saraswati. <u>A.S.I.S.</u>, pl.XXVIV, fig. 133.
৭৬খ	অলঙ্কৃত খোঁপা	গোয়ালিওর	" " " pl.XXII, fig.98.
৭৭ক	পুষ্পখচিত মস্তকাবরণ	রাজগড়, (বিকানীর)	C.Savarama Murty. <u>I.S.</u>, pl. 36.

চিত্র	বর্ণনা	স্থান	উৎস
৭৭খ	উপবিষ্টা রমণী	অজন্তা	A.L. Basham. W.T.W.I., pl. LXXIX.
৭৮ ক,খ,গ, ঘ,ঙ,চ,ছ, জ,ঝ,ঞ,	রমণীর মস্তকাবরণ ও কেশবিন্যাস	মোহেনজোদড়ো, হরপ্পা, গান্ধার কোশাম্বী ও অজন্তা	S.Sahay. I.C.C.O. fig. 3,14,13,49,50,56, Motichandra. C.T.C.C. fig. 28,36,42,45.
৭৯ ক,খ	অলঙ্কৃত কেশবিন্যাস	খাজুরাহো	A.S. Altekar. P.W.H.C., pl. X,XI.
৭৯ গ,ঘ,ঙ,চ	খোঁপা বাঁধা রমণী	অমরাবতী	K.Krishna Murty.G.A.A.R.L., pl. II,fig.1,9. pl.III, fig.2,5.
৮০ ক,খ,গ ঙ,চ,ছ	ভিন্ন ধাঁচে রমণীর কেশবিন্যাস	ঐ	" " " pl.II,fig.3,11, 12, pl.III,fig.4,8,13,17.
৮১ক	ঘাঘরা পরিহিত রমণী	তাম্রলুক	S.S. Biswas. T.A.B., pl.V.
৮১খ	ফিতাবাঁধা শালাকৃতি কেশবিন্যাস	ঐ	" " " fig.5,p.115.
৮১গ	ঘন্টাশতাকৃতি অলঙ্কার পরিহিতা রমণী	ঐ	" " " pl. XVII.
৮২ ক,খ,গ, ঘ,ঙ	রমণীর কটিবন্ধ, মুক্তাবলী পেঁচানো হার, ললাটিকাযুক্ত খোপা, পাদুকা ও যক্ষী রমণী	ঐ	" " " fig.28,p.122, fig.26,p.126, fig.27,p.127. pl.IV,b, pl.XXXVII,c pl.XIX.
৮৩ক	স্বচ্ছ শাড়ী পরিহিতা রমণীর নিম্নাংশ	ঐ	" " " pl.LXV.
৮৩খ	পাটকা পরিহিতা রমণী	ঐ	" " " pl.XXXVII,b.
৮৩গ	পত্র কুন্ডল " "	চন্দ্রকেতুগড়	" " " fig.17,p.122.
৮৩ঘ	বৈজয়ন্তীকা হার " "	ঐ	" " " fig.25,p.125.
৮৪ক	প্রসাধণরতা রমণী	পাহাড়পুর	S.Sahay.I.C.C.O., fig.130.
৮৪খ	প্রসাধনরতা রমণী	মথুরা	C.Fabri. D.I.S., pl.II.
৮৫	আয়না হাতে রমণী	খাজুরাহো	" " " 39.
৮৬	রাজ্ঞীর প্রসাধন	অজন্তা	(অজন্তার গুহাচিত্র), G. S. Ghurye, Indian Costume, fig. 256
৮৭, ৮৮	ভারতীয় রমণীর বিভিন্ন নক্সার অলঙ্কার	হরপ্পা, মোহেনজোদড়ো গান্ধার, মথুরা, সাঁচী, অজন্তা,	

(Abbreviations) শিরোনাম সংক্ষেপ

A.S.I.	- Archaeological Survey of India
A.S.I.A.R.	- Archaeological Survey of India, Annual Reports.
A.S.I.R.	- Archaeological Survey of India Reports
A.S.I.S.	- A Survey of Indian Sculpture
B.A.	- Bangladesh Archaeology
B.C.Law Volume	- Bimla Churn Law Volume
C.T.C.C.	- Costume, Textiles, Cosmetics & Coiffure
B.L.K.J.D.M.	- Bangladesh Lalit Kala (Journal of the Dacca Museum)
D.I.S.	- Discovering Indian Sculpture
D.M.B.	- Discover the Monuments of Bangladesh
D.R.B. Volume	- D.R. Bhandarkar Volume
E.I.	- Epigraphia Indica
E.L.P.E.	- Everyday Life in the Pala Empire
E.S.B.	- Early Sculptures of Bengal
G.A.A.B.L.	- Glimpes of Art, Architecture and Buddhist Literature in Ancient India.
H.A.B.	- History of Ancient Bengal
H.B.	- History of Bengal
H.G.B.	- Historical Geography of Ancient and Early Meadiaeval Bengal
J.A.S.B.	- Journal of the Asiatic Society of Bengal Calcutta.
J.A.S.B.	- Journal of the Asiatic Society of Bangladesh
J.A.S.P.	- Journal of the Asiatic Society of Pakistan

I.C.C.O.	– Indian Costume Coiffure and Ornament
I.S.	– Indian Sculpture
M.A.S.B.	– Memoirs of the Asiatic Society of Bengal
M.A.S.I.	– Memoirs of the Archaeological Survey of India
M.I.T.	– Masterpieces of Indian Terracottas
P.W.H.C.	– The Position of Women in Hindu Civilization
S.L.W.E.M.B.	– The Social Life of Women in Early Medieval Bengal
T.A.B.	– Terracotta Art of Bengal
V. and A Museum	– Victoria and Albert Museum
V.R.S.M.	– Varendra Research Society's Museum.
W.T.W.I.	– The Wonder that was India

প্রথম অধ্যায়

(ক) প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট ও জনপদ সমূহঃ

প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ বিষয়ে জ্ঞান লাভের ভূমিকা হিসেবে আমাদের বাংলা নামে ভূখণ্ডের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট ও জলবায়ুর সাথে পরিচয় প্রয়োজন। এর কারণ মানুষ যে ভূখণ্ডের অধিবাসী সে ভূখণ্ডের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ু তার বেশ ও ভূষণের প্রকৃতি কি হবে তা বহুলাংশে নির্ধারিত করে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বাংলার প্রাচীন যুগের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা। কারণ স্বাভাবিক নিয়মেই প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ তার সামাজিক আচার, আচরণ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তাছাড়া যে সকল আকর উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের পরিচয় তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা যায় সেইসব আকর উৎসের সম্পর্কেও আমাদের কিছু আলোচনা আবশ্যক।

কোন জাতির ইতিহাসকে জানতে হলে প্রথমেই দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের উপর দৃষ্টিপাত করতে হয়। কারণ দেশের বস্তুগত রূপ বহুল পরিমাণে দেশানুগত মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, সাধনা, সংস্কৃতি, আহার-বিহার, বসন-ব্যসন, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নির্ণয় করে থাকে। কাজেই জীবন ও কর্মের কথা বলার আগে বস্তুগত ভৌগোলিক পরিচয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।[১] মানুষ সবসময়ই দেশ, কাল, পাত্রভেদে ভিন্ন এবং এই বহু বিচিত্র ভূ-প্রকৃতির সমন্বিত ভূমির সঙ্গে মানুষের ইতিহাস বিজড়িত। যেমন এক ভূ-খণ্ডের কিছু অংশ যখন জঙ্গলময়, অনুর্বর মূল ভূমির সমাজ সংস্কৃতি থেকে পৃথক, প্রাগৈতিহাসিক জীবন নির্ভর ও বিচ্ছিন্ন বসতির সমাবেশ অন্য খণ্ড তখন আকর্ষণ কেন্দ্র ঘনতর মানুষের বসতি উন্নত কৃষি নির্ভর জীবনে কর্মরত। জীবন ধারণের বস্তুগত উপকরণ, উপাদান, উৎপাদন পদ্ধতির তফাতের কারণে এই দুই ক্ষেত্রের ইতিহাস ভিন্ন।[২] এভাবে অনন্তকাল থেকে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে

---

১ নীহাররঞ্জন রায়। বাঙালীর ইতিহাস, ১ম প্রকাশ, (কলিকাতাঃ বুক এমপোরিয়াম, ১৩৫৬), পৃ. ৮২।

২ গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইতিহাস অনুসন্ধান-৪, (কলিকাতাঃ কে,পি, বাগচী এন্ড কোং, ১৯৮৯), পৃ. ১৪-১৫।

বর্তমানকালের সভ্যতায় এসে পৌঁছেছে। তাই ভূ-প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে প্রাচীন বাঙ্গালীর জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভৌগোলিক সীমা বৈচিত্র বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং দেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে বা জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করেছে।

এককথায় জাতির ইতিহাসের সাথে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কীর্তিকলাপ এবং তার অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে একথা সকলেই স্বীকার করেছেন।[১] ইমানুয়েল কান্টের মতে, মানুষের কর্মকাণ্ড এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে সংঘটিত হয়। তাই ভূগোলই ইতিহাসের ভিত্তি।[২] তবে বাংলার ভৌগোলিক সীমার তথ্য নির্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। প্রাচীনকালে কতবার যে দেশের রাষ্ট্রীয় সীমার পরিবর্তন হয়েছে, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। পুরাকালে চীন, রুক্ষ, কলিংগ, প্রাগজ্যোতিষ , আরাকান, ত্রিপুরা প্রভৃতি নানাদেশ এই ভূভাগের ভিন্ন ভিন্ন অংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করে এ দেশের রাষ্ট্রীয় কলেবরকে যুগে যুগে বহুধা বিভক্ত ও বিচিত্র বর্ণে লাঞ্ছিত করেছে।[৩] কিন্তু আমাদের কাছে এমন কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সূত্র নেই যা থেকে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক রূপরেখা রচনা করা সহজসাধ্য হবে। এক্ষেত্রে আমাদের মূলতঃ নির্ভর করতে হবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সাহিত্যিক উপকরণ ও ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রলিপিও মন্দিরে উৎকীর্ণ উৎসর্গ লিপিসমূহের উপর। মূলতঃ লিপিমালার উপরই অধিক নির্ভরশীল হতে হয়। তবে লিপিমালায় সন্নিবেশিত তথ্যের একটি বাস্তব ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও একথা বলতে হয় এ তথ্য অপ্রতুল। এই স্বল্প তথ্যের আলোকেই সামাজিক জীবনে ভৌগোলিক পরিচয় দান করা যায়। দেখা যায় একদিন বাংলার আদিকালে বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতা প্রধানতঃ আদর্শবাদী কল্পনাপ্রবণ সাহিত্য, পণ্ডিত, পুরোহিতের ধর্মীয় পুঁথিপত্র

---

১ আনিসুজ্জামান সম্পাঃ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১।

২ H.C. Darby, Approaches to History, (London: 1262), P. 155.

৩ শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎবংগ, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ বাং), পৃ. ১২।

দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। এরূপ একটি পশ্চাৎপদ মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননকার্য এবং পুরাতত্ত্ববিদদের আগ্রহ, অনুশীলনে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুণরুদ্ধার সফল হয়েছিল। ফলে প্রত্নের আবিস্কার প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের মূল সূত্রটি খুঁজে পেতে সহায়ক হয়। বিশেষতঃ একটি বিষয়ে স্পষ্ট চিত্র ধরা পড়ে তা হল, 'বাংলার ইতিহাসের বিবর্তন ঘটেছে অতি ধীরে সমাজ প্রকৃতির নিয়মে। প্রত্ন আবিস্কারের মধ্য দিয়েই এই ধীর গতি সমাজের ঘটনা প্রবাহ ও বস্তুপুঞ্জকে একত্রে দেখা খুব কঠিন ব্যাপার হয়না। বরং তার চিত্র আরো স্পষ্টতর হয় যদি ভৌগোলিক পরিবেশের পটভূমিকায় তা পরীক্ষিত করা যায়।[১] এখন বাংলা বলতে কোন ভূখণ্ডকে বোঝাতো তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আধুনিককালে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল যা বাংলাদেশ নামে পরিচিত হয়ে উঠে তা পুরাকালে বংগদেশ নামে পরিচিত ছিলনা। অথবা এই অঞ্চলের জনগন এক ভাষাভাষী ও একই সংস্কৃতির বাহক হয়েও বাঙ্গালী নামে পরিচিত ছিলনা। বংগ অববাহিকা তখন বিভিন্ন জনপদে ছিল বিভক্ত এবং জনপদবাসীরাও স্ব স্ব জনপদের নামে পরিচিত হত। তার অসংখ্য সাক্ষ্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত আছে, তবে অতি প্রাচীনকালেই বংগ একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তা হিসেবে গড়ে উঠেছিল।[২] বৃটিশ ভারত বর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ বাংলা উত্তরে হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমি নিয়ে গঠিত ছিল। এর পূর্ব অংশে ব্রহ্মপুত্র, কংস (Kangsa), সুরমা এবং সাজুক (Sajjuk), নাগর (Nagar), বরাকর (Barakar) নদী এবং পশ্চিম দিকে নিম্ন অঞ্চলে সুবর্ণ রেখা। এলাকাটি ২৭^{0}৯ হতে ২০^{0}৫৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬^{0}৩৫ হতে ৯২^{0}৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।[৩] প্রায় ৮০,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এই বাঙ্গলা। কিন্তু প্রাচীন বাংলা বলতে এখানে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ দুই-ই বোঝাবে। কারণ, প্রথমত বর্তমান বাংলার সীমানা নির্দেশিত হয়েছে রাজনৈতিকভাবে, প্রাকৃতিক নয়। দ্বিতীয়তঃ

---

১ অমিতা রায়, 'ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা,' ইতিহাস অনুসন্ধান-৪, (কলিকাতাঃ কে,পি, বাগচী এণ্ড কোং, ১৯৮৯), পৃ. ১৬-১৮।

২ মুস্তফা নূরুল ইসলাম, সম্পাঃ, আবহমান বাংলা, (ঢাকাঃ১৯৯৩), পৃ. ১।

৩ R.C. Majumder, ed., History of Bengal Vol. I, (Dacca University, 1943), P.1.

প্রাচীনকাল থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সীমারেখা বহুবার পরিবর্তন হয়েছে বহুবিধ কারণে। রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বাংলার নদ-নদী। উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান দুটি নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাংলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। ফলে এই প্রধান নদীর খাতের অব্যাহত পরিবর্তনশীলতার কারণে বিভিন্ন রাজ্যের ও অঞ্চলের সীমানার পরিবর্তন ঘটেছে।

এই বিস্তৃত ভু-খণ্ডটিই ইংরেজ আমলের বেঙ্গল বলে ধরা হয়। এখন বাংলা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে। এই বংগ শব্দটি দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে দেখা গেলেও বংগ বা বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। মুসলমান যুগেই সর্ব প্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাংলা অথবা সুবা বাংলা নামে পরিচিত ছিল, এই বাংলা থেকেই ইউরোপীয়গণের 'বেঙ্গালা' ও বেঙ্গল' নামের উৎপত্তি।[১] ইউরোপীয়রা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের সময় এই নামটি পেয়েছিল। সীজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩-১৫৮১) 'বেঙ্গল' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চাটিগানের ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত সোন্দিব দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। দুজারিক (১৫৯৯) প্রায় ২০০ দ্বীপ উপকূল বিশিষ্ট বেঙ্গল দেশের উল্লেখ করেছেন।[২] মার্কো-পোলো (১৩ শতক) উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাংলা নামে প্রদেশের বৈশিষ্ট সূচক ভাষা-ভাষী প্রতিমা উপাসক জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন। ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে জাওদাবারোস বাংলাদেশের যে মানচিত্র ও নকশা অঙ্কন করেছিলেন তাতে সমগ্র বাংলাদেশকে তিনি 'বেঙ্গালা' বলেছেন। গাস্টালদির (Gastaldi, 1560 A.D.) মানচিত্রে চাটিগানের পশ্চিমে 'বেঙ্গালা'-র অবস্থিতি দেখানো হয়েছে।[৩] এর একশত বৎসর পর (১৬৫০ খ্রীঃ) ব্ল্যুভে (Bleav) এবং সসেনের (Saussen) ১৬৫২ এর মানচিত্রের তথ্য থেকে জানা যায় যে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী 'বেঙ্গালা' শহর অবস্থিত ছিল।[৪] এরূপ পণ্ডিতদের মধ্যে 'বেঙ্গালা' শহরের অবস্থিতি

---

১ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, (কলিকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯০১), পৃ. ২।

২ Journal of the Asiatic Society of Bengal (J.A.S.B.), 1913, P. 437.

৩ আনিসুজ্জামান সম্পাঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৪ JASB, Pt. I,IV, 1873, P. 233.

নিয়ে অনেক মত বিরোধ থাকলেও বেঙ্গাঁলা যে বাংলাদেশ অঞ্চলকে বোঝাত তাতে সন্দেহ নাই। বংগ দেশের বাংলাদেশ নামকরণ বিশেষতঃ এর সীমা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজল এ প্রসংগে উল্লেখ করেন, বস্তুতঃ আকবরের আমলে সমস্ত বাংলাদেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হয়। বাংলা পূর্ব পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা হতে দক্ষিণে হুগলী জেলার মন্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই 'সুবা' পূর্বে ও উত্তরে পর্বত বেষ্টিত এবং দক্ষিণে সমুদ্র বেষ্টিত ছিল। এর পশ্চিমে 'সুবা বিহার, কামরূপ ও আসাম সুবা বাঙ্গাঁলার সীমান্তে অবস্থিত ছিল।[১] আবুল ফজল বাঙ্গাঁলাহ নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর ফারসী ভাষায় লিখিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে, তাঁর ব্যাখ্যাটির ইংরেজী অনুবাদ হল- "The original name of Bengal was Bang. Its former rulers raised mounds measuring ten yards in height and twenty in breadth through out the province, which were called 'Al' from this suffix the name Bengal took its rise and currency."[2] অর্থাৎ বাঙ্গাঁলার সাবেক নাম বঙ্গঁ। বঙ্গেঁর পুরাতন শাসকবর্গ ২০ গজ প্রশস্ত ও দশ গজ উচ্চ জাঙ্গাঁল সারা প্রদেশ ব্যাপী উত্তোলন করেছিল। এই জাঙ্গাঁলগুলি 'আল' নামে অভিহিত হত। এই আনুঃ শব্দ 'আল' হতে বাঙ্গাঁলা নামটির উৎপত্তি ও প্রচলন ঘটেছে।[৩] সমালোচকরাও এই অভিমত স্বীকার করেছেন, যেমন-ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে জলপ্লাবন হতে দেশ রক্ষা কল্পে সে আমলের শাসকবর্গ বিরাট বিরাট জাঙ্গাঁল নির্মাণ করতেন। এই জাঙ্গাঁলকে সাধারণতঃ আল(সংস্কৃত আলি) বা আইল (পূর্ববঙ্গীয়) বলা হত। বঙ্গঁনামের সংগে এই 'আল'শব্দটি যুক্ত হয়ে বঙ্গাঁল বা বাঙ্গাঁলা নামের উৎপত্তি হয়েছে।[৪] প্রাচীন লিপিতে এই ধরণের বাঁধের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[৫] তাই বাঙ্গাঁলা নামের এই শাব্দিক ব্যাখ্যার কথা পন্ডিতেরা অনেকেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রাচীন বাংলার সীমা বন্টনে দেখা

---

১ H.S. Jarrett. Ain-i-Akbari, Vol. II, Revised by J.H. Sarkar, (Calcutta: 1948-49), p. 116.

২ Ibid., p. 132.

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৪ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

যায়, খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দী সম্ভবতঃ আরও প্রাচীনকাল হতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল নামে দুটি পৃথক জনপদ ছিল এবং প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এই দুটি দেশের একত্রে উল্লেখ আছে। আবার ঐতিহাসিকরা বলেছেন, বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের মধ্যে বঙ্গাল এর তুলনায় বঙ্গ অধিক প্রচলিত ছিল এবং বঙ্গ জনপদের মধ্যেই পূর্ব বাংলার অনেক ভৌগোলিক সত্তাই অনুর্ভুক্ত ছিল যেমন, বঙ্গাল, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ, এমন কি হরিকেল পর্যন্ত। তবে 'বঙ্গাল' দেশের নাম অনুসারেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের নাম বাংলা হয়েছে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই।[১] কারণ আকবর পূর্ব যুগে ত্রয়োদশ শতকে ভেনিসীয় পর্যটক মার্ক-পোলোর লেখনীতে বেঙ্গালা নামের প্রথম উল্লেখ দেখা গেলেও আমরা জানি মুসলমান যুগে আকবরের রাজত্বকালে এই অঞ্চল বাঙ্গালা নামে অভিহিত হয়েছে এবং আকবরোত্তর যুগে ইউরোপীয়রা এই নামই ব্যবহার করেছেন। ফারসী বাঙ্গালাহ তাদের ভাষায় হয়েছিল বেঙ্গালা বা বেঙ্গলা।[২] ইতিহাসবিদ সুকুমার সেনও তদ্রূপ বলেছেন, বঙ্গ থেকে বাঙ্গালা বা বাঙ্গালাহ'র উৎপত্তি হয়েছে। সমগ্র দেশের বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকার কালেই সৃষ্ট।[৩] অতএব বলতে পারি, প্রাচীন বাঙ্গালায় বঙ্গ-বঙ্গাল কেবলমাত্র দুটি জনপদ বা বিভাগ হিসেবেই ছিল পরবর্তীতে এ দুটি বিভাগ হতেই বর্তমান বাংলাদেশ নামটির উৎপত্তি হয়েছে।

বাঙ্গালা প্রধানতঃ দুইটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত। একটি বৃহৎ সমভূমি অপরটি উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের স্বল্প বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল। মোটের উপর বাঙ্গালা পলল গঠিত বৃহৎ উর্বর সমভূমি এবং নদী বিধৌত পলিগঠিত উর্বর সমভূমিকেই বাঙ্গালা ভূমি বোঝায়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই ভূমির কিছু অঞ্চল সমুদ্র স্তর থেকে নীচু। ফলে বর্ষাকালে এবং বছরের অধিকাংশ সময় প্লাবিত থাকে। বৃহৎ অর্থে বঙ্গ ভূমিকে ৩টি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। (ক) উত্তর দিকের গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা মিলনস্থল ও সংলগ্ন এলাকাব্যাপী বিস্তৃর্ণ পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চল। (খ) দক্ষিনাংশের অপেক্ষাকৃত নবীন বদ্বীপ ও পলল ভূমি, (গ) ব্রহ্মপুত্র ও হুগলী নদীর পশ্চিমাংশে বিস্তৃত ক্ষয়িষ্ণু পলল সমভূমি।[৪]

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

২ আনিসুজ্জামান সম্পাঃ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৩ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯০), পৃ ৫।

৪ S.P. Chatterjee. Bengal in Maps, 1949, p. 8.

প্রাচীন বদ্বীপ সমভূমি উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র ভূমি, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলের মধুপুরের গড় এবং কুমিল্লার লালমাই পাহাড় প্রভৃতি এই অঞ্চলের আংশিক এলাকা জুড়ে অবস্থিত। নবীন বদ্বীপ এলাকা বদ্বীপ ও বন্যা সমতল (ফ্লাডপ্লেন) এর যুক্ত এলাকা বলা যায়। দক্ষিণাংশের নদীবিধৌত ও বদ্বীপ অঞ্চল একই প্রকার। যদিও সমুদ্রের পানি ২৫´ বৃদ্ধি পেলে কলকাতা শহর এবং অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়।[১] ভাগীরথী নদীর পশ্চিমাংশে ক্ষয়িষ্ণু বিধৌত এলাকা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও সাধারণভাবে কিছু খাড়া ও ঢালু। এখানে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত কতকগুলি ভূমি গ্রানাইট, ক্রেশয়াজাইট দ্বারা গঠিত যা পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ এবং বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাহাড়গুলির গড় উচ্চতা ১০০০´। তবে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড় এবং বিহারীনাথ পাহাড় এই অঞ্চলের উঁচু ও প্রসিদ্ধ ভূমি।

বাংলার বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব বাংলার কিছু অংশ ছাড়া বাংলার প্রায় সবটাই ভূ-তত্ত্বের আলোকে নব সৃষ্টি। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিকের সীমানুবর্তী পর্বতমালা ছাড়া বাকি সমতল ভূমি এবং এই সমগ্র ভূ-ভাগই নদীমালার বদ্বীপ।[২] ওলডহামের মতে, পশ্চিমে হুগলী নদী থেকে পূর্বে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র নদীমালার ডেল্টা বা বদ্বীপ।[৩] কে, বাগচীর তথ্য অনুসারে বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশ, ছোট নাগপুর পর্বত মালারই বিস্তৃতি। এই ভূ-ভাগের অন্তঃস্থলে কঠিন উপরিভাগে সামান্য পলি; মেদিনীপুরের পূর্বাংশ 'পিডমন্ট' (Piedmont) সমভূমি। আর উত্তরে তরাই অঞ্চল থেকে দক্ষিণে পদ্মার প্রবাহ এবং পশ্চিমে গঙ্গা-পদ্মা থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূ-ভাগ, কিংবা ব্রহ্মপুত্র-সুরমা অনুবর্তী ভূ-ভাগ মূলতঃ পাললিক প্রকৃতির, তবে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন।

---

১ S.P. Chatterjee; op.cit., P. 8.

২ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৩ Procedings of the Asiatic Society of Bengal, 1870, P. 47.

বাংলার উত্তর, পূর্ব ও পূর্বে অবস্থিত সিলেট, ত্রিপুরা–চট্টগ্রাম পর্বতমালা 'টারশিয়ারী' পাহাড়। উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে মেঘনা এবং দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ–ভাগ মূলতঃ প্লাবন সমভূমি এবং গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র দ্বারা গঠিত বদ্বীপ।[১]

গঙ্গাই বাংলার প্রধান নদী। রাজমহল পাহাড়ের উত্তর পশ্চিমে তেলিগড় ও সিক্রিগলি সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম উত্তর ভারত থেকে গঙ্গার বাংলায় প্রবেশ পথ এবং গিরিবর্ত্ম ছেড়ে রাজমহলকে স্পর্শ করে গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে প্রবেশ করেছে।[২] সমতল ভূমি থেকে গঙ্গার দুটি প্রবাহ দেখা যায়, একটি পূর্ব দক্ষিণগামী যার নাম পদ্মা, অন্যটি সোজা দক্ষিণমুখী ভাগীরথী নামে পরিচিত। কিন্তু বর্তমান গঙ্গা মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। ভাগীরথী বর্তমানে জঙ্গীপুর, লালবাগ কাটওয়া, নবদ্বীপ ও কলকাতার পাশ দিয়ে ডায়মন্ড হারবারের নিকটে সমুদ্রে পড়েছে। পদ্মা বর্তমানে গঙ্গার মূল প্রবাহ, পূর্ব দক্ষিণগামী হয়ে বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং চাঁদপুরের নিকটে মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে জলপ্রবাহ উৎসারিত করছে। মোটকথা ভাগীরথীকেই গঙ্গার প্রথম ও আদি প্রবাহ বলা যায়।[৩] গঙ্গার এই দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ববাহি দুটি প্রবাহকেই কৃত্তিবাস (১৪১৫-১৬) যথাক্রমে ছোট গঙ্গা ও বড় গঙ্গা বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

ফানডেন ব্রোকের এবং রেনেলের মানচিত্রের সূত্র অনুযায়ী দেখা যায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ভাগীরথীর গতিপথ কলকাতা পর্যন্ত অপরিবর্তনশীল ছিল। তবে সপ্তগ্রামের নিকটে ভাগীরথী থেকে সরস্বতী ও যমুনা প্রবাহ বাহির হয়ে সাগরে পড়েছে। পরবর্তীতে সরস্বতী সাতগাঁওর নিকটে ভাগীরথী থেকে নির্গত হয়ে সোজা দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দামোদর প্রবাহকে অতিক্রম করে তাম্রলিপ্ত বন্দরের কিছু

---

১ K. Bagchi, <u>The Ganges Delta,</u> (Calcutta: 1944), P.18–35.

২ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৪১।

৩ K. Bagchi, <u>Op.Cit.</u>, P. 40.

৪ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৯১–৯২।

উত্তরে রূপনারায়নের সাথে মিলিত হয়েছে।[১] ঐতিহাসিকদের মতে ভাগীরথীর তিনটি গতিপথের কথা জানা যায়। প্রথমতঃ ভাগীরথী প্রাচীনতম রাজমহল পার হয়ে সাঁওতাল ভূমি ছোটনাগপুর, মানভূম, ধলভূম হয়ে সোজা দক্ষিণে সাগরে পতিত হতো। এই প্রবাহের সঙ্গেই অজয়, দামোদর এবং রূপ-নারায়ণ এসে মিলতো এবং এই প্রবাহের দক্ষিণতম সীমায় তাম্রলিপ্ত বন্দর। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান কালিন্দী-মহানন্দা খাতে প্রবাহিত হয়ে গৌড়কে ডানে রেখে পরে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমে বেয়ে দক্ষিণ খাতের কিছু পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তৃতীয়তঃ এই পর্যায়ে এসে তাম্রলিপ্তির পশ্চিমতর প্রবাহটি পরিত্যক্ত হয় এবং কলকাতা বেতড় পর্যন্ত ভাগীরথীর বর্তমান প্রবাহ পথ এবং বেতড়ের দক্ষিণে অবদি গঙ্গা প্রবাহ পথের প্রবর্তন হয়।[২]

অষ্টাদশ শতকে রেনেলের মানচিত্রে এবং সপ্তদশ শতকে ফানডেন ব্রোকের মানচিত্রে পদ্মা-কেই গঙ্গার মূল প্রবাহ বলে দেখানো হয়েছে। পঞ্চদশ শতকেও পদ্মাই ছিল গঙ্গার মূল প্রবাহ, তা কৃত্তিবাসের বর্ণনা থেকে এবং বড় গঙ্গা নামকরণ থেকেই বোঝা যায়।[৩] ষোড়শ শতকে আবুল ফজলের বর্ণনায় পদ্মাকে গঙ্গার মূল প্রবাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

গঙ্গা-পদ্মা প্রবাহ বাংলার ভূ-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট এবং এই প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে আরও অনেক নদ-নদী। জানা যায় এক সময়ে ভৈরব প্রবাহ শাখা নদী হিসেবে ছিল। পরে জেলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা ভৈরবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে তিন ভাগে ভাগ করেছে। মাথাভাঙ্গা কুমার, নবগঙ্গা ও তিস্তা এগুলি পদ্মার শাখা নদী।[৫] ভাগীরথীর শাখানদী সমূহের মধ্যে যমুনা এককালে বিশাল ছিল। রেনেলের মানচিত্রে যমুনা অত্যন্ত ক্ষীণ কিন্তু পঞ্চদশ শতকে যমুনা ত্রিবেণী সংগমের অন্যতম নদী ছিল।[৬]

---

১ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯।

৩ পূর্ণচন্দ্র দে (সম্পাঃ), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ৬৬, নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২।

৪ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৫ K. Bagchi, Op.Cit., Pp 52-54,

৬ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

বাংলার নদীসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রবাহ ব্রহ্মপুত্র বাংলার উত্তর পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আসামের ভিতর দিয়ে গতিপথ কিছুটা দক্ষিণ পশ্চিমগামী এবং রংপুর ও কুচবিহারের সীমান্ত দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে এর প্রাচীন নাম লোহিত্য। বেশ কয়েকবার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান যমুনা পদ্মার পথে চাঁদপুরের মেঘনার সাথে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। বাংলার গারো পাহাড়ের পূর্ব দক্ষিণ ভাগ ঘেষে দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়ে শেরপুর জামালপুরের ভিতর দিয়ে মধুপুর গড়ের পাশ দিয়ে ময়মনসিংহ জেলাকে দ্বিধাবিভক্ত করে ঢাকার পূর্বাঞ্চল দিয়ে সোনার গাঁয়ের দক্ষিণ পশ্চিমে লাঙ্গলবন্দের পাশ দিয়ে ধলেশ্বরীতে প্রবাহিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্রের একটি প্রবাহ। এই প্রবাহকে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ধারা বলে মনে করা হয়। সপ্তদশ শতকের পূর্বেই কোন এক সময়ে ব্রহ্মপুত্রের এই প্রবাহ ঢাকা জেলায় পৌঁছাবার পূর্বেই ভৈরব বাজারের নিকট উত্তর দিক থেকে আগত সুরমা-মেঘনা জলধারার সাথে মিলেছে। ভৈরব বাজার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এই ধারাকেই রেনেলের মানচিত্রে মেঘনা বলে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে যমুনা ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা প্রবাহে মিশেছে ।[১]

বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী মেঘনা। শিলং মালভূমি ও সিলেট অঞ্চলের জলসম্ভারকে নিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। ভূগোলবিদদের মত অনুসারে উপমহাদেশের সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল এলাকার পানি নিষ্কাশনের দায়িত্ব এই নদীর। খাসিয়া-জয়ন্তিয়া শৈলমালা থেকে মেঘনার উদ্ভব। উত্তর প্রবাহে এর নাম সুরমা। পরবর্তীতে এই সুরমাই মেঘনা নামে পরিচিত হয়েছে। সিলেট জেলা পার হয়ে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের পূর্ব সীমা স্পর্শ করে আজমিরিগঞ্জের বাম তীরে বেয়ে ভৈরব বাজারের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। রেনেলের মানচিত্রে মেঘনার যে প্রবাহ দেখা যায় তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি বলে মনে হয়।

প্রধান নদী সমূহ ছাড়া আঞ্চলিক নদী সমূহের আলোচনায় বলতে হয়, বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে সরস্বতী ছাড়া অন্য কয়টি নদী ছোট নাগপুরের পার্বত্যাঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এগুলির মধ্যে অজয়, দামোদর, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর ও রূপনারায়নের কথা উল্লেখ করতে হয়। বর্তমানে দামোদর বরাকর থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ভাগীরথী রূপ-নারায়নের মিলন

---

১ আবিদুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২।

শহরের কিছু উত্তরে হুগলী নদীর সাথে মিশেছে। রেনেলের মানচিত্রে এদের যে পথ দেখানো হয়েছে তাও বর্তমানে খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।[১] রেনেলের মানচিত্র অনুসারে উত্তর বাংলার সুগঠিত ভূ-ভাগে কয়েকটি নদী প্রবাহের কথা জানা যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে তিস্তা নদীর প্রবাহসমূহ। তিস্তা নদী ভুটান সীমান্তের উত্তরে হিমালয় হতে উৎসারিত হয়ে দার্জিলিং জলপাইগুড়ির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তার তিনটি দক্ষিণবাহী প্রবাহ হল, পূর্বস্রোতা করতোয়া, মধ্যবর্তী স্রোত আত্রাই এবং পশ্চিম স্রোত পূর্ণভবা।[২]

উত্তর বাংলার সুপ্রাচীন তীর্থ মহিমা খাত হিসেবে পুণ্যতোয়া নদী করতোয়া। কিন্তু বর্তমানে এর প্রবাহ ক্ষীণ। রেনেলের মানচিত্রে এ নদীর বিশাল খাত প্রথমে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্বমুখী করতোয়া ঘোড়াঘাট, শিবগঞ্জ, মহাস্থানগড় ও বগুড়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শাহজাদপুরের দক্ষিণে আত্রাই এর সঙ্গে মিলিত হত।[৩] রামচরিত কাব্যে করতোয়া বরেন্দ্রের পূর্ব সীমা বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৪] সপ্তম শতকে চৈনিক ভ্রমণকারী যুয়ান্ চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন থেকে কামরূপ যাবার পথে করতোয়া নদী পার হয়েছিলেন।[৫] ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত 'করতোয়া মাহাত্ম্য' গ্রন্থে করতোয়ার বিপুল প্রবাহ এবং তীর্থ মহিমার কথা উল্লেখ আছে।[৬] পুরাণ ও মহাভারতে পুণ্য-করতোয়ার পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে।[৭]

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয় নদী বাংলার ভূ-প্রকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট। নদীর পরিবর্তন বাংলার মানুষের জীবন যাত্রায় ও সামগ্রিক কার্যকলাপে গভীর প্রভাব ফেলেছে এ ধারণা

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৯৬।

২ <u>তদেব</u>, পৃ. ১০৯-১১০।

৩ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১৪।

৪ <u>তদেব</u>, (রামচরিত, ৩:১০)

৫ T. Watter, <u>On Yann Chwang's Travels in India, Vol-II</u>, <u>Op.Cit.</u>, PP 185-187.

৬ P.C. Sen (ed), <u>Karatoya-Mahatmya</u>, <u>V.R.S. Monograph No.2</u>, Rajshahi.

৭ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১০৯।

করা সঙ্গত। প্রাচীন বাংলার জনপদগুলির ভৌগোলিক অবস্থিতি অনেকাংশে ভূ-প্রকৃতি এবং নদীর স্রোতধারার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। বিভিন্ন জনপদগুলি দেখা যায় প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে প্রচলিত। তাদের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার বা হ্রাস তাদের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল পরিবর্তন করেছে। সুতরাং প্রাচীন জনপদগুলিও দেশের আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক ভিত্তিতে আলোচনার প্রয়োজন।

ক. পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র:

জনকে কেন্দ্র করে গঠিত এক একটি জনপদে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র বা রাজবংশের আধিপত্য হয়েছে এবং অনেক সময়ে তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সংকোচ বা বিস্তারের সংগে সংগে জনপদটির সীমাও সংকুচিত বা প্রসারিত হয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধন প্রাচীনকালের একটি প্রসিদ্ধ নগরী। বর্তমান বগুড়ার সাত মাইল দূরে মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কারণ মৌর্য যুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুণ্ড্রনগরী বলে উল্লেখিত হয়েছে।[১] আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে উল্লেখিত পুদনগল বা পুণ্ড্রনগরের কথা জানা যায়। এই পুদনগলই তদানীন্তন পুণ্ড্রদেশের রাজধানী।[২] পুণ্ড্র বা পুঁড়ো নামক কোন আর্যেতর জাতি এই অঞ্চলে বাস করত বলে এর নাম হয়েছে পুণ্ড্রদেশ।[৩] এই পুণ্ড্রজনদের সর্ব প্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং বোধায়ন ধর্মসূত্রে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই জাতিটিকে দস্যু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুণ্ড্রদের আবাসস্থলই পুণ্ড্র।[৪] ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সংগে সংগে এই পুণ্ড্র পঞ্চম ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়ে সপ্তম শতক এবং পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হয়েছে বলা যায়। তদানীন্তন পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি বগুড়া, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা জুড়ে

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৩ শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড, (কলিকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৭০), পৃ. ১৮।

৪ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

বিস্তৃত ছিল। মোটামুটি সমস্ত উত্তর বঙ্গই ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অধীনে, একেবারে রাজমহল গঙ্গা ভাগীরথী তীর হতে আরম্ভ করে করতোয়া পর্যন্ত। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ কজঙ্গল থেকে এসেছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং করতোয়া পার হয়ে গিয়েছিলেন কামরূপে। ফলে এখন সুস্পষ্ট বলা যায় কজঙ্গল এবং করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই হল পুণ্ড্রবর্ধন। তাছাড়া ধনাইদহ, বৈগ্রাম পাহাড়পুর এবং দামোদরপুর তাম্রপট্টোলী কয়টিতে পুণ্ড্রবর্ধন নামের তথ্য প্রদান করে।[১] সুতরাং পুণ্ড্রনগর ও বগুড়ার মহাস্থান যে অভিন্ন সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকেনা। মহাস্থানের ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তুপের পাশে বর্তমানে করতোয়ার ক্ষীণ প্রবাহ যে এককালে পুণ্ড্রনগরের পাশ দিয়ে প্রবল বিক্রমে প্রবাহিত হতো তা একাদশ শতাব্দীর 'করতোয়া মাহাত্ম্য' গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।[২] তবে পুণ্ড্রবর্ধনের অবস্থিতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে সপ্তম শতকের চৈনিক ভ্রমণকারী য়ুয়ান-চোয়াঙ-এর বর্ণনায়। তাতে 'পুন-ন-ফ-তন-ন' দেশের রাজধানী শহরের ২০ কিঃমিঃ পশ্চিমে 'পো-শিপ-পো' বিহারের উল্লেখ আছে।[৩] তদৃশ্য কানিংহাম অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন যে, 'পুন-ন-ফ-তন-ন' (পুণ্ড্রবর্ধন) ও মহাস্থান অভিন্ন এবং মহাস্থানের চার মাইল পশ্চিমে 'বাসু বিহারই য়ুয়ান-চুয়াঙ্ এর লিখিত 'পো-শিপপো' বিহার।[৪] অতএব বলা যায়, কানিংহামের সনাক্তকরণ সুনিশ্চিত। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকগণও খনন করে 'বাসু' বিহারের ধ্বংসাবশেষ উদঘাটন করেছেন।[৫] যা হোক, এককালে পুণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তি দেশের সর্বোচ্চ শাসন বিভাগ ছিল এবং দেশের প্রায় সমস্ত ভূখণ্ডকেই বুঝাত। রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণ অনেক সময় ভৌগোলিক অস্তিত্বসমূহের পরিমণ্ডল বৃদ্ধি করেছে, এ সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুণ্ড্রবর্ধন। ধর্মপালের অষ্টম শতকের খালিমপুর লিপিতে পুণ্ড্রবর্ধনান্তর্গত ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলের উল্লেখ। সেন আমলের পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণতম সীমা পশ্চিম দিকে বর্তমান খাড়ি পরগণা, ২৪ পরগণা এবং ঢাকা, বাখরগঞ্জের সমুদ্র তীর পর্যন্ত বিস্তৃতির কথা জানা

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

২ P.C. Sen (ed), Op.Cit. p. 25.

৩ W. Watters, Op.Cit., pp. 184-185.

৪ A.Cunninghum, A.S.I.R., Vol.XV, (Calcutta: 1882),p.110.

৫ M. Harunur Rasid, 'Bangladesh, A Profile in the light of Recent Archaeological Discoveries', Bangladesh Historical Studies, Dhaka, Vol.II, pp 21-22.

যায়।[১] বরেন্দ্র ভূমি প্রাচীন পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনেরই এক সুবৃহৎ অংশ। বর্তমান বগুড়া-রাজশাহীর উত্তর, দিনাজপুরের দক্ষিণ এবং রংপুরের পশ্চিমাঞ্চলকে স্পর্শ করে একটি বিস্তৃত উচ্চ গৈরিক ভূমি পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী। এই বরেন্দ্রীই মধ্যযুগীয় মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ, তবে বরিন্দ্র প্রাচীন বরেন্দ্রী অপেক্ষা সংকীর্ণতর বলে জানা যায়। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিত' কাব্যে পালদের 'পিতৃভূমি' বরেন্দ্রীর বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এর দক্ষিণে ছিল গঙ্গা ও পূর্বে করতোয়া এবং পুণ্ড্রবর্ধন-পুর' ছিল বরেন্দ্রের নগর। কয়েকটি লিপিসাক্ষ্য থেকেও জানা যায় বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনের অংশ-বিশেষ। যেমন বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে বরেন্দ্রীর উল্লেখ আছে, কিন্তু সিলিমপুর তর্পন-দীঘি এবং মাধাইনগর পট্টোলী তিনটিতে বরেন্দ্রীকে পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

খ. রাঢ়া ও সুহ্ম :

মহাকাব্যে এবং পুরাণসমূহে প্রাচ্যদেশে অবস্থিত সুহ্ম এর নাম জানা যায়।[৩] ভীম তাঁর পূর্বদেশ বিজয়াভিযানে অঙ্গদের পরাজিত করে একে একে তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম রাজকে পরাজিত করেন এবং সমুদ্রোপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীকে পদানত করেন। মহাভারতের এই বিবরণ হতে সুহ্মের অবস্থিতি সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে, সুহ্ম সমুদ্রোপকূল ও তাম্রলিপ্তির নিকট-বর্তী ছিল। দণ্ডীর 'দশকুমার চরিতে' 'দামলিপ্ত' (তাম্রলিপ্ত) সুহ্মদেশের সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য কেন্দ্র বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৪] প্রাচীন বাংলার অন্যতম জনপদের মধ্যে তাম্রলিপ্তি একটি পূর্ব-ভারতের উল্লেখযোগ্য বন্দর হিসেবে সুবিদিত ছিল। জৈন সাহিত্যে তাম্রলিপ্তি বন্দর নগরীকে 'দ্রোণমুখ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে স্থানে জল ও স্থল উভয় পথেই

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

২ তদেব, পৃ. ৫৫-৬৬।

৩ A. Bhattacharyya, Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal, (Calcutta, Sanskrit Pustak Bhandar, 1977), PP. 45-46.

৪ Kate (ed), Dasakumaracarita, (Bombay, 1926), P. 146.

মালামাল আনা নেওয়া করা যায়।[১] তাম্রলিপ্তির ভৌগোলিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক সীমা-রেখা নিয়ে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে বিতর্ক আছে। মহাভারতে তাম্রলিপ্তকে একটি পৃথক রাজ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জৈন ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী দেখা যায় এ অঞ্চল বঙ্গের অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং দশকুমার চরিত গ্রন্থের লেখক একে সুহ্মের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন।[২] ত্রয়োদশ শতকের ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে সুহ্মদেশের বিবরণ পাওয়া যায়। ধোয়ীর পবনদূতে বলা হয়েছে যে কেরল ভূমি থেকে বাংলার পথে 'সুহ্মদেশ' যার বিস্তীর্ণ ভূভাগ গঙ্গার প্রবাহে প্লাবিত এবং সেদেশে কচি তালপাতা খেলার ছলে ব্রাহ্মণ কন্যাদের কর্ণাভরণ রূপে ব্যবহৃত হত। সম্ভবতঃ হুগলী জেলার ত্রিবেণী এলাকাকেই ধোয়ী সুহ্ম বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] অতএব সুহ্মদেশ বলতে বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকে বোঝাত, যদি এর সীমানা নির্ধারণ করা যায়নি। তথাপি বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণে প্রতীয়মান হয়েছে, গংগা-ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী দক্ষিণতম ভূ-খণ্ড অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমানের দক্ষিনাংশ, হুগলীর বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলাই প্রাচীন সুহ্ম জনপদ যাকে দক্ষিণ রাঢ় বা সুহ্মভূমি বলা হত।

রাঢ়া জনপদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আচারাঙ্গ সূত্র নামে এক প্রাচীন জৈন পুঁথিতে। এই জনপদের উত্তর সীমায় গঙ্গা ভাগীরথী।[৪] জৈনসূত্রে এই ভূভাগ 'লাঢ়' বলেও উল্লেখিত হয়েছে। এ 'লাঢ়' দেশের 'সুবজ্ঞ ভূমি' বা 'সুহ্মভূমি' এবং বজ্জ ভূমি বা বজ্রভূমি নামে দুটি অংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এ তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, 'সুহ্ম' রাঢ়েরই অংশ বিশেষ এবং এই ভূভাগের দক্ষিনাংশ। পরবর্তীকালে 'দক্ষিণ রাঢ়' বলে অভিহিত হয়েছে।[৫] কোটীবর্ষ বা কোড়ীবর্ষ ছিল রাঢ়ের রাজধানী। রাঢ়ের উত্তরাংশ বা বজ্রভূমিই কাব্য মীমাংসা এবং পবনদূত গ্রন্থের ব্রহ্ম (ভূমি) বা ব্রহ্মোত্তর জনপদ। এই গ্রন্থে সুহ্ম ও ব্রহ্ম দুটি

---

১ Moti Chandra, <u>Trade and Trade Routes in Ancient India</u>, (New Delhi: 1977), P. 159.

২ R.C. Majumdar. <u>Op.Cit.</u>, P. 22.

৩ A. Bhattacharyya. <u>H.G.B.</u> P. 47.

৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। <u>বাঙালীর ইতিহাস</u>, (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৭০), পৃ. ৯৯।

৫ <u>Indian Antiquary</u>, XX, P. 375.

জনপদই গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলে বর্ণিত হয়েছে।[১] বিভিন্ন লিপি বা সাহিত্যিক সূত্রে রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে রাঢ় দেশকে দামোদরোত্তর ভাগে এবং গৌড়ের পশ্চিমে বলা হয়েছে।[২] রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থে রাঢ়া জনপদের সৌন্দর্যের উল্লেখ আছে।[৩] আবার ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে 'রাঢ়' অঞ্চলকে জনবিহীন ও শুষ্ক বলে উল্লেখিত হয়েছে।[৪] তদ্রূপ একাদশ শতকের রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কণ লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়) এর নাম জানা যায়। বল্লালসেনের নৈহাটি পট্টোলীতে উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত যে গ্রামগুলির উল্লেখ আছে, সব ক'টি গ্রামই বর্ধমান মুর্শিদাবাদের যোগসীমায় এবং অজয়নদী এই উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণসীমা এবং দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা।[৫] বলা যেতে পারে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই রাঢ় দেশ।[৬] যদিও আধুনিক মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশই তৎকালে সুহ্ম নামে পরিচিত ছিল। উক্ত জেলার পূর্বাংশ এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার উত্তরাংশ রাঢ়দেশ ভুক্ত ছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় এবং সম্ভবতঃ দামোদর নদ ছিল উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সীমা নির্দেশক।[৭]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৬৭-৬৮।

২ আনিসুজ্জামান, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১৭।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৬৭।

৪ N.G. Majumdar (ed), <u>Inscriptions of Bengal</u>, Vol. III. (Rajshahi: 1929), pp. 68-80.

৫ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৬৮।

৬ আনিসুজ্জামান, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১৮

৭ শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংস্কৃতি সাহিত্যে বাঙালীর দান"। <u>সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা</u>, ১৩০৫ বং, পৃ. ২-৩।

গ. গৌড়ঃ

গৌড় জনপদের আদি ভূমি মুর্শিদাবাদ-বীরভূম, পরে মালদহ এবং বর্ধমান এই জনপদের সঙ্গে যুক্ত হয়।[১] শিলালিপির প্রমাণাদি থেকে অনুমান করা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় দেশ প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক গৌড় রাষ্ট্রের রাজত্ব করেন এবং বিহার উড়িষ্যা জয় করেন। ফলে গৌড়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় মুর্শিদাবাদের কাছে 'কর্ণসুবর্ণ' ছিল গৌড়ের রাজধানী।[২] 'গৌড়' কথাটি খ্রীস্টপূর্ব ৩২১-৩০০ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ গৌড়িক স্বর্ণের উল্লেখ ছাড়াও এ গ্রন্থে গৌড়দেশে উৎপন্ন অনেক শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের কথা জানা যায়। আবার 'পঞ্চগৌড়' রাজ্যের উল্লেখ থেকে গৌড় নামটির জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।[৩] রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায় পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ।[৪] তবে গৌড় এবং বঙ্গ এই দুটি জনপদ ইতিহাসে, প্রশস্তিতে ও তাম্রশাসনে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। বিভিন্ন লিপিমালা থেকে জানা যায় যে, পাল রাজারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিকারী হয়েও রাঢ়াধিপতি না বলে নিজেদের গৌড়েশ্বর বলে পরিচয় দিতেন যদিও রাজা ধর্মপাল বঙ্গপতি হিসেবে কয়েক স্থানে পরিচিত ছিলেন।[৫] যাহোক বাৎস্যায়নের লেখায় তৃতীয় চতুর্থ শতকে গৌড়ের নাগরিকদের বিলাসব্যসনের পরিচয় পাওয়া যায়।[৬] বরাহ মিহির আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে পৌন্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান থেকে পৃথক করে 'গৌড়ক' এর উল্লেখ করেছেন তার বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে।[৭] রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় বাংলার উল্লেখ রয়েছে বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যে গৌড়ের উল্লেখ বেশ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল উৎসের সর্বত্র গৌড়দেশের অবস্থিতির ইংগিত পাওয়া যায় না। কেননা বৃহত্তর চৌহদ্দী,

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

২ বিনয় ঘোষ, পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খণ্ড, (কলিকাতাঃ প্রকাশ ভবন, ১৯৮০), পৃ. ১।

৩ প্রদ্যোত ঘোষ, গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য, ১ম পর্ব, (কলিকাতাঃ এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৭৭), পৃ. ১।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৫ প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

৬ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৭ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮। (বৃহৎসংহিতা, ১৪ঃ৬-৮)।

বঙ্গ-বঙ্গাল, সমতট-হরিকেলই ছিল একত্রে গৌড়। অর্থাৎ সে সময় পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গই গৌড় হিসেবে নির্দেশিত ছিল। ব্যারোস, গোরিস (Goris) এবং গাসট্যালডির (Gestaldi) নকশায় (১৫৬১) গৌড়কে বর্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দেখান হয়েছে।[১] এই গৌড়ের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য কখনো কলিংগ কখনো ভুবনেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।[২] এই বিস্তৃতির সাথে সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল এই জনপদের সীমা। এছাড়া বাংলার রাজনৈতিক বিস্তার ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাচীন যুগের কৃতিত্ব এই গৌড় জনপদ।

ঘ. বংগ ও বঙ্গাল :

প্রাচীন জনপদ বঙ্গ বর্তমানকালের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। এর সীমারেখা পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত, কিন্তু কোন কোন সময়ে বঙ্গ পশ্চিমে কপিশা নদী ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পূর্ববর্তী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে জানা যায়।[৩] বঙ্গের অবস্থিতির নির্দেশ আরো স্পষ্ট হয় কালিদাসের চতুর্থ শতকের 'রঘুবংশে' এই কাব্যের চতুর্থ শ্লোকে উল্লেখ আছে রঘু 'সুহ্ম' দের পরাজিত করে 'বঙ্গ' দের উৎখাত করেন এবং 'গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু' অঞ্চলে তিনি জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।[৪] পণ্ডিতদের ধারণা অনুসারে 'গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু' হচ্ছে গঙ্গা স্রোত-অন্তবর্তী ভূভাগ অর্থাৎ গঙ্গার দুই প্রধান স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মার স্রোত অন্তবর্তী এলাকা বলে মনে করা হয়। সুতরাং গঙ্গা ভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা।[৫]

ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাচীনতম গ্রন্থ, 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[৬] মহাভারতের দিগ্বিজয় কাহিনী থেকে জানা যায়, ভীম কৌশিনদী

---

১ প্রদ্যোত ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

২ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৪ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২০, রঘুবংশ ৪.৩৬।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২।

৬ তদেব, পৃ. ৬১।

তীরবর্তী পুণ্ড্ররাজাকে পরাজিত করে পর পর বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম রাজাদের পরাভূত করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বঙ্গ পূর্বাঞ্চলীয় দেশ এবং পুণ্ড্র, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত বা অঙ্গ, মগধ কিংবা প্রাগজ্যোতিষ প্রভৃতি জনপদের কাছাকাছি এর অবস্থিতি।[১] প্রাচীন কাব্য-গ্রন্থ ছাড়াও পাল ও সেন আমলের লিপিগুলিতে বঙ্গের বিস্তৃতি সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যায়। একাদশ শতকের শেষে বঙ্গের দুটি বিভাগের কথা জানা যায়। একটি বঙ্গের উত্তরাঞ্চল ও আরেকটি অনুত্তর বা বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা ছিল পদ্মা এবং সমুদ্র-তীরবর্তী খাল-নালা সমাকীর্ণ দক্ষিণাঞ্চলে ছিল অনুত্তর বঙ্গ। সেন যুগে কেশবসেন ও বিশ্বরূপ-সেন আমলের লিপিমালায় বঙ্গের দুটি বিভাগের কথা জানা যায়। একটি বিক্রমপুরভাগ ও অন্যটি নাব্যমণ্ডল। বাখরগঞ্জ জেলা এবং আরও পূর্ব দিকে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল সমস্তটাই নাব্য নামে এবং বর্তমান বিক্রমপুর পরগনা সমগ্র ও ইদিলপুর পরগনার কিয়দংশ নিয়ে ছিল বিক্রমপুর ভাগ।[২] মোট কথা বাংলায় মুসলমান শাসন বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গ জনপদের পরিধি ছিল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অংশ পর্যন্ত।[৩]

বঙ্গাল

বঙ্গাল প্রাচীন বঙ্গের একটি অংশ বা বিভাগ হিসেবে পরিচিত হলেও একাদশ শতকে বঙ্গাল এবং বঙ্গকে দুইটি পৃথক জনপদ বলা হয়েছে। দক্ষিণী লিপিতে প্রথম বঙ্গাল দেশের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে উল্লেখিত চোল সেনাবাহিনী দক্ষিণ রাঢ় থেকে বঙ্গাল দেশে এসে গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজিত করেছিল।[৫] এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, দক্ষিণ রাঢ়ের পরেই ছিল বঙ্গাল এবং দুই দেশের মধ্যসীমা ছিল

---

১ মহাভারত, ২:৩০, নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৩০।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৫ Epigraphia Indica, IX, P. 229.

গঙ্গা ভাগীরথী। যা হোক, একাদশ শতকে বঙ্গাল দেশ বলতে প্রায় সমস্ত পূর্ব বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রতটশায়ী সমস্ত দেশখণ্ডকে বোঝানো হয়েছে।[১] সর্বোপরি, বঙ্গাল বা বাঙ্গালা দেশের কেন্দ্র স্থান পূর্ব বঙ্গকে বলা হয়েছে, কারণ গাসটালডির (১৫৬১) নকশায় বেঙ্গালার অবস্থিতি এই অঞ্চলেই দেখানো হয়েছে। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ ও বঙ্গাল নামে দুইটি পৃথক দেশ ছিল এ ধারণা করা সঙ্গত। অনেক প্রাচীনলিপি ও গ্রন্থে এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ পাওয়া গেছে। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দিষ্ট করে বলা ঐতিহাসিকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে একাদশ শতক পর্যন্ত চন্দ্রদ্বীপ-হরিকেল বঙ্গাল দেশেরই অংশ ছিল।[২] বঙ্গাল দেশের নাম থেকে এদেশের নাম বাঙ্গালা হয়েছে এবং এদেশের অধিবাসীগণকে এক সময় বাঙ্গাল বলা হত। এ থেকে বঙ্গাল দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব।[৩]

ঙ. সমতট ও পট্টিকেরা :

সমতট দক্ষিণ পূর্ব বাংলার আর একটি জনপদ। চতুর্থ শতকের সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে নেপাল, ডবাক, কামরূপ, কর্তৃপুর ও সমতটের উল্লেখ আছে।[৪] ষষ্ঠ শতকে বরাহ মিহিরের বৃহৎসংহিতায় পুণ্ড্র-তাম্রলিপ্তক-বর্ধমান-বঙ্গের সঙ্গে সমতট নামে একটি জনপদের উল্লেখ সর্ব প্রথমেই পাওয়া যায়।[৫] সপ্তম শতকের য়ুয়ান্ চোয়াঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে এবং মধ্য বাংলার অন্ততঃ কিয়দংশ এই সমতটের অংশ ছিল।[৬] এ ছাড়া ইৎসিং প্রণীত ছাপান্ন জন চৈনিক বৌদ্ধ শ্রমণের ভ্রমণের বিবরণে উল্লেখ আছে সপ্তম শতকে সমতটের রাজভট নামক একজন রাজার কথা। এই রাজভট ও খড়্গ রাজবংশ সম্ভূত রাজরাজভট্ট এক ও অভিন্ন এবং

---

১ R.C. Majumdar, <u>History of Ancient Bengal,</u> (Calcutta: 1971) P. 16.

২ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত,</u> পৃ. ৬৫।

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, <u>প্রাগুক্ত,</u> পৃ. ২।

৪ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, <u>প্রাগুক্ত,</u> পৃ. ২২।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত,</u> পৃ. ৬৪। (<u>বৃহৎসংহিতা</u> ১৪, ৬-৮)।

৬ T. Watters, <u>op.cit.</u>, pp. 194-202.

খড়্গ বংশের রাজধানী ছিল কর্মান্ত যা কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে বড় কামতা বলে মনে করা হয়।[১] সুতরাং এই কর্মান্ত বা ত্রিপুরা জেলাও সমতটের অংশ ছিল এটা সুস্পষ্ট। উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, সপ্তম হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা সমতটের অংশ ছিল তা অনস্বীকার্য।[২]

খড়্গ পরবর্তী যুগে কুমিল্লা অঞ্চলে শাসন করতো 'দেব' রাজবংশ এবং তাদের লিপিতে ক্ষীরোদা নদী ও তার তীরবর্তী দেব পর্বতের উল্লেখ আছে। এই অঞ্চলের পরবর্তী রাজবংশ 'চন্দ্র' দের তাম্রলিপিতেও সমতট ও দেবপর্বতের উল্লেখ আছে।[৩] এই সব লিপি প্রমাণে পর্যালোচনা করা যায়, সমতট অঞ্চলটি কুমিল্লার অন্তর্গত। দ্বাদশ শতকে সমতটের পশ্চিম সীমা মধ্য বঙ্গ অতিক্রম করে চব্বিশ পরগণার খাড়ি পরগণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে অনুমান করা হয়। অতএব গঙ্গা ভাগীরথীর পূর্বতীর হতে আরম্ভ করে মেঘনা-মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রশায়ী ভূ-খণ্ডটিই সমতট। এই সমতটের কেন্দ্র ভূমি ছিল কুমিল্লার নিকটবর্তী 'লালমাই' এলাকা। কুমিল্লার সাথে সমতটের সম্বন্ধের প্রমাণ পাওয়া যায় মহীপালের বাঘাউরা ও নারায়ণপুর মূর্তি লিপিতে।[৪] এ দুটো স্থানই বৃহত্তর কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্তী। সমতটের সীমা সঠিক করে বলতে না পারলেও ত্রিপুরা, নোয়াখালি অঞ্চলকে প্রাচীন সমতট বলা হত। পট্টিকেরা সমতটের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি প্রাচীন ভৌগোলিক স্থান। অনেক আগে পূর্ব বাংলায় 'পট্টিকের' নাম অঙ্কিত কিছু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল।[৫] পণ্ডিতদের ধারণা এসব মুদ্রা কুমিল্লার পট্টিকেরা পরগণা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের নিকটস্থ বর্তমান পট্টিকেরা পরগণা ও তাম্রশাসনে পট্টিকেরা নগরীর উল্লেখ থেকে মনে করা হয় যে ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলে ঐ নামের একটি রাজ্য ছিল। এখানে প্রত্ন খননের ফলে আবিস্কৃত তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, ১২২০

---

১ R.C. Majumdar (ed), H.B Vol.I, Pp.86-87.

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৪ EI. XVII, P. 335.

৫ A.M. Chowdury, Dynastic History of Bengal, (Dhaka: 1967), P. 163.

খ্রীস্টাব্দে তাঁর রাজত্বকালে রাজা রণবঙ্কমল্ল শ্রী হরিকেল দেব পট্টিকেরা নগরীতে এক বৌদ্ধ বিহারের জন্য কিছু ভূমিদান করেন।[১] পট্টিকেরা নগরীর সঠিক স্থান নির্দেশ করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক ডঃ নাজিমুদ্দীন বলেছেন, "১১০০ শতাব্দের 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' নামক একটি প্রাচীন পুঁথিতে এই রাজ্যের অস্তিত্বের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ পুঁথিতে ১৬ হাত বিশিষ্ট একটি দেবী মূর্তির ছবি আছে এবং নীচে লেখা আছে" পট্টিকেরে চুণ্ডাবরা ভবনে চুণ্ডা"। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, খ্রীস্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রথমদিকে পট্টিকেরা নগরীতে বৌদ্ধ দেব-দেবীরা প্রভাবশালী ছিলেন।"[২] যাহোক কুমিল্লা জেলায় একটি পরগণার নাম 'পট্টিকারা' বা 'পাইটকারা' এবং মুগল রাজস্ব তালিকায় এই পরগণার নাম পাওয়া যায়।[৩] প্রাচীন পট্টিকেরা বা পট্টিকেরকাই সম্ভবতঃ এই পরগণা। পট্টিকের শহর সঠিক-ভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, তবে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে অনুমান করা যায়।

চ. হরিকেল :

চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণীতে সপ্তম শতকে হরিকেল জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে হরিকেল অঞ্চল প্রাচ্য দেশের পূর্বতম সীমায় অবস্থিত বলা হয়েছে। আবার অষ্টম শতকে রচিত আর্যমঞ্জু-শ্রীমূল-কল্প গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল তিনটি সংলগ্ন স্বতন্ত্র জনপদ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪] হরিকেল জনপদের প্রথম উল্লেখ নবম শতাব্দীর কান্তিদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে। তার পরবর্তীকালে চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ৯৩০ খ্রীস্টাব্দের দিকে চন্দ্রবংশীয় রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করেন এবং ধীরে ধীরে চন্দ্রদ্বীপ ও সমতট দখল করেন।[৫] এই লিপি প্রমাণ থেকে হরিকেল রাজ্যের অবস্থিতি

---

১ নাজিমুদ্দীন আহমেদ, <u>মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর</u>, (পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬), পৃ. ৫০।

২ <u>তদেব</u>, পৃ. ৫১।

৩ আ,কা, ম, যাকারিয়া, <u>কুমিল্লা জেলার ইতিহাস</u>, (কুমিল্লা, ১৯৮৪), পৃ. ৩৬৭।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৬৩।

৫ A.M. Chowdury, <u>Op.Cit.</u>, PP. 157-159.

লালমাই, সমতট ও চন্দ্রদ্বীপের নিকটবর্তী বলে মনে করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য এবং রূপচিন্তামণিকোষ (পঞ্চদশ শতক) নামক দুটি পাণ্ডুলিপিতে শ্রীহট্ট এবং হরিকোলা নামক জনপদ দুইটিকে এক বা সমার্থক বলা হয়েছে। রাজ শেখরের কর্পূরমঞ্জরী গ্রন্থেও হরিকেল জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১]

এছাড়া ইৎসিং এর বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে উ-হিং নামক চীনা পর্যটক সিংহল থেকে সমুদ্র পথে হরিকেল এসেছিলেন এবং হরিকেল ছিল পূর্ব ভারতের পূর্ব প্রান্তে। ইৎসিং-এর বর্ণনায় সমতটের উল্লেখ আছে। সুতরাং এ তথ্য থেকে হরিকেল রাজ্য সপ্তম শতকে বাংলা পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ছিল বলে অনুমান করা হয়। অর্থাৎ কুমিল্লা-নোয়াখালীর দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলের সীমা বিস্তৃত ছিল বলা যায়।

এছাড়া চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বেলোনিয়া অঞ্চলে বেশ কিছু রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে, এই মুদ্রাগুলির লিপির সংগে আরাকানীয় লিপির মিল পাওয়ায় এবং 'হরিকেল' নাম উল্লেখ থাকায় আরাকান সংলগ্ন চট্টগ্রাম অঞ্চলকে হরিকেল বলে চিহ্নিত করেছেন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ। পরবর্তীকালে নবম শতাব্দীর দিকে হরিকোল রাজাদের শাসনকালে এই জনপদ সমতট অর্থাৎ কুমিল্লা নোয়াখালী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং চন্দ্ররাজাদের ক্ষমতা বিস্তার এর ভৌগোলিক পরিধি আরো প্রসারিত করেছিল।

ছ. <u>কর্ণসুবর্ণ</u> :

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙ পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, তাম্রলিপ্ত ঘুরে কর্ণসুবর্ণে আসেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় তাম্রলিপ্তি থেকে ৭০০ লি (প্রায় ১৬৫ মাইল) উত্তর পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ। তাম্রলিপ্তের আয়তন তিনি ১৪০০ 'লি', সমতটের ৩০০০ 'লি', পুণ্ড্র-বর্ধনের ৪০০০ 'লি', কিন্তু কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের আয়তন ৪৪৫০ 'লি' বলে উল্লেখ করেছেন।[২]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৬৩।

২ Thomas, Watters, <u>Op.Cit.</u>, P. 189.

সুতরাং বাংলার প্রাচীন রাজ্যের মধ্যে কর্ণসুবর্ণ বৃহত্তম রাজ্য ছিল বললে চলে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে চিরুটি গ্রামের নিকটে কর্ণসুবর্ণ ও রাঙামাটি।[১] ১৯২৮-২৯ সালে কর্ণসুবর্ণ রাজধানী ও তার বিখ্যাত বিহার লো-টো-মো-চিহ্ অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকার সঠিক স্থান প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ হতে অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব হয়নি। তবে ১৯৬০ এর দশকে কয়েক বছর ধরে উৎখননের ফলে প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিস্কৃত হওয়ায় এই স্থানটি যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ও রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সংগে জড়িত সে বিষয়ে ঐতিহাসিক-গণের সন্দেহ দূর হয়। এখানে প্রাপ্ত একটি উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির সীলমোহর যার গায়ে উৎকীর্ণ ধর্মচক্র প্রতীকের নীচে দু'লাইন লিপিতে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার লেখা আছে,[২] যা বর্তমান রাঙামাটি, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ছিল। পরিশেষে বলতে হয় মহারাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। এই সময় কর্ণসুবর্ণের সমৃদ্ধির সময়।[৩]

উপরে প্রাচীন বাংলার জনপদ বা ভৌগোলিক অস্তিত্ব সমূহের আলোচনায় বেশ বুঝা যায় যে, কোন জনপদেরই সীমারেখা নির্দিষ্ট নয়। তাই জনপদগুলির বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য দেয়া যায় না। নদীর গতি পরিবর্তনই হয়তো ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তনের প্রধান কারণ। তবে কালের প্রবাহে ভৌগোলিক পরিচয়ের পরিবর্তনের পেছনে রাজনৈতিক শক্তির বিবর্তন সক্রিয় ছিল তা স্বীকার্য। রাজনৈতিক ক্ষমতার অবনতি কিংবা নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে অনেক সমৃদ্ধ নগর জনপদ বিলীন হয়েছে আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে নতুন নগর জনপদ। প্রাকৃতিক কারণেই দেশের বিভিন্ন স্থানের সাথে যোগাযোগের সুবিধা অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগের সুবিধার কারণে এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব বিকীরণের সুযোগ হয়েছে। আবার যোগাযোগের অসুবিধার কারণে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের স্বকীয় সংস্কৃতিতে পার্থক্য ও স্বকীয়তা গড়ে উঠেছে।

---

১ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

২ Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1928-29 ed. H. Hargraves, (Delhi, 1933), p.92.

৩ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮, ২৯।

প্রাচীনতর সাক্ষ্যে জানা যায় জনপদগুলি প্রত্যেকটি কোন স্থানের নাম হিসেবে পরিচিত ছিল না। বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, রাঢ় এইসব কোম বা জনেরা যে যে অঞ্চলে বাস করত তাদের নামানুসারে বসবাস কেন্দ্রের আঞ্চলিক নামগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। যাহোক জনপদগুলি এক একটি রাষ্ট্র বা রাজবংশের আধিপত্য লাভ করেছে। যেমন- পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য পাল ও সেন আমলে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তিতে প্রসারিত হয়েছে। কারণ রাষ্ট্রীয় পরিধির বিস্তার বা প্রাকৃতিক সীমা রাজনৈতিক ভৌগোলিক সত্তার উপর নির্ভরশীল হওয়ায় সব সময় একইভাবে থাকেনি। এক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের পরিচিতির প্রয়োজন। সর্বকালে সর্বযুগে কোন দেশ বা ভূ-খন্ডের রাজনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে সেই দেশ বা ভূ-খন্ডের অধিবাসীদের সামাজিক বিষয় ও জীবন প্রণালীকে প্রভাবিত করেছে। বিধায় সংক্ষিপ্তরূপে রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনার প্রয়োজন।

(খ) প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ঃ

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবনচিত্রের প্রতি আলোকপাত করতে হলে সেকালের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন। আদিকাল থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই পর্বের বাংলার ইতিহাস প্রণয়নের জন্য উপাদানের স্বল্পতাই এর প্রধান কারণ। কিছু সমসাময়িক লিপিমালা, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ, দেশী বিদেশী সাহিত্যিক উপাদান প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। এ সমস্ত উপাদানের উপরই মূলতঃ নির্ভর করে আমাদের বাঙালার রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় তুলে ধরতে হয়। কিন্তু এ উপাদানগুলির সাহায্যে বিভিন্ন শাসনামলের সন, তারিখ ঘটনা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। ফলে বহু তথ্য সম্বলিত করে ইতিহাস প্রণয়ন করা যায়না। তথাপিও এদেশের ঐতিহাসিকগণ বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণামূলক মূল্যবান তথ্যের উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে। সমকালীন উৎস এবং সাম্প্রতিককালের ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী হতে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার একটি রূপরেখা নির্ণয়ের প্রয়াস করা যায়।

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্যাঞ্চল ও তৎ-সংলগ্ন ভূ-ভাগ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই প্রাচীন ভূ-ভাগেরই বিভিন্ন এলাকায় প্রাচীন মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। নব্য তাম্র-প্রস্তর এই প্রত্ন নিদর্শন সমূহ বাংলাদেশের প্রাচীন ভূ-ভাগে মানুষের অস্তিত্বের চিহ্ন বহন করে।[১]

১৯৬২-৬৩ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে, খ্রীস্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এক উন্নতমানের সভ্যতার নিদর্শন উদঘাটিত হয়েছে।[২] পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে স্টীটাইট (steatite) পাথরের কতগুলি চিহ্ন খোদিত একটি গোলাকার সীল পাওয়া গেছে। সীলটির খোদিত চিহ্নসমূহ বা চিত্রাঙ্কন এবং সীলটি ভূ-মধ্যসাগরীয় একটি দ্বীপের, যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বের নির্মিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সীল এবং অন্যান্য নিদর্শনাদি হতে জানা যায় যে মানব সভ্যতার প্রাচীন আবাসস্থল একটি দ্বীপের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। অজয় নদী উপত্যকা অঞ্চলে পোড়ামাটির তৈরী মূর্তি বাংলাদেশের এই শিল্পের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে।[৩]

ঐতিহাসিক যুগের সূচনা পর্বে বাংলায় যখন রাজা বলে কিছু ছিলনা তখন কৌম সমাজ ও শাসন পদ্ধতি ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, বাংলার বিভিন্ন জেলায় বসবাসরত সমাজের নিম্নস্তর অথবা পার্বত্য আরণ্য কোমদের মধ্যে। তাদের পঞ্চায়েতী প্রথায়, দলপতি নির্বাচনে, সামাজিক দণ্ডবিধানে, ভূমি ও শিকার সম্পদের বিলি ও বন্দোবস্তে, উত্তরাধিকার শাসনে এখনো সেই কৌম শাসনযন্ত্র ও পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।[৪] আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের পূর্বে কোমতন্ত্র রাজতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছিল। বাংলার রাজতন্ত্রের আদি পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় মহাভারতের দুই একটি কাহিনীতে। সিংহল দেশীয় পালি গ্রন্থ

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, ও অন্যান্য। বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রথমপর্ব, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭), পৃ. ১৫।

২ তদেব, পৃ. ১৬।

৩ তদেব।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

মহাবংশে বিজয় নামক এক বাঙাঁলী বীরের আখ্যান পাওয়া যায়। মহাভারতে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নামে পুণ্ড্রদের এক রাজার কথা, বঙ্গ, তাম্রলিপ্তি, কর্বট, সুহ্ম প্রভৃতি কোম রাজাদের কথা, দুর্যোধনসহায় বঙ্গরাজের কথা এবং রামায়নে প্রাচীন বাংলার কয়েকটি রাজবংশের কথা জানা যায়।[১] তবে পালি গ্রন্থ মহাবংশের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের কথা সাহিত্যিক সাক্ষ্য থেকে জানা যায়।[২] পুরাণ, মহাভারত ও পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে তথ্যের উল্লেখ আছে তা হতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতির পরিচয় এবং আর্য প্রভাব বিস্তারের নানান আখ্যান পাওয়া যায়। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যের অবস্থিতির কথা অনুমান করা যায়।[৩] কখনো কখনো কোন পরাক্রমশালী রাজা দুই তিনটি রাজ্য একত্র করে বিশাল রাজ্য স্থাপন করতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলার রাজাগণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁদের শৌর্য, বীর্যের খ্যাতি বাংলার বাইরেও বিস্তৃত ছিল।[৪]

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখনী থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, খ্রীস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম আক্রমণের সময় এদেশে এক পরাক্রমশালী রাজা ছিল।[৫] খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সমসাময়িক গ্রীক ও লাতিন লিখিত সাক্ষ্যে গঙ্গারিডাই বা গঙ্গারিডই নামে পরাক্রমশালী জাতির কথাও আমরা জানতে পারি। ঐতিহাসিকদের ধারণা এ গঙ্গারিডাই জাতি বাংলাদেশের অধিবাসী ছিল এবং গঙ্গা নদীর প্রধান দুটি প্রবাহ

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-৯৯।

২ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৩ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৪ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৫ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী প্রদেশে গঙ্গাঁরিডই জাতির বাসস্থান।[১] অবশ্য এ রাজ্যের অবস্থিতি নিয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। দিওদোরসের লেখনীতে এই গঙ্গাঁরিডই জাতির বিপুল সৈন্য বাহিনীর ও চার হাজার রণহস্তির উল্লেখ আছে। এই বিপুল সৈন্য সামরিক শক্তির কথা বাংলাদেশের গঙ্গাঁবিধৌত অঞ্চলে এক বিরাট রাজশক্তির পরিচয় বহন করে।[২] তবে গ্রীক লেখকগণের বিবরণে প্রাসিয় নামক আরেকটি জাতির কথা জানা যায়। যাদের রাজধানী ছিল পলিবোথরা বা পাটলিপুত্র। এ জাতি গঙ্গাঁরিডই দেশের পশ্চিমে বাস করত। অধিকাংশ প্রাচীন লেখকদের মতে এই দুই জাতি গঙ্গাঁরিডই রাজার অধীনে ছিল এবং তাঁর রাজ্যের সীমা পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীর থেকে ভারতের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৩]

মোটকথা এ অনুমান করা যায় যে খুব সম্ভব তখন খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন, তখন বাংলার এক রাজা বঙ্গ ও মগধে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করে আর্যাবর্তে নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আলেকজান্ডারের অভিযানের চার পাঁচ শত বৎসর পরে লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমীর বিবরণ হতে আমরা আরো জানতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাংলায় স্বাধীন গঙ্গাঁরিডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল এবং গঙ্গাঁ তীরবর্তী গঙ্গেঁ নামক নগরী এর রাজধানী ছিল। এই গঙ্গেঁ নগরীকে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর বলে জানা যায়। বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় এখান হতেই সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানী হত।[৪]

আলেকজান্ডারের প্রত্যাবর্তনের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতবর্ষের বৃহদাংশ সম্বলিত এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। গ্রীক ও বৌদ্ধ সাক্ষ্যে মনে হয় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এবং সম্ভবতঃ নদী বিধৌত বদ্বীপ অঞ্চলও মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের মৌর্য শাসনের একটি শিলাখণ্ড লিপি বগুড়া জেলার মহাস্থানে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত

---

১ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫০।

২ আবদুল মমিন চৌধুরী, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১৭।

৩ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫০।

৪ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২১।

লিপি প্রমাণ করে যে উত্তর বঙ্গের ঐ অঞ্চলে মৌর্য শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল 'পুণ্ড্রনগর' বা পুডনগল। এছাড়া এ লিপিতে মৌর্য প্রাদেশিক শাসক মহামাত্রের উল্লেখ ছিল।[১] যদিও লিপিটি খন্ডিত, তা থেকে গন্ডক ও কাকনিক মুদ্রায় অর্থ সাহায্যের নির্দেশ দেয়ার কথা জানা যায়। যুয়ান-চোয়াঙের বর্ণনায় আছে, উত্তরবঙ্গ ছাড়াও বাংলাদেশের অন্যান্য জনপদ যেমন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি ও সমতট অঞ্চলে মৌর্য শাসন ছিল। এ অঞ্চলগুলিতে তিনি সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন এবং এগুলির একটি বিবরণও দিয়েছিলেন।[২] কিন্তু এ সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তেমন কিছু বলা যায়না। মৌর্যোত্তর বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে সঠিক মন্তব্য করা দুরূহ। মহাস্থানে প্রাপ্ত শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির মূর্তি মৌর্য পরবর্তী সময়ের পুণ্ড্রবর্ধনের সমৃদ্ধির কথা কিছুটা ইঙ্গিত দেয়।[৩] বাংলাদেশে কুষাণ রাজ বংশের মুদ্রা অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। কিন্তু কেবলমাত্র মুদ্রার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তা বলা যায় না।[৪] প্রকৃত পক্ষে মৌর্য শাসনের পর হতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য আমরা খুব কমই পেয়ে থাকি।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। চীন দেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিঙ এর বর্ণনায় মহারাজ শ্রীগুপ্ত খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার বরেন্দ্রে বা তার নিকটবর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন জানা যায়। অনুমিত হয় এই শ্রীগুপ্তই গুপ্ত রাজবংশের আদি পুরুষ।[৫] তাঁর পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসনামলে বাংলাদেশের ঠিক কোন অঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে লিপি সাক্ষ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে গুপ্ত

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

২ তদেব, পৃ. ১৮।

৩ তদেব।

৪ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৫ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে তা জানা যায়। এ সময় বাংলাদেশে কতগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী সুসুনিয়া নামক স্থানে পর্বতগাত্রে খোদিত একটি লিপিতে পুস্করণের অধিপতি সিংহবর্মা ও তাঁর পুত্র চন্দ্রবর্মার উল্লেখ আছে।[১] সুসুনিয়ার নিকটবর্তী দামোদর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পোখর্না নামক গ্রামই এই রাজবংশের রাজধানী পুস্করণ বলে মনে করা হয়। পোখর্নার প্রাপ্ত বহু প্রাচীন কালের মূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গেছে। সম্ভবতঃ এই নিদর্শন সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার প্রাচীন পুস্করণের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় চন্দ্রকোট নামক এক দুর্গের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় চন্দ্রবর্মার রাজ্য বাঁকুড়া হতে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তাঁর রাজ্য জয়ের যে বিবরণ আছে তা হতে এ সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে সমুদ্রগুপ্ত যে সমুদয় রাজাকে পরাজিত করে স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে চন্দ্রবর্মা ছিলেন একজন। সমুদ্রগুপ্ত এই পুস্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেই পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেছিলেন।[২] উত্তর বাংলায় গুপ্তযুগের কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এই তাম্রশাসনগুলি থেকে জানা যায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি নামক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং গুপ্ত সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রাদেশিক শাসন কর্তার অধীনে ছিল। এই শাসনের কেন্দ্রস্থল ছিল পৌণ্ড্রনগর বা মহাস্থান। সমতট বা দক্ষিণ পূর্ব বাংলার সমতল অঞ্চল গুপ্ত রাজ্যের করদ রাজ্য ছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলাও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩] মোটকথা সমস্ত বাংলাদেশেই এ সময় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অংশমাত্র ছিল বলা যায়। তবে দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে গুপ্তরাজগণের শাসন প্রণালী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে হূন জাতির আক্রমণে ক্রমে গুপ্ত সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। এ সময়ে যশোধর্মন নামে এক বীর সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করেন। যশোধর্মনের সাম্রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী না হলেও তাঁর সময়ই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। ফলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনতা ছিন্ন করে একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য পরিণত

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২ তদেব।

৩ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

হয়।[১] দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে প্রাপ্ত মোট সাতখানি তাম্রশাসনে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাম্রশাসনগুলি থেকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণকারী গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। সমাচার দেবের স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া এ যুগের আরও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বাংলাদেশের নানা স্থানে আবিস্কৃত হয়েছে। নামাঙ্কিত শাসন মুদ্রা থেকে তাঁরা যে বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। সমুদয় মুদ্রায় যে সকল রাজার নাম আছে পন্ডিতগণ তাঁদের মধ্যে দুটি নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছেন। একটি পৃথ্বীর অপরটি শ্রী সুধন্যাদিত্য। এ আমলের সব রাজাই এক বংশীয় ছিল কিনা তা বলা যায় না। তবে সমুদয় রাজার মধ্যে গোপচন্দ্রই সর্ব প্রাচীন ছিলেন এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বঙ্গে তিনিই স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। ধর্মাদিত্য গোপচন্দ্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন। ধর্মাদিত্য ও সমাচার দেব বেশ কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। এ সময়ের তাম্রশাসনগুলি থেকে এ তিন রাজার অধীনে বঙ্গরাজ্য যথেষ্ট প্রভাব ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল বলে মনে হয়। এই বঙ্গ রাজ্যের অবসানের সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[২]

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরবর্তী গুপ্তবংশ বলে পরিচিত গুপ্ত উপাধীধারী রাজাগণ উত্তর বাংলায়, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশে ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল।[৩] এ সময়ে বাংলাদেশের এই অঞ্চল গৌড় নামে পরিচিত ছিল। অতএব গুপ্তনামধারী রাজাদের অধীনে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[৪] ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর বাংলা যে গুপ্ত শাসনাধীন ছিল তা দামোদর পুরের একটি তাম্রশাসন হতেই প্রমাণিত হয়। এই শাসনে বর্ণিত গুপ্তরাজা এই পরবর্তী গুপ্তবংশীয় ছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই বংশীয় রাজা মহাসেন গুপ্তও উত্তর বাংলায় তাঁদের অধিকার স্থাপন করেছিলেন।[৫] কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যুক্ত প্রদেশে মৌখরি বংশের রাজত্বের কথা জানা

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২ তদেব, পৃ. ২৪-২৬।

৩ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৪ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৫ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

যায় এই বংশের রাজা ঈশানবর্মার একটি শিলালিপিতে। সুতরাং এই মৌখরি ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণের মধ্যে অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী বিবাদ চলতে থাকে। গুপ্ত বংশের শিলালিপি অনুসারে গুপ্ত রাজ কুমার গুপ্ত ঈশানবর্মাকে পরাজিত করেন এবং কুমার গুপ্তের পুত্র দামোদর গুপ্ত মৌখরিদের সাথে যুদ্ধে জয় লাভ করেন।[১] অতঃপর এ শতাব্দীর শেষভাগে গুপ্তরাজ মহাসেন গৌড় এবং মগধ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দক্ষিণ হতে চালুক্য রাজের আক্রমণে সম্ভবতঃ পরবর্তী গুপ্তরাজগণ হীনবল হয়ে পড়ে এবং শশাঙ্ক নামক এক ক্ষমতাশীল রাজা এ রাজ্য দখল করেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে কিংবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকে শশাঙ্ক গৌড় দেশে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বাঙালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি হিসেবে বিবেচিত।[২] এ সময় গৌড় রাজ্যের সীমা মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বলতে হয় উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার মত শক্তি এই রাজাই অর্জন করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশের প্রথম পদক্ষেপ হয়।[৩] সুতরাং শশাঙ্ক প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে পরিচিত। বাংলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশও শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল। তবে দক্ষিণ পূর্ব বাংলা তাঁর অধীনে ছিল কিনা বলা যায় না। মগধ তার রাজ্যভুক্ত ছিল।[৪] যা হোক এ কথা স্পষ্ট যে সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের ক্ষমতাশীল গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণ। তিনি দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি মেদিনীপুর জেলা, উৎকল ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন।[৫] উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাজশক্তি ও তাদের মিত্র, থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সাথে শশাঙ্ক এক পর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

২ তদেব, পৃ. ২৭।

৩ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৪ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৫ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

পড়েন। কিন্তু তিনি এই মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় রাজ্য অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১] তাঁর সমৃদ্ধি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য তেমন কোন ঐতিহাসিক উৎস এদেশে নাই। তথাপি বলতে হয় বাংলার প্রাচীন রাজনীতিতে শশাঙ্ক একটি বিশিষ্ট নাম।

য়ুয়ান্-চোয়াঙের উক্তি হতে প্রমাণিত হয় যে, ৬৩৭ অব্দের অনতিকাল পূর্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। তাঁর তিনখানি লিপি পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে একটির তারিখ ছিল ৬১৯ অব্দ।[২] শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাঁর এই বিশাল সাম্রাজ্য কয়েক বৎসরের মধ্যে শত্রুর করতলগত হয়। আনুমানিক ৬৪১ অব্দে হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন এবং তারপরই তিনি উৎকল, কঙ্গোদ বিজয় করার প্রচেষ্টা করেন। এই সময়ই হর্ষবর্ধন কামরূপের (আসামের) রাজা ভাস্করবর্মণ গৌড় রাজ্য জয় করে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরী অধিকার করেন। এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণ বা বিবরণ আমাদের জানা নাই। আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে উক্ত হয়েছে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। একাধিক রাজার অভ্যুদয়, আত্মঘাতী বিদ্রোহই সম্ভবতঃ গৌড়ের রাজশক্তি দুর্বল ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।[৩]

পরবর্তী একশত বৎসর গৌড়ের ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগ। গৌড়ে শশাঙ্কের শক্তিশালী শাসনের অবসান হলে নানান অরাজকতার সূচনা হয়, এই সময় কালকে পাল তাম্র শাসনে মাৎস্যন্যায় নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণ হতে আমরা জানতে পারি শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্তীকালে বাংলার সমতট নামে স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্বের কথা। এখানে এক ব্রাহ্মণ বংশ রাজত্ব করতেন এবং শীলভদ্র নালন্দার বৌদ্ধ স্থবির এই ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান ছিলেন। অতঃপর বাংলাদেশে যে রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল খড়্গ বংশ।[৪] বঙ্গে খড়্গ বংশ সপ্তম শতাব্দীর

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩ তদেব, পৃ. ৩৪।

৪ তদেব, পৃ. ৩৬।

শেষের দিকে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করে। আশরাফপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন সমূহে তাদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[১] এই বংশের খড়োগাদ্যম, জাত খড়গ ও দেবখড়গ তিনজন রাজা সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই রাজগণের রাজ্য দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিকদের অনুমান তাঁদের রাজধানী ছিল কর্মান্ত বর্তমানে তা কুমিল্লার নিকটবর্তী বড়কামতা নামে পরিচিত। চীনা পরিব্রাজকের লেখায় সমতটের রাজা রাজভটের বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগের কথার উল্লেখ থেকে এই রাজভট রাজাকে খড়গবংশীয় বলে ধারণা করা যায়। খ্রীস্টীয় অষ্টম হতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত খড়গবংশী নৃপতিগণ রাজত্ব করেছিলেন বলে অনুমিত হয়।[২]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় দুটি রাজবংশের কথা জানা যায়। গৌড় ও মগধে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় আদিত্য সেন ও তাঁর তিনজন উত্তরাধিকারী এবং বঙ্গে খড়গ বংশ। কিন্তু উভয় রাজবংশই বেশীদিন তাঁদের শাসন অক্ষুন্ন রাখতে পারে নাই। বৈদেশিক আক্রমণে তাঁদের পরাভূত হতে হয়। অল্পকালের মধ্যে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মার আক্রমণের কথা বাকপতি রচিত গৌড়বহো গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। এ সময় বঙ্গরাজের শক্তির কাছে বঙ্গের খড়গ বংশীয় রাজা রাজভট পরাস্ত হওয়ার কথাও জানা যায়। যশোবর্মা গৌড়-বঙ্গ অধিকারের অল্পকাল পরেই কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্যের কাছে পরাজিত হন। কলহণ রচিত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে তার বিবরণ আছে। তবে ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় এবং পরবর্তী কামরুপরাজ শ্রীহর্ষের বঙ্গ বিজয়ের তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৩] অতএব অনুমান করা যায় শশাঙ্কের পরবর্তী এই সময়ে কোন স্থায়ী শাসন গড়ে উঠতে পারেনি। কেননা, ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতী ভাষায় লামা তারনাথের লেখায় দেখা যায়, সমগ্র দেশে তখন কোন রাজা ছিল না। প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করতেন।[৪]

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।

৩ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫।

৪ তদেব, পৃ. ৩৬।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লিখিত গ্রন্থে বিভিন্ন রাজার আক্রমণ বিজয়াভিযানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এ সময়ের কোন রাজার রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সময়ের একটি রাজবংশ রাত উপাধিধারী কুমিল্লা অঞ্চলে রাজত্ব করার কথা সাক্ষ্য প্রমাণে জানা যায়। জীবধারণ রাত এবং তাঁর পুত্র শ্রীধারণ রাত এই দুই রাজার সমতটেশ্বর উপাধি ছিল। শ্রীধারণের তাম্রশাসনে উক্ত হয়েছে যে, সমতটাদি অনেক দেশ তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন রাত বংশ খড়গ বংশের সামন্ত ছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবে এ দুই বংশ সমসাময়িক ছিল। শ্রীধারণের কৈলান তাম্রশাসন হতে জানা যায় ক্ষীরোদা নদী বেষ্টিত দেবপর্বত এ বংশের রাজধানী। দেবপর্বত কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ছিল এবং সমগ্র লালমাই-ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলে ঐ দেবপর্বতের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।[১] এই খড়গ ও রাত বংশের পরপরই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট অঞ্চলে দেব রাজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই অঞ্চলে দেব বংশের আধিপত্য এখানকার পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে, তিনটি তাম্রশাসন ও কিছু সংখ্যক মুদ্রা হতে দেব বংশের পরিচয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ময়নামতীতে প্রাপ্ত দুটি তাম্রশাসন মহারাজা শ্রী আনন্দদেব এবং পরবর্তী রাজা শ্রী ভবদেব সম্পর্কে আলোকপাত করে। শ্রী ভবদেবের তাম্রশাসনেও তাঁদের রাজধানী দেবপর্বত বলে উল্লেখিত আছে। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব বাংলা যখন এই দেবরাজ বংশের শাসনাধীন ছিল তখন উত্তর পশ্চিম বাংলায় পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে নবযুগের সূচনা করেছিল। প্রায় চারশত বৎসর ধরে এ বংশ বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিলো। এছাড়াও প্রভাবশালী পাল রাজাগণ বাংলার বাইরে কামরূপে এবং উত্তর ভারতের সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। গুপ্ত আমলের প্রবর্তিত রাষ্ট্রযন্ত্র স্বাধীন বঙ্গীয় রাজাদের আচার অভ্যাস

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

২ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬-৮৭।

পালবংশের সুদীর্ঘকালের শাসনামলে এক্মাবর্ধমানভাবে প্রসারিত হয়েছিল।[১] গোপাল এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম নরপতি। খালিমপুর লিপির সাক্ষ্যে কোন কোন পণ্ডিতরা মনে করেন, গোপাল বাংলার জনসাধারণ ও প্রবীণ নেতাগণ দ্বারা রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গদেশই তাঁর শাসনাধীন হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা।[২] এ সময় তাঁর রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালের তেমন কোন বিবরণ আমাদের জানা নাই। গোপালের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে এটুকু জানা যায় তাঁর বংশধর সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। গোপালের পিতা বপ্যট একজন যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং গোপাল যে কোন রাজবংশ থেকে আসেননি তা স্পষ্ট। আবার দেখা যায়, গোপালের পুত্র ধর্মপাল সমসাময়িক একখানি গ্রন্থে 'রাজভটাদি' বংশ পতিত' বলে উক্ত হয়েছে এতে অনেকের অনুমান পাল রাজগণ খড়গবংশীয় রাজা রাজরাজভটের বংশধর।[৩]

গোপালের প্রতিষ্ঠিত পালশাসন তাঁর পুত্র ধর্মপাল ও পৌত্র দেবপাল কর্তৃক উন্নতির চরম শিখরে উঠে। ধর্মপাল (আনুঃ ৭৭০-৮১০) খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিম দিকে বিস্তৃত করেছিলেন এবং কান্যকুব্জে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ত্রিশক্তির এক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কান্যকুব্জের অধিকার নিয়ে গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় এবং তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে পালরাজ্যের সীমা পূর্বে ও পশ্চিমে আরো বৃদ্ধি করে এবং দাক্ষিণাত্যে তিনি অভিযান চালান। প্রতিহারদের বিরুদ্ধে তিনি স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাল লিপিমালায় দেবপালের বিরাট উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাঁর রাজ্যকাল আনুঃ ৮১০-৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। এ সময়ে উত্তর ও পশ্চিম বাংলায় কম্বোজ রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। প্রথম মহীপাল (আনুঃ ৯৮৮-১০৩৮) পিতৃরাজ্য পুনঃদখল

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২০৭-২০৮।

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৩৯।

৩ <u>তদেব</u>, পৃ. ৪১।

ACADEMIC PROGRAMMES OFFERED BY IGNOU

Sl. No.	Name of the Programme	Programme Code	Eligibility	Minimum age as on 1st January of the Academic Year	Duration in years min needed	max permitted	Fee	Medium of Instruction
1.	Master of Arts in Distance Education	MADE	Diploma in Distance Education (DDE) or Post Graduate Diploma in Distance Education (PGDDE)	No bar	1	4	Rs. 1,000/-	English
2.	Master of Library and Information Science	MLISc	BLIS Degree from any recognised University or any other qualification considered equivalent to BLIS such as PG Diploma in Library Science from a recognised University	No bar	3	5	Rs. 4,000/-	English
3.	Masters in Computer Applications	MCA	PGDCA, ADCA from IGNOU	No bar	1	3	Rs. 8,000/-	English
4.	Bachelor of Library and Information Science	BLISc	Bachelor's degree with 2 years' experience in a recognised Library	No bar	1	4	Rs. 1,700/-	English
5.	Bachelor of Science in Nursing (B.Sc Nursing)	B.Sc.N	10 + 2 with 3 years' Diploma in General Nursing & Midwifery or Any other nursing course of 6-9 months' duration in lieu of Midwifery with 2 years' experience in the profession or 10th class with 3 years' Diploma in General Nursing & Midwifery or any other nursing course of 6-9 months' duration in Midwifery with 5 years' experience in profession	No bar	3	5	Rs. 3,000/- per annum	English
6.	Bachelor of Science	BSc	10 + 2 with Science subjects or its equivalent qualification	No bar	3	8	Rs. 1,000/- per annum	English and Hindi
7.	Bachelor's Preparatory Programme	BPP$^{\alpha}$	No formal qualification	20 years	6 months	2	Rs. 200/-	English and Hindi
8.	Bachelor of Arts	BA	10 + 2 or its equivalent	No bar	3	8	Rs. 750/- per annum.	English and Hindi
9.	Bachelor of Commerce	BCom	10 + 2 or its equivalent	No bar	3	8	Rs. 750/- per annum.	English and Hindi
10.	Master of Business Administration	MBA$^{\alpha}$	Bachelor's degree + 3 years' Supervisory*/Managerial*/Professional experience*	25 years	3	–	Rs. 300/- per course (Total 21 Courses)	English
11.	Post Graduate Diploma in Human Resource Management (Direct Entry)	PGDHRM	Bachelor's degree + 3 years' Supervisory*/Managerial*/Professional experience* or Professional Degree in Engineering/Technology/Medicine /Architecture/Law or Professional qualifications in Accountancy, Cost and Works Accountancy, Company Secretaryship, etc. or A Master's degree in any subject	No bar	1	$2\frac{1}{2}$	Rs. 1500/-	English
12.	Post Graduate Diploma in Financial Management (Direct Entry)	PGDHRM						
13.	Post Graduate Diploma in Operations Management (Direct Entry)	PGDHRM						
14.	Post Graduate Diploma in Marketing Management (Direct Entry)	PGDHRM						
15.	Diploma in Management	DIM$^{\alpha}$	Bachelor's degree with 3 years' Supervisory/Managerial/Professional experience or Non-graduate with 5 years' Supervisory/Managerial experience	25 years	1	$2\frac{1}{2}$	Rs. 1,500/-	English
16.	Post Graduate Diploma in Journalism and Mass Communication	PGJMC	Graduate with 2 years experience in a media/communication org.	No bar	1	4	Rs. 1,500/-	English
17.	Post Graduate Diploma in Distance Education	PGDDE	Bachelor's degree in any subject/area	No bar	1	4	Rs. 700/-	English
18.	Post Graduate Diploma in Higher Education	PGDHE	Teachers in Institution of Higher Learning or Post Graduate degree holders in any subject with 50% marks or (professional degree holders with 50% marks)	No bar	1	4	Rs. 1000/-	English
19.	Advance Diploma in Construction Management	ADCM$^{\alpha\beta}$	3 years' Diploma in Civil Engineering	No bar	3	5	Rs. 13,900/-	English
20.	Advance Diploma in Water Resource Engineering	ADWRE$^{\alpha\beta}$	3 years' Diploma in Civil Engg./Agricultural Engg.	No bar	3	5	Rs. 13,150/-	English
21.	Post Graduate Diploma in Computer Applications	PGDCA$^{\alpha\gamma}$	Graduates or Professional degree holders such as AMIE or Grad IETE or any other qualification considered equivalent.	No bar	1	2	Rs. 6,500/-	English
22.	Bachelor in Computer Applications	BCA$^{\alpha\gamma}$	10 + 2 or its equivalent with Maths as a distinct subject	No bar	3	6	Rs. 10,750/- (total for 3 years)	English
23.	Certificate in Computing	CIC	10 + 2 or its equivalent	No bar	6 months	1	Rs. 1,200/-	English

Sl. No.	Name of the Programme	Programme Code	Eligibility	Minimum age as on 1st January of the Academic Year	Duration in years min needed	max permitted	Fee	Medium of Instruction
24.	Diploma in Computers in Office Management	DCO$^{\alpha}$	Bachelor's Degree or 10 + 2 or equivalent with 3 years' working experience.	No bar	1	4	Rs. 2,200/-	English
25.	Diploma in Creative Writing in English	DCE$^{\delta}$	No formal qualification	21 years	1	4	Rs. 1,100/-	English
26.	Diploma in Creative Writing in Hindi	DCH$^{\delta}$	No formal qualification	21 years	1	4	Rs. 1,100/-	Hindi
27.	Diploma in Rural Development	DRD	Bachelor's degree	No bar	1	4	Rs. 850/-	English Hindi
28.	Diploma in Nutrition and Health Education	DNHE	10 + 2 or its equivalent	No bar	1	4	Rs. 850/-	English
29.	Diploma in Early Childhood Care and Education	DECE	10 + 2 or its equivalent	No bar	1	4	Rs. 850/-	English
30.	Bachelor in Tourism Studies	BTS	10 + 2 or its equivalent	No bar	3	8	To be announced later	English
31.	Diploma in Tourism Studies	DTS	10 + 2 or its equivalent	No bar	1	4	To be announced later	English
32.	Certificate Programme in Tourism Studies	CTS	10 + 2 or its equivalent	No bar	6 months	2	Rs. 600/-	English
33.	Certificate in Food & Nutrition	CFN	No formal qualification	18 years	6 months	2	Rs. 250/-	Assamese, English, Gujarathi, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, and Tamil
34.	Certificate in Guidance	CIG	Teachers of recognised institutions or Pass in matriculation/SSC	21 years	6 months	2	Rs. 300/-	English and Hindi
35.	Nutrition for the Community (Non-Credit Course)	ANC	10 + 2 or its equivalent	18 years	–	–	Rs. 200/-	English and Hindi
36.	Organising Child Care Services (Non-Credit Course)	ACC	10 + 2 or its equivalent	18 years	–		Rs. 200/-	English and Hindi

* Supervisory experience means that the person is concerned with supervising or looking after the work of a minimum of three subordinates reporting to him/her.

* Managerial experience means that the person is concerned with some decision making responsibilities.

* Experience means post-degree/qualification experience.

* For PGJMC Experience means minimum of 2 years of working experience in a media/communication organisation.

EXPLANATION :

α. University conducts Entrance Examination.

β. This programme ultimately leads to B. Tech. (Civil) after a further study of 3 years.

γ. This programme ultimately leads to MCA after a further study of 2 years.

δ. Candidates have to give self appraisal alongwith application forms.

IMPORTANT NOTES :

1. Fees/Eligibility criteria are subject to change.
2. Professional qualification means academic qualifications in the area of Agriculture, Education, Engineering, Law, Library Science, Medicine, Pharmacy and Technology. A person having experience in conformity with abovesaid qualifications will be considered to have 'Professional Experience'.
3. University may also conduct Entrance Examination for PGDHRM, PGDFM, PGDOM, PGDMM, if necessary.
4. **Programmes generally commence from January every year.**

avid Hare Training College,
5/3 Ballygunge Circular Road, Calcutta-700 019
aulana Azad College,
Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700 013
ailway Technical School,
anchrapara, 24-Pargs (North)-743 145
darsh Mahavidyalaya,
evoke Road, Siliguri-734 401
. K. College,
.O. & Dist. Purulia-723 101
iovt. Teachers' Training College,
.O. & Dist. Malda-732 101
katwa College.
.O. Katwa, Dist. Burdwan-713 130
Darjeeling Govt. College,
.O. & Dist. Darjeeling-734 101
.B.N. Seal Govt. College,
Coochbehar-736 101
Midnapore College,
Midnapore 721 101
.A. College, Garia
Calcutta-700 084
Sikkim Govt. College,
.O. Tadong, Gangtok, Sikkim-737 102

RIKING CHARACTERISTICS

- Relaxed entry regulations
- Study according to the students' own pace and convenience
- Flexibility in choosing the combination of courses from a wide range of disciplines
- Study from the student's own chosen place (during the course of study a student can change his opted study centre to any centre anywhere in India except for certain exceptional cases).
- Students may sit for examinations (Entrance/Term-end) generally anywhere in Inida
- A student can pursue his study in any other University while being a student of IGNOU
- Cost effectiveness

PORTANT ACHIEVEMENTS

- Emergence of IGNOU as the largest Open University in the Commonwealth
- Establishment of Distance Education Council (DEC) for the coordination and determination of standards of Distance Education Systems in the country (1992)
- Recognition as Centre of Excellence in Distance Education by the Commonwealth of Learning (1993)
- Establishment of a Staff Training and Research Institute in Distance Education (STRIDE) with support from the Commonwealth of Learning (COL)
- Award of 100 Fellowships by COL as Rajiv Gandhi Fellowships to enable candidates from 19 countries in the Commonwealth to pursue IGNOU Programmes
- Launching of an IGNOU-ISRO joint project for establishing a one-way video, two-way audio teleconferencing (1993-94)

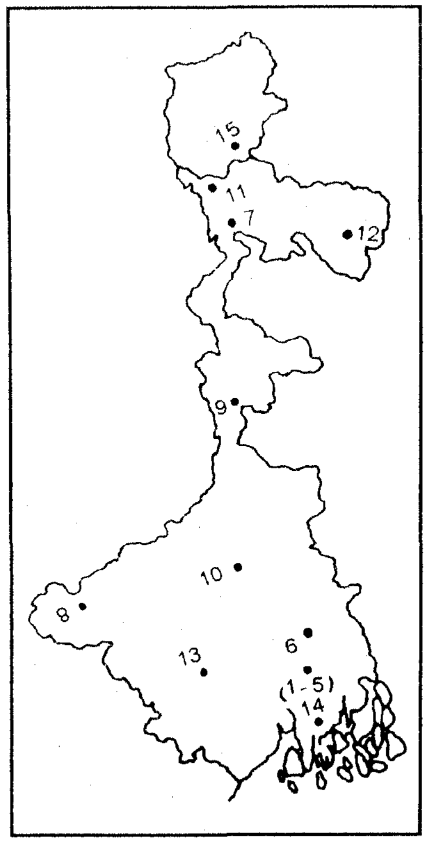
RECOGNITION

IGNOU is a Central University under the Ministry of Human Resources Development, Govt of Inida.

IGNOU Degress/Diplomas/Certificates are recognised by all the members of the Association of Indian Universities (AIU) and are at par with Degrees/Diplomas/Certificates of all Indian Universities/Deemed Universities/Institutions vide UGC circular NO : F. 1-8/92 (CPP) dated February 1992.

FOR UPDATED INFORMATION VIEW IGNOU TELECAST ENTITLED "OPEN CHANNEL" ON THE NATIONAL NETWORK OF DOORDARSHAN ON EVERY THIRD WEDNESDAY OF A MONTH DURING 6.30 A.M. TO 7.00 A.M.

Dots in the map indicate the places where IGNOU Study Centres in West Bengal & Sikkim are situated



Telephone : 34-9850
Fax : 91 033 347576
Grams : IGNOUCAL

Issued by :
The Regional Director
IGNOU Regional Centre for West Bengal & Sikkim
Bikash Bhavan, 4th floor, North Block
Bidhan Nagar (Salt Lake), Calcutta-700 091

IGNOU

Indira Gandhi National Open University

1.1 A NEW CONCEPT

The concept of an open university is an important innovation of this century. It aims to bring about revolutionary changes in the system of learning. The learner has the freedom to start a programme, to go at his own pace and stop learning activities whenever he wants to. It makes life-long learning a reality.

Open University today is a global phenomenon. The first Open University (UKOU) was established in England in 1969. Sixteen years later i.e., in 1985, IGNOU was established by an Act of Parliament to achieve the following objectives :

- To democratise higher education by taking it to the doorsteps of the students.
- To provide access to high quality education to all those who seek it irrespective of age, religion or formal qualification.
- To offer need based academic programmes by giving professional and vocational orientation to the courses.
- To promote and develop DISTANCE EDUCATION in India.
- To set and maintain standards in distance education in the country as an apex body.

1.2 GOVERNANCE

The President of India is the Visitor of the University. Authorities of the University include the Board of Management, Academic Council, Planning Board, Finance Committee, etc.

The Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellors, Directors, Finance Officer, Registrars and Regional Directors are important officers of the University.

1.3 INSTRUCTIONAL SYSTEM

The University follows the multimedia approach in instruction. It comprises of :

- Self-instructional printed course material packages
- Assignments for assessment and feedback
- Supporting audio-video programmes
- Face-to-Face interaction with academic counsellors at study centres
- Practicals at designated institutions
- Project work in some programmes
- Telecast of video programmes on National Network of Doordarshan
- Broadcast of audio programmes by All India Radio (Selected Stations)
- Teleconferencing by means of a two-way audio and one-way video

1.4 ADMISSION PROCEDURE

The University notifies admissions for its various programmes in the leading dailies from time to time indicating mode of obtaining the application forms, fees, etc. Forms can be bought from all our Study Centres, Regional Centres and Headquarters.

As soon as the admission is finalised either on the basis of an entrance test or as per the criteria laid down where there is no test, confirmation letter/admission notices are sent to the candidates.

1.5 EVALUATION SYSTEM

IGNOU has a three-tier system of evaluation

1) **Check Your Progress (Self-assessment) :**
   This is provided in study materiais and is meant for self-assessment.
2) **Assignments (Continuous Internal Assessment):**
   This carries a weightage of 25% to 30%. There are two types of assignments,
   (i) Computer Marked Assignment (CMA) and
   (ii) Tutor Marked Assignment (TMA). TMAs submitted at the study centre are returned to the students after evaluation with comments.
3) **Term End Examination :**
   This is the major component in the assessment of the student as 70% to 75% weightage is given to it. The University holds Term End Examination twice a year (JUNE & DECEMBER).

1.6 STUDENT SUPPORT SERVICES

Student support services are provided through a network of Study Centres scattered all over the country. Study Centres are the actual focal points to enable the students to receive regular information and learning support. Each Study Centre is provided with library, audio and video facilities for the students. Senior and experienced academics and professionals are engaged in face-to-face counselling to further help the students in the learning process. The Study Centres are generally located in existing educational institutions and normally function on all holidays and Sundays and in the evenings on working days. Each Study Centre is manned by part-time staff drawn from the host institution. To coordinate the functioning of Study Centres IGNOU has set up 16 Regional Centres in different parts of the country on date, viz., HYDERABAD, DELHI, AHMEDABAD, SHIMLA, BANGALORE, COCHIN, BHOPAL, SHILLONG, BHUBANESHWAR, JAIPUR, MADRAS, LUCKNOW, PUNE, KARNAL, PATNA AND CALCUTTA.

The Calcutta Regional Centre looks after the activities of the University in West Bengal and Sikkim. The Study Centres under its jurisdiction are :

1. Iswarchandra Patha Bhavan,
   299, A.P.C. Road, Calcutta-700 009
2. St. Xavier's College,
   30, Park Street, Calcutta-700 016
3. Aswini Datta Memorial,
   94/2, Park Circus, Calcutta-700 017

করেন এবং রামপাল এ সাম্রাজ্যকে সাময়িকভাবে রক্ষা করেন। কৈবর্তদের হাত থেকে তিনি বরেন্দ্র বা উত্তর বঙ্গ পুনরুদ্ধার করেন। তাই রামপালকে পালবংশের শেষ মুকুটমণি বলা হত। রামপালের রাজত্বের পর পাল বংশের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় সূচিত হয়। এ বংশের শেষ সম্রাট মদনপাল সেন বংশের বিজয়সেন কর্তৃক বাংলা হতে বিতাড়িত হন।[১] পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গোপালের রাজ্যের সমৃদ্ধি নিয়ে তারনাথ অনেক রূপকথার অবতারণা করেন তা ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' গ্রন্থে বরেন্দ্র (উত্তর বাংলা) পাল সাম্রাজ্যের 'জনকভূ' (পিতৃভূমি) বলে উল্লেখ করেছেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রলিপিতেও ঐ একই ইঙ্গিত আছে।[২] প্রথম মহীপালের বানগড় লিপিতে যে 'রাজ্যমপিত্র্যম্' এর উল্লেখ আছে তাও উত্তরবঙ্গ বলে মনে করা হয়। এইসব তথ্য হতে নিঃসন্দেহে অনুমিত হয় উত্তরবঙ্গ পালবংশের বা গোপালের আদিবাসস্থান ছিল এবং এ অঞ্চল হতেই তাঁদের ক্ষমতা বিস্তার হয়েছিল।[৩]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্তি করেছেন যে, পালগণ বঙ্গ অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করে সমস্ত বাংলাদেশে আধিপত্য করেন প্রথম থেকেই।[৪] এ উক্তি পূর্বে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কারণ সে সময়ে দক্ষিণপূর্ব বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে জানার উৎসের অভাব ছিল। বর্তমানকালে ময়নামতীতে প্রাপ্ত লিপিমালা হতে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক ইতিহাসের নূতন বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তথ্যাবলীর আলোকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় মুসলিম পূর্ব যুগে বৌদ্ধ ও দেব বংশ (আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) হতে চন্দ্র বংশের শাসনামল (আনুমানিক ৯০০-১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ) এই অঞ্চলের একটি গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ করে চন্দ্র নৃপতিদের সুদীর্ঘ ও গৌরবময় রাজত্বকাল সমকালীন উত্তরবঙ্গ ও বিহারের প্রতিষ্ঠিত পাল শাসনের সাথে তুলনীয় এবং তাঁদের খ্যাতি বাংলা ও কামরূপ বা আসামে বিস্তৃত ছিল।[৫] সুতরাং

---

১ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

২ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৩ তদেব।

৪ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৫ Harunur Rasid, "The Candra Rulers of Bengal," J.V.R.M., 1976-77, (University of Rajshahi, 1979), P. 31.

পাল বংশের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বা বঙ্গে তাঁদের আধিপত্য ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন যুক্তি* নাই।

পূর্ববর্তী দেববংশের পর দক্ষিণপূর্ব বাংলায় প্রবল পরাক্রমশালী চন্দ্রবংশের উদ্ভব হয়। তিব্বতীয় লামা তারনাথের রচনায় এ যুগের বেশ কয়েকজন চন্দ্রবংশীয় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চন্দ্রবংশীয় রাজারা খড়গ ও রাত বংশীয়দের নিকট হতে যে বঙ্গ জয় করেছিল তা অনুমান করা যায়। তবে চন্দ্রবংশের আদি ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের নিকট নাই। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আমরা বঙ্গে চন্দ্রবংশের শাসনামলের লিপি প্রমাণ পাই।[১] তাম্রশাসন সমূহ হতে ময়নামতীতে প্রাপ্ত সিলেট, ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ও ময়নামতীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন সমূহ হতে চন্দ্রবংশের ইতিহাস জানা যায়। চন্দ্র তাম্রশাসন সমূহ থেকে চন্দ্রবংশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।[২] ময়নামতীতে প্রাপ্ত তিনটি, ঢাকায় ১টি ও সিলেটের একটি তাম্রশাসন থেকে চন্দ্ররাজবংশের তালিকাও চন্দ্র রাজাদের কাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

চন্দ্রবংশের প্রথম রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজত্ব কালের কোন লিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। তাঁর রাজত্বকাল আনুঃ ৯০০-৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়। তবে এ বংশের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকে ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল রাজার ক্ষমতার আধার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] চন্দ্রবংশের ক্ষমতা লাভ সম্পর্কে এ বংশের তাম্রলিপিতে কিছু আভাস পাওয়া যায়। এ বংশের প্রথম নৃপতি পূর্ণচন্দ্র ও তাঁর পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের রোহিতাগিরিতে রাজত্ব করার কথা জানা যায়। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রই এ বংশের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) নৃপতি হন। অতঃপর তিনি সমতট অঞ্চলে ক্ষমতার বিস্তার করেন এবং সমস্ত বঙ্গে (দক্ষিণপূর্ব বাংলা) চন্দ্রবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সমতট জয়ের কথা উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী দেবরাজাদের

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২ H. Rasid, Op.Cit., P. 31-32.

৩ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

শাসনকেন্দ্র দেবপর্বত তাঁর ক্ষমতার উৎস ছিল এবং সে স্থানের সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি সমতট দখল করেছিলেন বলে জানা যায়।[১]

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের উত্তরাধিকারী পুত্র শ্রীচন্দ্রের শাসনকালে চন্দ্রবংশের প্রতিপত্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়। তিনি পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল আনুঃ ৯৩০-৯৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। শ্রীচন্দ্রের শাসনকালের মোট ছয়টি তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়েছে এবং তা থেকে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় তাঁর পরাক্রমশালী শাসনের কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, ঢাকা জেলার মানিক-গঞ্জ মহাকুমা, ঢাকা ফরিদপুরের পদ্মাতীরবর্তী এলাকা, শ্রীহট্ট অঞ্চল ও কুমিল্লা (নোয়াখালী), সমতট অঞ্চল তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল লিপি প্রমাণে তা জানা যায়।[২]

শ্রীচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র কল্যাণচন্দ্র চন্দ্রবংশের শাসনভার গ্রহণ করেন আনুঃ ৯৭৫ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর রাজত্বকালের একটিমাত্র তাম্রশাসন পাওয়া গেছে এবং এই লিপিতে তাঁর রাজ্যের তেমন কোন বর্ণনা নাই। কল্যাণচন্দ্রের ঢাকা তাম্রশাসনে বরং পিতামহ ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক গৌড়দের পরাস্ত করার কথা আছে। সম্ভবতঃ এই সময়ে গৌড় কম্বোজদের অধিকারভুক্ত ছিল।[৩] কল্যাণচন্দ্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র লড়হচন্দ্র। ময়নামতীতে লড়হচন্দ্রের দুটি এবং তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের একটি তাম্রশাসন আবিস্কৃত হওয়ায় চন্দ্রবংশে তাঁদের সমৃদ্ধি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দাব করে। তবে লড়হচন্দ্রের ও গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসনে নিবন্ধ প্রশস্তিতে তাঁদের শৌর্যবীর্যের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। লড়হচন্দ্রের শাসন কালের সময়সীমা আনুঃ ১০০০-১০২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়।[৪]

মুদ্রার ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে বাংলার এই চন্দ্রবংশীয় রাজারা আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। চট্টগ্রাম-কুমিল্লা অঞ্চলে আরাকানের

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

২ তদেব, পৃ. ৯২।

৩ H. Rasid, Op.Cit., P. 35.

৪ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৫।

প্রভাবের বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং আরাকানের চন্দ্রবংশীয় কোন ব্যক্তি কুমিল্লা অঞ্চলে ভূস্বামী হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই বংশেরই একজন দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় স্বাধীন চন্দ্রবংশীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়।[১] লড়হচন্দ্রের পর চন্দ্রসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। গোবিন্দচন্দ্রের নাম দুইটি মূর্তিলিপি, তিরুমলয় লিপি ও শব্দপ্রদীপ গ্রন্থ হতে জানা যায়। ময়নামতী তাম্রশাসনে তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালের অল্পকাল পরেই রাজেন্দ্রচোলের আক্রমণে রাজশক্তি অনেকাংশে হ্রাস পায় এবং তাঁদের শাসনের পতন ঘটায়। সুতরাং গোবিন্দচন্দ্রই যে চন্দ্রবংশের শেষ রাজা তা বলা যেতে পারে।[২]

আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্রবংশের শাসন ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় এবং পাল শাসন এ অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়।[৩] দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র পাল সম্রাট মহীপাল পাল রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেছিলেন। পূর্ব বঙ্গে পাল শাসন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। অতএব মহীপালকে লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের সমসাময়িক ধরে নিতে হয়।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই পালশক্তির দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় বর্ম উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত ভোজবর্মার তাম্রশাসনে ভট্টভবদেবের ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে এ বংশের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু এই বেলাব তাম্রশাসন ও ভবদেবের লিপির উপর নির্ভর করে বর্ম রাজবংশের ইতিহাসের রূপরেখা নির্ণয় করা যায়না।[৪]

দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেন বংশীয় বিজয়সেন বর্ম শাসনের অবসান ঘটিয়ে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় সেন বংশের শাসনের সূচনা করেন। পশ্চিম ও উত্তর বাংলা হতে পাল

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

২ তদেব, পৃ. ৯৫।

৩ তদেব, পৃ. ৯৬।

৪ তদেব।

শাসনেরও সমাপ্তি ঘটে এ সময় এবং সেন শাসনাধীনে সমগ্র বাংলাদেশ একক স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপি, বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন এই দুই লিপির উপর ভিত্তি করে বলতে হয় যে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটের এক সেনবংশ বহুদিন যাবৎ রাঢ়দেশে বসবাস করে আসছিল। এই লিপিমালা অনুযায়ী ধরা যেতে পারে এই কর্ণাট দেশীয় সেনবংশ ধীরে ধীরে ক্ষমতা সঞ্চয় করে এবং বাংলাদেশে সেন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে। পাল রাজগণের সৈন্যদের মধ্যেও কর্ণাটবাসী লোকের কথা জানা যায়। তাদের মধ্যে কোন সেন বংশীয় সৈন্য শক্তি সঞ্চয় করে পশ্চিম বাঙলায় সেন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করে বলে মনে করা হয়।

সামন্তসেনের পূর্বে সেনবংশের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনিই এই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্তসেনের সময়ে সেন বংশ রাঢ়ে ক্ষমতা অধিকার করেছিল। বিজয়সেনের লিপিতে তাঁকে মহারাজাধিরাজ বলে আখ্যা করা হয়েছে অতঃপর হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেনই স্ববংশীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় সফলতা ও সমৃদ্ধি লাভ করেন।[১]

বিদ্যমান সাক্ষ্য থেকে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন বিজয়সেন রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন যার বিনিময়ে তিনি রামপালের নিকট থেকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি পান এবং রামপালের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ক্ষমতা সম্প্রসারণ করে সমগ্র বাংলায় সেন বংশের আধিপত্য বিস্তার করেন। বিজয়সেন দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গেও সেন বংশের আধিপত্য লাভ করেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন জ্ঞানী, পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন সুকবি হিসেবে খ্যাতি ও একজন যোদ্ধার কৃতিত্ব নিয়ে সেন রাজ্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন।[২] কিন্তু লক্ষ্মণসেন ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী বীর বখতিয়ার খলজীর আক্রমণে পরাজিত হয়ে নদীয়া হতে বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুসলিম আধিপত্য প্রথমে উত্তর পশ্চিমবঙ্গে এবং পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় মুসলিম আক্রমণের সাথে শেষ হয় বাংলা নামক ভূখণ্ডের ইতিহাসের প্রাচীন যুগ।

---

১ আবদুল মমিন চৌধুরী, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৯৯-১০২।

২ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫৩-৫৪।

গ) প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্হা :

বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্হাকে জানতে হলে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় প্রাচীন বাঙালীর আদি সমাজ ও জাতিভেদের বিবর্তনের দিকে। অর্থনৈতিক ব্যবস্হা ও ধর্মীয় রীতি নীতির স্বরূপ নির্ধারণ ছাড়াও আর্থ-সামাজিক অবস্হা নির্ণয় সম্ভব হয় না। ভাষা ও নৃ-তাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ তথ্য, বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা, প্রাচীন সাহিত্য, কিছু সংখ্যক তাম্র ও শিলালিপি-সংগৃহীতও ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্হা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

আদিকালে বাংলার সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল কৌম ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী জাতি গোষ্ঠীর সমাজের উপর। এই কৌম সমাজ ব্যবস্হা আর্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কারণ আর্য সমাজ বর্ণাশ্রমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের চাতুর্বর্ণ্যের রীতিনীতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চার বর্ণের বিভেদ প্রথা বাঙালী সমাজে ছিল না। আর এজন্য আর্যরা প্রাচ্যদেশের মানুষের সাথে মেলামেশা করত না। তবে এই বৈদিক আর্যদের এমন বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বেশী দিন থাকেনি। পঞ্চনদের উপত্যকা থেকে আর্যরা যতই পূর্বদিকে এগিয়ে আসে ততই প্রাক আর্যজাতি সমূহের সাথে তাদের সংমিশ্রণ ঘটতে থাকে। এই সংমিশ্রণ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ঘটেছিল সন্দেহ নাই। এমনই তারা প্রাক আর্য জাতির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় রীতি, আচার অনেকাংশে গ্রহণ করতে থাকে।[১]

বৈদিক যুগের শেষ ভাগ থেকে বাংলাদেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতা বিস্তারের কথা জানা যায়। এদেশে আর্যদের বসবাস শুরু হয় এবং আর্য ধর্ম ও আর্য সমাজের প্রভাব পড়ে। ফলে বাঙালী সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন হয়। আর্যদের বর্ণাশ্রম আদর্শ বাংলার কৌম সমাজ ব্যবস্হার পরিবর্তন ঘটায় এবং নতুন সামাজিক বিধি ব্যবস্হার উদ্ভব হয়।[২] বলা যায়, আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালার অনার্য সংস্কার ও সংস্কৃতির

---

১ অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, (কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৩৮৩ বাং), পৃ. ৩৭।

২ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

এবং কৌম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বহু শতাব্দীর সংঘাত ও বিরোধের ফসল স্বরুপ বাংলার গুপ্ত আমল হতে আর্য ব্রাহ্মণ্য রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুপ্ত যুগের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলা-দেশে তেমন প্রসার লাভ করতে পারেনি।

প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক ছিল এবং কৌম জাতির অন্যতম ছিল পুণ্ড্র, বঙ্গ, কর্বট প্রভৃতি। এ থেকে অনুমান করা যায়, প্রাচীন জনপদগুলির নাম কৌম জাতির নাম অনুসারে রাখা হয়েছিল। অনুরুপভাবে মনে করা হয় এই পুণ্ড্রদের বংশধরই হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি এবং বর্তমান কৈবর্তজাতি কর্বট কৌমের বংশধর, এই দুই জাতি ছাড়া প্রাচীন বাংলায় আর একটি জাতি ছিল, বাগদী জাতি। আরও ছিল হাড়ি, ডোম, বাউড়ী প্রভৃতি জাতির পূর্ব পুরুষরা। প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায়, মৌর্যদের সময় পর্যন্ত রাঢ় দেশে বাগদী জাতিরা সংখ্যায় বেশী ছিল।

কৈবর্ত জাতিরা অব্রাহ্মণ্য ছিল তা বিষ্ণু পুরাণে উল্লেখ আছে। কৈবর্তদের সংস্কৃতি যে আর্যদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিহিত সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পাল আমলে এই কৈবর্ত জাতিরা প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। পাল রাজ অধীনস্থ এক কৈবর্ত সামন্তরাজ দিব্যোক তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অর্থাৎ পালরাজ দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করে বরেন্দ্র ভূমি অধিকার করেন। পরবর্তীতে তাঁর উত্তরাধিকারী রুদ্রোক ও ভীম বরেন্দ্র দেশ শাসন করেন বলে ঐতিহাসিকদের তথ্য থেকে অবহিত হওয়া যায়।[১]

এ সময় কৈবর্তদের সমাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্হান ছিল। তাদের অনেকেই তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। আর এক জাতির এ সময় প্রাধান্য দেখা যায় তারা হ'ল বর্তমান সদেগাপ জাতির পূর্ব পুরুষরা। তাম্রাশ্ম যুগ থেকেই এদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উত্তর রাঢ়ে সদেগাপদের প্রাধান্য ছিল। আরো উল্লেখ করতে হয়, পাল ও শূর বংশীয় রাজারা সদেগাপ ছিলেন। তাঁদের চেষ্টাতেই বাংলায় তন্ত্রধর্মের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল বলে জানা যায়। বস্তুতঃ তাঁরা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন।[২]

---

১ অতুলসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

২ তদেব, পৃ. ৩৮।

কিন্তু পাল যুগের পূর্ব হতেই বাঙালী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি আর্য ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে উত্তর ভারত থেকে ব্রাহ্মণরা বাংলাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছিল। সমসাময়িক তাম্রপট্ট সমূহ থেকে জানা যায় যে এ সময় বাংলায় চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বহু ব্রাহ্মণ্যকে ভূমিদান করা হয়েছিল। ফলে এই সময়কালে অনেক ব্রাহ্মণ্য মন্দিরও নির্মিত হয়। এই সকল লিপি থেকে জানা যায় এ সমস্ত ব্রাহ্মণদের বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপাদি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁদের উপাধি ছিল সাধারণতঃ 'শর্মা' ও 'স্বামীন'। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'গাঁই' প্রথার প্রচলনও ছিল। 'গাঁই' বলতে সেই গ্রামকে বোঝাত যে গ্রামে তারা প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে ষষ্ঠ সপ্তম শতকে 'গাঁই' রীতি প্রচলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভট্ট, চট্ট, বন্দ্যো ইত্যাদি উপাধি এই 'গাঁই' পদবি থেকেই এসেছিল।[১]

তাম্রপট্টলিপি থেকে ব্রাহ্মণেতর জাতি সমূহের আরো উপাধি পাওয়া যায়। দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মণ, দাস, ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, নাগ, চন্দ্র, দাম, ভূতি, বিষ্ণু, যশ, শিব, রুদ্র ইত্যাদি উপাধি বর্তমানকালে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতিরা নিজেদের পদবী হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু গুপ্ত যুগে আমরা কোন কায়স্থ জাতির পরিচয় পাইনা। পরবর্তীকালের লিপি সমূহে আমরা একশ্রেণীর রাজকীয় কর্মচারীর উল্লেখ পাই, যাদের নামের সঙ্গে প্রথম কায়স্থ, জ্যেষ্ঠ কায়স্থ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কায়স্থ এক বিশেষ বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম ছিল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' জাতির তালিকার মধ্যে 'কায়স্থ' এবং 'করণ' শব্দ দুটি সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং ব্রাহ্মণেতর উল্লেখিত পদবীগুলি কোন্ বর্ণের বা উপবর্ণের তা সঠিক করে বলা সম্ভব হয় না। লিপিসমূহে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'নগর শ্রেষ্ঠী' সার্থবাহ, ব্যাপারী প্রভৃতি অনেক উল্লেখ ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য জাতির সন্ধান পাওয়া যায় না।

গুপ্ত পরবর্তী যুগে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণদের 'সপ্তশতী' বা সাতশতী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হয়। পাল যুগের ভূমিদান সংক্রান্ত পট্টলিপি থেকে জানা যায়, পাল যুগে রাজারা

---

১ অতুলসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করেছেন। এসকল ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রজ্ঞ কর্মে পারদর্শী ছিল। তারাই যে 'সপ্তশতী' সমাজভুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং গুপ্ত যুগের ন্যায় পাল যুগেও সমাজ ব্যবস্থা একই রূপ ছিল। দুই যুগেই ব্রাহ্মণ্য সমাজে কোন জাতিভেদ ছিল না।

দেখা যায় পাল যুগে রাষ্ট্রই ছিল ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও পালক। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও পাল রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের, সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এ যুগে গৃহী-বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বীদের মত প্রচলিত বর্ণশাসন মেনে চলতেন। তাদের সাথে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক কোন পার্থক্য ছিলনা। তবে পাল যুগের ব্রাহ্মণ্য বর্ণ বিন্যাসের আদর্শ ছিল উদার।[১]

প্রাচীন বাংলায় ব্রাহ্মণ্য বর্ণই ছিল একমাত্র বিশুদ্ধ বর্ণ। প্রাচীন যুগের শেষভাগে বাংলায় রচিত প্রামাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে বহু শঙ্কর বর্ণ বা জাতির উল্লেখ আছে। প্রাচীন যুগের অবসানের অব্যবহিত পরে বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এই দুখানি গ্রন্থ রচিত হয় এবং দুখানি গ্রন্থ হতে প্রাচীন বাংলার সমাজের জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে ব্রাহ্মণেতর সমুদয় লোককে ৩৬টি শূদ্রজাতিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এই শূদ্র জাতী উত্তম, মধ্যম ও অধম শঙ্কর এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে করণ ও অম্বষ্ঠ শঙ্কর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অম্বষ্ঠগণ চিকিৎসা ব্যবসায় করত বলে বৈদ্য নামে অভিহিত হয়েছে। আর করণেরা লিপিকর ও রাজকর্মে অভিজ্ঞ এবং শূদ্র বলে কথিত হয়েছে। এই করণই পরে বাংলায় কায়স্থ জাতিতে পরিণত হয়েছে।

মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বিভিন্ন বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীর সন্তান হতেই বাংলায় মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাঙালী সমাজের প্রকৃত পরিচয় জানতে হলে বাংলার এই মিশ্র জাতি সম্বন্ধে জানতে হবে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মিশ্র বর্ণের মধ্যে কিছু কিছু প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, প্রথমে গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক, কুবর, তাম্বুলি, স্বর্ণকার ও বণিক ইত্যাদি সৎশূদ্র বলে অভিহিত। এর পরেই করণ ও অম্বষ্ঠের কথা আছে, তৎপর বিশ্বকর্মার ঔরসে শূদ্র গর্ভজাত নয়টি শিল্পকার জাতির উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে

---

১ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

মালাকার, কর্মকার, শংখকার, কুবিন্দক (তন্তুবায়), কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়টি উত্তম শিল্পী জাতি। এছাড়া নানাবিধ ম্লেচ্ছ জাতির কথা আছে, এরা বলবান, দুরন্ত, ক্রুর, নির্ভয়, রণদুর্জয়, দুধর্ষ, ধর্ম বর্জিত ও শৌচাচার বিহীন বলে বর্ণিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হড্ডি, ডোম, জোলা, বেদে এবং চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় নীচ জাতির উল্লেখ আছে, তাদের প্রায় সমস্তই এখনও বাংলাদেশে বর্তমান।[১]

প্রাচীন শাস্ত্র মতে সমাজের প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। কিন্তু এটা খুব কঠোর-ভাবে অনুসরণ করা হত না। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, এটাই ছিল ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট কর্ম। কিন্তু সমসাময়িক লিপি হতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ বিভাগ কর্ম করতেন। এরূপও দেখা যায় যে, কৈবর্ত উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, করণ যুদ্ধ ও চিকিৎসা করতেন, বৈদ্য মন্দিরে কাজ করতেন এবং দাস জাতীয় ব্যক্তি রাজকর্মচারী ও সভাকবি ছিলেন। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অন্ন গ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় কঠোরতা প্রাচীন হিন্দু যুগে ছিল না। একজাতির মধ্যে সাধারণতঃ বিবাহাদি হত, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর বর ও নিম্ন শ্রেণীর কন্যার বিবাহ শাস্ত্রে অনুমোদিত ছিল এবং কখনো কখনো সমাজে অনুষ্ঠিত হত। শিলালিপিতে প্রমাণ আছে, ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করতেন এবং তাঁদের সন্তান সমাজে ও রাজ-দরবারে বেশ সম্মান লাভ করত।[২] যাহোক ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা সমাজের আদর্শ ছিল। সমাজে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাও ছিল। প্রাচীন বংগ সমাজে ব্রাহ্মণের পরেই সম্ভবতঃ করণ জাতির প্রাধান্য ছিল। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সংকর জাতির মধ্যে প্রথমেই করণের উল্লেখ আছে। করণগণ যে খুব উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তারও প্রমাণ আছে। সামন্ত রাজা লোকনাথ করণ ছিলেন।[৩] কায়স্থরা পেশাদারী শ্রেণী হিসাবেই গণ্য হত এবং তারা রাজাদের মন্ত্রী ও এমন কি ভিষক হিসেবে নিযুক্ত হত। বস্তুতঃ নবম ও দশম শতাব্দী থেকেই কায়স্থরা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে গণ্য করতে শুরু করেছিল।

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-৯১।

২ তদেব, পৃ. ১৯২-৯৩।

৩ তদেব, পৃ. ১৯৮।

তখনই বোধ হয় অন্যান্য জাতি সমূহের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। কিন্তু অন্য কোন ব্রাহ্মণেতর জাতির উল্লেখ পাল যুগের অনুশাসন সমূহে বড় একটা পাওয়া যায় না। সমাজে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাদের নাম এই সকল অনুশাসন থেকে পাওয়া যায়, তাদের অন্যতম হচ্ছে মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডাল, কিন্তু চর্যাসাহিত্যে যে সকল জাতির উল্লেখ পাই তারা হচ্ছে ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিক। এরা সকলেই সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিল। অন্ত্যজবর্ণের যাযাবর ডোম-শবর-পুলিন্দ নিষাদ-বেদে প্রভৃতিদের অন্যতম বৃত্তি ছিল সাপ খেলানো, যাদুবিদ্যায় নানা খেলা দেখানো ইত্যাদি। এছাড়া বাঁশের ঝুড়ি, চাঙারি ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রয় ছিল তাদের বৃত্তি। সকলের নীচে স্থান ছিল কাপালিকদের। তারা নরকঙ্কালের মালা পরে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় ঘুরে বেড়াত।[১] উপরোক্ত জাতিবর্ণ, সমাজ ব্যবস্থা গুপ্ত ও পাল যুগ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সেন যুগে রাজারা ছিল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁরা যথেষ্ট প্রয়াসী হয়েছিলেন। সুতরাং এই সময়ের সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য পুনরায় ঘটে। এই যুগে নতুন করে ব্রাহ্মণ সমাজ সংগঠিত হয় এবং কিংবদন্তী অনুযায়ী সেন রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাঁই এর প্রাধান্য এই যুগে পরিলক্ষিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে, সেন যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে তাদের স্থান নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা সেন যুগেই অনুভূত হয়। এর ফলে বাংলাদেশে নানাজাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হয়।[২]

ব্রাহ্মণ, কুটম্ব, ক্ষেত্রকর, ভূমিবান, ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী, শিল্পী যেমন তন্তুবায়-কুবিন্দক, কর্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, চিত্রকার, সূত্রধার, প্রভৃতি ছাড়া নিম্নকোটি স্তরের লোকেরা সাধারণতঃ গ্রামে বাস করত। আর রাজা, মহাসামন্ত, সামন্ত, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, কিছু বণিক ও শিল্পী জাতীয় লোক শহরে বাস করতেন। এ থেকে বোঝা যায় প্রাচীন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করত।[৩] একেবারে আদিকালে

---

১ অতুলসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

২ তদেব, পৃ. ৪২-৪৪।

৩ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ) প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

নবোপলীয় যুগে অস্ট্রিক ভাষাভাষী কৌমগুলি যখন বাংলায় চাষাবাদ শুরু করল, ঠিক তখন থেকেই চাষের জমিকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল গ্রাম। একেকটি গোষ্ঠী ও পরিবার। গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠলো প্রাচীন বাংলার কৃষি নির্ভর সমাজ ও সভ্যতা। বাংলায় প্রায় সকল জাতির লোকই তখন কৃষিকর্মে লিপ্ত থাকত। তার প্রমাণ খ্রীস্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম শতাব্দীর অনুশাসন-সমূহে। এগুলিতে তাদের ক্ষেত্রকরণ, কৃষিকরণ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। মোটকথা খ্রীস্টীয় ১ম-২য় শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে কিছুটা উন্নত চাষাবাদ এবং ছোট খাটো গৃহশিল্প প্রাচীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বড় উপায় হয়ে দাঁড়ায়।[১] ডাক ও খনার বচনগুলিতে প্রাচীন বাংলার কৃষি প্রধান সমাজের অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

প্রাচীন কৃষি নির্ভর সমাজের কথা জানতে হলে তখনকার ভূমি ব্যবস্হাকে জানতে হয়। কারণ ভূমি ব্যবস্হার উপর নির্ভর করে সেই সমাজের শ্রেণীবিন্যাস রাষ্ট্রের রূপ, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পারিক সম্পর্ক।[৩] অষ্টম শতকের আগে প্রধানত তিন রকমের জমির কথা জানা যায়, বাস্তু, ক্ষেত্র, খিলক্ষেত্র। যেখানে লোকে ঘরবাড়ি তুলে বাস করত, তা বাস্তুভূমি। যে জমিতে চাষ করা হত, তাকে বলা হত ক্ষেত্রভূমি। যে জমি চাষের অযোগ্য, প্রাচীন লিপিতে তাকে খিলক্ষেত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] প্রাচীন কালে জমির মাপের তেমন নিখুঁত হিসাব ছিলনা। জমিতে বীজ বপন করার অনুপাত থেকে মোটামুটি জমির মাপ ঠিক করা হত। এক কুলায় যতটা বীজ ধরে তা দিয়ে যে পরিমাণ জমিতে ফসল বোনা যেত, তাকে এক কুল্যবাপ জমি বলা হত। দ্রোণবাপ, আঢ়বাপ এগুলি মাপও ধান রাখবার বিভিন্ন পাত্রের সাথে জড়িত ছিল।[৫] আর জমি মাপা হত নল দিয়ে। কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতের মাপের সমান নলের দৈর্ঘ নির্ধারণ করা হত। একজন সে সময় বিভিন্ন অঞ্চলে নলের দৈর্ঘ বিভিন্ন রকম ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই রীতিতে জমি মাপা হত। এ থেকে

---

১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৩ অজয় রায়, বাঙলা ও বাঙালী, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ৮০।

৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৫ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০।

বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন বাংলায় রাষ্ট্রের দিক থেকে জমি মাপার, জমি জরিপ এবং জমির বার্ষিক আয়, জমির দাম ঠিক করার রীতি ছিল। অনুমান করা যায় রাজাই দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন। দান হিসেবে যারা রাজার নিকট থেকে জমি লাভ করত, তাদের ছাড়া সবাইকে রাষ্ট্রের কাছে কর প্রদান করতে হত।[১] তবে যারা চাষ করত, তাদের স্বত্ব কিরূপ ছিল, রাজা অথবা জমিদারকে কি হারে কর দিতে হত ইত্যাদি বিষয়ে কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় না। লিপি সাক্ষ্যে জানা যায়, রাজারা মন্দির বা ধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করতেন। অনেক সময় বিত্তবান লোকেরা রাজার নিকট জমি কিনে ব্রাহ্মণকে জমি দান করতেন। এ ধরণের জমির মালিকানারাই নিষ্কর হত এবং গ্রহীতা বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী ভাবে ভোগ দখল করত।[২]

বাংলাদেশে কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধানই প্রধান ছিল। বস্তুতঃ ধানের চাষ অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জাতি সমূহের অবদান। গম ও যবের চাষ বাংলায় আর্যরা উত্তর ভারত থেকে এসে প্রবর্তন করেছিল। বাংলায় নানা জাতের ধানের মধ্যে শালি ধানের প্রসিদ্ধি ছিল।[৩] বগুড়ার মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে লিখিত শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, পুণ্ড্রনগরের একটি ধান ভাণ্ডারের কথা। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যের কবি প্রশস্তিতে প্রাচীন বাংলায় ধান মাড়াইয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। হুয়ান-চোয়াঙ বাংলার সর্বত্রই প্রচুর ফসল শস্য সম্ভারের কথা উল্লেখ করেছেন। তার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের তাম্রপট্টোলীগুলিতে।[৪]

ধানের পর আখ বা ইক্ষুই ছিল বাংলার কৃষিজাত পণ্য। সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁর 'রামচরিতে' উল্লেখ করেছেন, বরেন্দ্র ভূমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে, সেখানকার আখ ক্ষেত সমূহ। আখের রস দিয়ে চিনি, গুড় বাংলার বহু পূর্ব থেকেই উৎপাদিত হত। পণ্ডিত কানিং-

---

১ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৫০।

২ তদেব।

৩ অতুলসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০।

হাম বলেছেন, গুড় থেকে বাংলার জনপদ 'গৌড়' নামের উৎপত্তি হয়েছিল। গুড় যে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশেষ পণ্য ছিল তা খ্রীস্টপূর্ব কালের গ্রীসদেশীয় লেখকদের রচনা থেকে জানতে পারা যায়। কৃষি পণ্যের মধ্যে বাংলার সর্বত্রই তুলার চাষের কথা জানা যায়। সরিষার চাষও প্রাচীন বাংলায় খুব ব্যাপকভাবে হত। বরেন্দ্র দেশে এলাচের চাষ খুব বিস্তৃত ছিল। আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ, দারুচিনির ব্যাপক চাষের কথা রামচরিত কাব্যে আছে। তার বহু পূর্বে টলেমী, পেরিপ্লাস-এর নাবিক গ্রন্থকার ও অন্যান্য লেখকরা এ সমস্ত চাষাবাদের কথা উল্লেখ করে গেছেন, তা এদেশের পণ্ডিত, ঐতিহাসিকরা সকলেই স্বীকার করেছেন। আরো কয়েকটি পণ্য গুবাক বা সুপারি, নারিকেল উৎপন্ন হত গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী-করতোয়া ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল গুলিতে। সারা দেশব্যাপী ছিল পানের বরজ। পান খাওয়ার রীতি ও এদেশে ছিল অস্ট্রিক আমল থেকেই। এছাড়া বহু ফলবান বৃক্ষের বেশী করে চাষ হত যেমন, আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, তেতুল, আমলকী, ডুমুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল।[২] প্রাচীন বাংলায় মহুয়া বৃক্ষ খুব জনপ্রিয় ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনে বিস্তৃত মহুয়ার চাষ হত, তা জানা যায় উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত বহু অনুশাসনে। পর্যটক মার্কপোলোর ত্রয়োদশ শতকের লিখিত বিবরণে হরিদ্রা এবং বাংলাদেশে প্রচুর কার্পাস উৎপন্নের কথা জানা যায়।[৩]

বিভিন্ন তথ্য প্রমাণে প্রাচীন বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক স্থান লাভ করেছিল জানা যায়। কিন্তু কৃষি প্রধান এই দেশে খ্রীস্টজন্মের আগে থেকেই বস্ত্র শিল্পের খ্যাতি ছিল। সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালের চীন, আরব ও ইতালীয় লেখকদের রচনায় পাওয়া যায়। কার্পাসজাত সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়া রেশম বস্ত্রের উল্লেখ আছে অর্থশাস্ত্রে। পুণ্ড্রদেশে 'পত্রোর্ণ' নামে রেশমের খুব ভাল কাপড় পাওয়া যেত।[৪] 'ক্ষৌম', দুকূল' বস্ত্রের কথা জানা যায় যে, কাশী ও উত্তরবঙ্গে এক প্রকার মোটা কাপড় উৎপাদিত হত, তারই নাম ছিল ক্ষৌম। 'দুকূল' ছিল সূক্ষ্ম বস্ত্র

---

১ অতুলসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৪ অতুলসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

যা বঙ্গদেশে ও পুণ্ড্রবর্ধনে তৈরী হত।[১] কার্পাসিকা অর্থাৎ কার্পাস তুলার কাপড়ের জন্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকেই বাংলার বস্ত্র শিল্পের দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বাংলা হতে বহু পরিমাণ উৎকৃষ্ট সুক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হত। এই অতি সুক্ষ্ম বস্ত্র ইংরেজ আমলে 'মসলিন' নামে পরিচিত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে বলা হয়েছে, এদেশ থেকে সবচেয়ে মূল্যবান রপ্তানির জিনিস ছিল বাংলার মসলিন। খুব প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্র পথে বাংলার বাণিজ্য ব্যবসায় চলত। পেরিপ্লাস গ্রন্থে গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দরের কথার উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে তাম্রলিপ্ত বর্তমান তমলুক বাংলার প্রধান বন্দরের কথা জানা যায়।[২] ভারতীয় সাহিত্যেও বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্তির বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা পর্যটক য়ুয়ান-চোয়াঙ ও ইৎসিং উল্লেখ করেছেন। এ সমস্ত নদী বন্দর দিয়ে বাংলার অন্তঃ ও বর্হিবাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। বিশেষতঃ শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশের নানাস্থানে প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধাদি লক্ষ্য করা যায়। সেকালের হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক প্রভৃতি কর্মচারীর নাম থেকে শিল্প, বাণিজ্য দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও আয় উন্নতির ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য নদীপথে চলার কারণে নদী তীরে হাট, গঞ্জ, নতুন নতুন নগর, বন্দর গড়ে উঠেছিল।[৩]

স্থল পথেও অন্যান্য প্রদেশের সাথে বাংলার পণ্য দ্রব্য বিনিময় হত। কিন্তু এর বিবরণ বেশী পাওয়া যায় না। বিভিন্ন লিপিমালা বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনী এবং সমসাময়িক সাহিত্যে এ পথে বাণিজ্যের ইংগিত পাওয়া যায়। য়ুয়ান-চোয়াঙ এবং ফাহিয়েন প্রমুখ পর্যটকগণ স্থলপথে বাংলায় ভ্রমণ করায় তাদের বিবরণে এইসব পথের উল্লেখ পাই। ইৎসিঙ এর বর্ণনায় জানা যায় অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত একটি সুদীর্ঘ পথের কথা।[৪] এ সমস্ত পথে বণিকরা সুপারি, নারিকেল, পান, লবন, তেজপাতা, ইত্যাদির ব্যবসা করত।[৫]

---

১ আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৩ তদেব, পৃ. ২১১-২১২।

৪ R.C. Majumdar, Op.Cit., P. 663.

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮-১৯।

বাংলাদেশে প্রস্তুর ও ধাতুর তৈরী বস্তু বেশ উন্নতমানের ছিল। মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় বাংলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহে। বাংলার পোড়ামাটির কাজে, অসংখ্য তৈজসপত্র, মুর্তিতে প্রাচীন বাঙ্গালীর শিল্প দক্ষতা প্রকাশ পায়। সেকালের বিলাসিতার উপকরণ হিসেবে ধাতুর কাজে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল কর্মকার, মণিকাররা। কর্মকার, সূত্রধরগণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রী যোগাত।[১] কাষ্ঠ, হস্তিদন্তের কাজের উল্লেখ শ্রী হট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত কয়েকটি লিপিতে। হস্তিদন্ত শিল্পের এবং কাষ্ঠ শিল্পের কাজেও প্রাচীন যুগে তক্ষণকার, খোদাইকর, কাঠ মিস্ত্রীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।[২]

রাঢ় দেশের অরণ্য অঞ্চলে লৌহ উৎপাদনের কথা জানা যায়। 'গৌড়িক' নামে এক প্রকার রৌপ্যের উল্লেখ 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কৌটিল্য স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তার উল্লেখও করেছেন। কিন্তু গঙ্গা, তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়ে এদেশের বিভিন্ন শিল্প পণ্য রপ্তানী করে প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা আমদানীর কথা জানা যায়।[৩] মোটকথা বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব কাল থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বর্ণযুগ বলে মনে করা হয়। এ শতকের পরই বাংলার বাণিজ্যিক প্রসারে বিপর্যয় ঘটে। পাহাড়পুর, ময়নামতীতে প্রাপ্ত আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রা বাণিজ্য ব্যাপদেশে মুসলমান বণিকগণের আগমনের কথা এবং দেশী সাহিত্য কথা সরিৎসাগরে বাংলার তাম্রলিপ্তিতে বিত্তবান বণিকদের আগমণের কথা জানা যায়। তখন বাণিজ্য আরব বণিকদের হাতে চলে যেতে শুরু করে। এ সময় হতেই মুসলিম বণিকগণ পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের বাণিজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়।[৪] কিন্তু এ সময় সামুদ্রিক বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়না। পলি পড়ে সরস্বতী নদীর মুখ বন্ধ হয়ে নদীটি খাত পরিবর্তন হয়। অষ্টম হতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বাংলাদেশে আর কোথাও সামুদ্রিক বন্দর গড়ে উঠার

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

২ অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৪ তদেব, পৃ. ৯৬।

কথা জানা যায় না।[১] ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের কিছুটা অবনতি হয়। বাঙালীর ধর্মীয় জীবনের মুল বিষয়টি রাঢ়,পুণ্ড্র,বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কৌমের, এককথায় বাংলার আদিবাসীদেরই পুজা আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির মাঝেই বিরাজমান। এতথ্য সর্বজন স্বীকৃত যে, আদিবাসীদের জীবন প্রণালীর চলমান আচারানুষ্ঠানের অনেক কিছুই বাঙালীদের প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ ভাবে জন্মানুরবাদ, পরলোকে বিশ্বাস, প্রেততত্ত্ব, ইত্যাদি বাঙালীর সংস্কৃতির মাঝে বহমান ছিল।[২] বলতে হয়, এই আদিমতম ধর্মকর্ম ও ধ্যান ধারণার উপরই বাংলার বৈদিক ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য এবং অবৈদিক বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার।[৩] কিন্তু বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার অপেক্ষা লোকায়ত জীবনে দেখা যায় অধিকতর অর্থবহ হয়েছিল পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার। গুপ্তপর্বেই পৌরাণিক বিষ্ণু তাঁর নিজস্ব মর্যাদায় বাংলায় আসন লাভ করে। এরপর ভাগবদধর্ম গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর পর্বে এদেশে প্রসার লাভ করে এবং পাল পর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া পাহাড়পুরের ফলকগুলিতে শৈব ধর্মের প্রসার ও প্রতিপত্তির কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪] প্রাচীন বাংলায় আজিবিক ধর্মেরও বেশ প্রাবল্য ছিল। মৌর্য আমল পর্যন্ত এদেশে ঐ ধর্মের উপস্থিতির কথা চৈনিক পর্যটক যুয়ান-চোয়াঙ এর ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায়। অন্য এক ধর্ম জৈনধর্ম, এ শবর, দ্রাবিড়, কলিংগ ও গৌড় দেশবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[৫]

বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর পুজা উৎসব পালনের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন কালের সামাজিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। ধর্মশাস্ত্রে বহুবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে, জন্মের পূর্ব হতে মৃত্যুর পর পর্যন্ত মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় এগুলি পালনীয় হত। এ সংস্কারগুলি ছাড়া প্রাচীন বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধর্ম শাস্ত্রের

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৯৭।

২ <u>তদেব</u>, পৃ. ৯।

৩ <u>তদেব</u>, পৃ. ২৯৫।

৪ <u>তদেব</u>, পৃ. ৩০৯-১১।

৫ অতুল সুর, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫১-৫৬।

প্রবল প্রভাব ছিল। কোন কোন তিথিতে কি কি খাদ্য ও কার্য নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করতে হবে এবং অধ্যয়ন, বিদেশ যাত্রা, তীর্থ গমন প্রভৃতির জন্য কোন্ কোন্ কাল শুভ বা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেকের জীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত।

এ সমস্ত বাঁধাধরা নিয়মকানুনে আবদ্ধ সেকালের জীবন তাই বলে একেবারে নিরানন্দ বা বৈচিত্রহীন ছিল না। বিবাহ, অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্যে নৃত্য, গীত, আমোদ উৎসব হত। চর্যাপদে উক্ত হয়েছে বর বিবাহ করতে যাবার সময় মাদল, করন্ড, কশালা, সানাই, বাদ্যের কথা। এছাড়া নানা প্রকারের যাত্রা, রথযাত্রা, স্নান যাত্রা, দোল যাত্রা, লৌকিক ধর্মোৎসবে এই ধরণের যাত্রা বা সচল নৃত্যগীতসহ সামাজিক ধর্মানুষ্ঠানের বিবরণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায়। প্রাচীনকালে দারিদ্র্যাভিশাপ ক্লিষ্ট নিরানন্দ জীবনের একমাত্র আনন্দ ছিল গ্রামের বিচিত্র সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির পার্বণ ব্রত, সম্পন্নতর গৃহের পূজা-অথবা অন্যান্য উৎসব। এইসব আশ্রয় করেই তারা তাদের দৈনন্দিন দারিদ্র দুঃখ মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকতে চেষ্টা করত। বাঙালীর জ্ঞান চর্চার আগ্রহ ছিল ব্যাপক, তা জানা যায় অপর একজন চীনা পর্যটক ইৎসিঙের বর্ণনায়। তিনি বলেন এর জন্য বাঙালী বিদ্যার্থীরা সুদূর কাশ্মীর যেতে দ্বিধাবোধ করতেন না।[১] তাছাড়া জানা যায় সে সময় বাংলায় বেদ, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, ব্যাকরণ, অলংকার, ছন্দ আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, তন্ত্র প্রভৃতির জ্ঞানচর্চা প্রচলিত ছিল।[২] বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের গ্রন্থাদিও পঠিত হত। যাহোক, সে যুগে নারী শিক্ষার রীতি ছিল। নাগর সমাজের উচ্চ কোটি পুরের নারীরা লেখাপড়া শিখত বলে মনে করা হয়। পবনদূত কাব্যে নারীদের প্রেমপত্র রচনার ইঙ্গিত আছে। নানা কলাবিদ্যায় নিপুনতা তাদের অর্জন করতে হত।[৩] এছাড়া দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি ছাড়াও বাইরে কাজ করত, সওদা বেচা কেনা করত, অভিজাত গৃহে শিল্প

---

১ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩।

ধাত্রীর কাজ, সুতাকাটা, তাঁত বোনা বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মের মাধ্যমে তাদের স্বামীদের সাহায্য করত।[১] সেকালে নারীদের স্বাতন্ত্রতা ছিলনা বল্লেই চলে। প্রথমে পিতার, পরে স্বামীর পরিবারবর্গের অধীনেই তাদের থাকতে হত। পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলন ছিল, কিন্তু নারীদের মধ্যে তা নিষিদ্ধ ছিল।[২]

প্রাচীন বাংলার গ্রামের লোক বাস করত এখনকার মতোই কুড়েঘড়ে। তাদের গ্রামগুলির চারপাশে থাকত চাষের ক্ষেত এবং গ্রামগুলি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। সরল কৃষি নির্ভর সমাজের যেটুকু প্রয়োজন তা গ্রামেই উৎপাদিত হত। প্রাচীন প্রত্নসাক্ষ্য মৃৎফলকের, পান্ডুলিপির চিত্র হতে মনে হয় সে সময় আজকের মত বাঁশের বা কাঠের খুঁটির উপর ধনুকাকৃতি বা দুই তিন স্তরে পিরামিডাকৃতির চাল বা ছাউনি দিয়ে, বাঁশের চাঁচারি দিয়ে বুনে বেড়া তৈরী করে ঘরগুলি বানান হত। চর্যাগীতিতে বাঁশ দিয়ে বেড়া বাঁধবার কথার উল্লেখ আছে।[৩]

প্রাচীন বাংলা কৃষি নির্ভর হলেও শাসনকেন্দ্র বন্দর, ধর্মস্থান প্রভৃতির প্রেরণায় অনেক-গুলি বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। রামচরিত ও পবনদূতে রামাবতী ও বিজয়পুরের বর্ণনা এবং বানগড়, রামপাল, মহাস্থানগড়, দেওপাড়া প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষ হতে মনে হয়, সমৃদ্ধ নগরবাসীরা ইটকাঠের তৈরী ক্ষুদ্র বৃহৎ হর্ম্যে বাস করত, রাজ প্রাসাদ তৈরী হত ইট কাঠেই।[৪] সমানুরান ছাদ বিশিষ্ট কোঠাবাড়ীও দেখা যায়। এছাড়া নানা স্থানে মন্দির, স্তুপ, বিহার, উদ্যান, পুস্করিণী, পুষ্প, লতা, গুল্ম নগরের শোভা বৃদ্ধি করত।[৫]

নগরের বিত্তবান লোকের গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে নানা জিনিসের উল্লেখ চর্যাগীতি, রামচরিত, পবনদূত প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এবং সেগুলির প্রতিকৃতি প্রস্তর ও মৃৎফলকে দেখা যায়।

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭,২৯২।

২ কে,এম, রাইছউদ্দীন খান, বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা, প্রাচীন যুগ, (ঢাকাঃ খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৮৩), পৃ. ১৭৯।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

৪ তদেব,

৫ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

যেমন সোনা, রুপার তৈরী থালাবাসন, জিনিসপত্র। কিন্তু গ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থেরা কাঁসার এবং দরিদ্র লোকেরা সাধারণতঃ মাটির ভোজন ও পানপাত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতীর মৃৎফলকে এবং নানা প্রস্তর ফলকে মাটির খেলনা, ফুলদানি, খাট, নানা আকৃতির কলস, বাটি, পান ও ভোজন পাত্র, মাটির জালা, লোটা, দোয়াত, দীপাধার, ঘড়া, জলচৌকি, পুস্তকাধার প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।[১]

প্রাচীন বাংলার লিপিগুলিতে যেসব গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রামের প্রান্তসীমায় রাজপথের উল্লেখ। এই পথগুলি গ্রাম হতে নগরে বিস্তৃত ছিল। সুতরাং এইসব স্থল পথ ছাড়া নদীমাতৃক দেশের অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, খাটিক-স্রোতিকা ইত্যাদি বেয়ে জলপথ চালু ছিল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে যত লিপি আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতে এইসব জলস্রোতের উল্লেখ প্রচুর এবং এ থেকে ধারণা জন্মায় যে, জলপথে নৌকা যোগে যাতায়াতই ছিল স্থলপথে যাতায়াত অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আর নৌকার সংগে বাঙ্গালী জীবনের ঘনিষ্ট আত্মিক যোগের কথা ধরা পড়েছে চর্যাগীতিতে। স্থল-পথে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বা নগরে যাবার লোকায়ত যান ছিল গরুর গাড়ী। গরুর গাড়ীর চেহারা এখনো যেরূপ প্রাচীনকালেও তাই ছিল, বাংলা ও ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন প্রস্তর মৃৎফলকই তার প্রমাণ। পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে সুসজ্জিত অশ্বের একটি চিত্র আছে। এছাড়া কেশব-সেনের ইদিলপুর লিপিতে একটু প্রচ্ছন্নভাবে হস্তি দন্ত নির্মিত বাহুদণ্ডযুক্ত পালকির উল্লেখ আছে।[২]

বাঙ্গালীর আহার্য ও পানীয় এর মধ্যে রুচি বোধ সুস্পষ্ট ছিল। প্রাকৃত পৈংগল গ্রন্থে দেখা যায় ঘি সহযোগে গরম ধূমায়িত ভাত ছিল প্রকৃত বাঙ্গালীর আহার্য। এমনকি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাত পরিবেশন করা হত।[৩] উচ্চ কোটির লোক হতে আরম্ভ করে নিম্নতম কোটির লোক পর্যন্ত সকলেরই প্রধান ভোজ্য বস্তু ছিল ভাত। ভাত সাধারণতঃ খাওয়া হত

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

২ তদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১-৮২।

৩ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

শাক-পাতা, তরি-তরকারী ও মাছ-মাংস সহযোগে। বিবাহ ভোজে ব্যঞ্জন তরকারী প্রভৃতির বাহুল্য সেই যুগেও উচ্চ কোটির বাঙালী সমাজে যথেষ্ট ছিল। এই ধরণের বৃহৎভোজে সামাজিক অপচয়ের কথা ইৎসিঙ বর্ণনা করে গেছেন।[১] কারণ এইসব ক্রিয়াকর্মে রান্নায় প্রচুর পরিমাণ মশলার ব্যবহার ছিল। তারপর দেওয়া হত দই ও নানা ধরণের মিষ্টি পিঠা। পানীয় হিসাবে দেওয়া হত কর্পুর মিশ্রিত সুগন্ধি জল। মশলাযুক্ত পান।[২] আদি অস্ট্রেলীয় মূল বাংলায় মৎস অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তু। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ পঞ্চম শতক হতেই খাদ্যের জন্য প্রাণী হত্যার প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে একটি নৈতিক আপত্তি ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছিল এবং আর্য ব্রাহ্মণ্য ভারতবর্ষ ক্রমশ নিরামিষ আহার্যের পক্ষপাতী হয়েছিল। ফলে এর প্রভাব বাংলায় বিস্তৃত হয়েছিল, সন্দেহ নাই। তবে বাংলার অন্যতম প্রধান ও প্রথম স্মৃতিকার ভট্ট ভবদেব সুদীর্ঘ যুক্তি তর্ক উপস্থিত করে বাঙালীর মৎস্য ও মাংস আহারের গভীরতাসু ও সুপ্রচলিত এর কথা সমর্থন করেছেন।[৩] পাহাড়পুর ও ময়নামতিতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলির কয়েকটি-তেই মাছ কাটা ও চুপড়ীতে করে মাছ হাটে নিয়ে যাবার দৃশ্য উৎকীর্ণ থেকে সেকালে বাঙালীর মৎস্য প্রীতির ব্যাপারটি বোঝা যায়। হরিণের মাংস সমাজের সর্বস্তরেই আদৃত হত। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ফলকেও দেখা যায়, শিকারের পর শবর পুরুষ হরিণ কাঁধে ফেলে বাড়ী যাচ্ছে।[৪]

ফলের মধ্যে আম ও কাঁঠালের উল্লেখ লিপিমালায় সুপ্রচুর। কলা আদি অস্ট্রেলীয়দের দান, প্রাচীন বাংলার চিত্রে ও ভাস্কর্যে কলা গাছের বাস্তব চিত্র অনেক, কলার মতো কলাগাছের ব্যবহার বাঙালী সমাজে নানা কারণেই ব্যাপক ছিল। বিভিন্ন সামাজিক বা আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে তা ব্যবহৃত হয়। যেমন পার্বণ, বিবাহ, মঙ্গলযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কলাগাছের ব্যবহার সমসাময়িক সাহিত্যেও দেখতে পাওয়া যায়।[৫]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭।

২ অজয় রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৩ তদেব, পৃ. ২৭৮।

৪ তদেব, পৃ. ২৭৮-৭৯।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক উপাদান-সমূহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি কাঠামো খুঁজে পাই। যা হতে সে যুগের সমাজতাত্ত্বিক রীতি পদ্ধতি যথা বর্ণ ও শ্রেণী এবং তার সাথে সমাজের বা রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, সমাজের সংস্কৃতির রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। এছাড়া যুগের সংস্কৃতির সামগ্রিকতা ধর্মের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত। স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সাহিত্যের সৃষ্টি ধর্মচর্চার ফলেই হয়েছিল সন্দেহ নাই। সুতরাং ধর্মকে কেন্দ্র করেই সংস্কৃতির বিকাশ বলা যায়। মূলতঃ প্রাচীন বাঙ্গালীর জীবনের মৌলিক বিষয়গুলি ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। অতএব, ধর্মীয় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণের চিত্র খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। যা প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন প্রত্নসাক্ষ্য সমূহে।

ঘ) প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে জানার উৎসঃ

আদিকাল থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমাদের বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন সম্পর্কিত ধর্মীয়, অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষা-পট নিয়ে আলোচনা করতে হয়। পাশাপাশি প্রাচীন যুগের রাজবংশের পরিচয় দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। বাঙ্গালীর এই বিষয়গুলি জ্ঞাত হওয়া ভিন্ন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ নিয়ে আলোচনা সম্ভব হয় না। তেমনি প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণের সম্পর্কে আলো-চনার পূর্বে এ বিষয়ে জানার উৎস সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা প্রয়োজন। এ যুগের রমণীর বেশ ভূষণের চিত্র তুলে ধরার জন্য এবং তার সাথে জড়িত উল্লেখিত বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভের উৎস হিসেবে প্রধানতঃ চারটি গুরুত্বপূর্ণ সাধ্যমের কথা বলতে পারিঃ (১) প্রত্নবস্তুসমূহ (Material remains), (২) লিপিমালা বা লেখমালা, (Inscriptions) (৩) চিত্রিত পাণ্ডুলিপি (Illustrated Manuscripts) এবং (৪) সাহিত্যিক উৎস, (Literary Works)।[১]

---

১ S. Hussain, Social Life of Women in Early Medieval Bengal, (Asiatic Society of Bangladesh, 1985), P. 2.

বাংলার প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ধ্বংসাবশেষ হতে সংগৃহীত পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য মূর্তি এবং লিপিমালা প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বলা যায়। পাল চন্দ্র ও সেন নৃপতিদের শাসনামলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এ সময়ের আর্থ-সামাজিক ও শিল্প সংস্কৃতির উৎকর্ষতা ও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে প্রাপ্ত দেব-দেবীর ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির ফলক সমূহ।[১] দেবদেবীর মূর্তি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলি ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির ফলকগুলি ব্যবহৃত হয়েছে বিহার-মন্দির গুলির গাত্র অলঙ্করণে। বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য লাভ করা যায় এই উপাদানগুলি থেকেই। বেশ ও ভূষণের বৈশিষ্ট সূচক তথ্যের উৎস হিসেবে উল্লেখিত প্রত্ননিদর্শনগুলি ঐতিহাসিকের নিকট অতি মূল্যবান।

বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতী এবং পশ্চিম-বঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়, পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাচীন মন্দির, স্তূপ এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত অগণিত পোড়ামাটির ফলক ও পাথরের দেবদেবীর মূর্তি এবং সমসাময়িককালের চিত্র-গুলিতে বেশ ভূষা, বিচিত্র গহনার সূক্ষ্ম, বৈচিত্র্যমুখী কারুকাজ প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের উজ্জ্বল চিত্রের সাক্ষ্য মেলে। সেই সাথে সে যুগের তক্ষণ শিল্পের নৈপুণ্যতা তথা শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে পাহাড়পুর, ময়নামতীর বিহার মন্দিরে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকগুলিতে রমণীর পোষাক, দেহসজ্জা ছাড়া লোকায়ত রমণীর সরল জীবনের নানা তথ্য দীপ্যমান।[২] দেবীমূর্তিগুলি বেশীর ভাগই ধর্মীয় শাস্ত্র নির্দেশে নির্মিত হয়েছে। এগুলি থেকে প্রাচীন যুগের রমণীর পোষাক ও অলংকারের সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা যায়। মূর্তি বা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে সেন যুগ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি তৈরী হয়েছে। ব্রোঞ্জে নির্মিত মূর্তির সংখ্যা ছিল অনেক।প্রটোঐতিহাসিক যুগ হতেই প্রাচীন বাংলায় সুপ্রচুর পোড়ামাটির ফলক তৈরী হয়েছিল। গুপ্তযুগ থেকে পোড়ামাটির ফলকগুলি বাংলার শিল্পকলায় উল্লেখযোগ্য স্থান

---

১ S. Hussain, <u>S.L.W.E.M.B.</u> P.2.

২ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৪৪২।

অধিকার করে আছে। পোড়ামাটির শিল্পচর্চা অবশ্য শুঙ্গ আমল বা তার অনেক পূর্ব হতেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। এই অঞ্চলে পাথরের অপ্রতুলতা বাঙ্গালী শিল্পীদের বহু প্রাচীন কাল হতেই যেন অনেকটা বাধ্য করেছিল শিল্পচর্চার উপকরণ রূপে সহজলভ্য মৃন্ময় ব্যবহারে। বাংলার লোকায়ত শিল্পী কুলের এই শিল্পচর্চার ধারা চরম উৎকর্ষ লাভ করে ময়নামতী, মহাস্থানগড় ও পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রের অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত পোড়া-মাটির ফলকে। ফলকগুলির বিষয়বস্তু বাংলার মানুষ, পশুপক্ষী, বৃক্ষ, ফল ও ফুল। গতিশীলতা ও শিল্পীর জীবন বোধে সমৃদ্ধ এই পোড়ামাটির ফলকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ তথা প্রাচীন বাঙ্গালীর সমাজ জীবনের একটি প্রধান আকর উৎস। বাংলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে প্রাপ্ত মূল্যবান পাথর ও পোড়ামাটির গুটিকা প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর ভূষণের মূল্যবান সাক্ষ্য। অনুমান করা যায় প্রাচীন বাঙ্গালী রমণী এ ধরণের গুটিকা দিয়ে গাঁথা হার ও অন্যান্য অলঙ্কার পরিধান করত।

বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে তথ্যের অন্য একটি উৎস চিত্রিত পাণ্ডুলিপি। এটিকে বাংলার প্রাচীনতম চিত্রকলার নিদর্শন বলা যায়। এগুলির প্রায় অধিকাংশই খ্রীস্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকের মধ্যে অঙ্কিত। তালপাতায় বা কাগজে হাতের লেখা পুঁথি অলংকরণোদ্দেশে ছবি আঁকা হত। ছবিগুলি ক্ষুদ্রায়তন সূক্ষ্মরেখায় ধীর অথচ তীক্ষ্ণ গতি, সূক্ষ্ম ও ঘন কারুকার্য অর্থাৎ রঙের বিন্যাস ও মণ্ডন প্রশস্যায়িত। এ পর্যন্ত চিত্র সম্বলিত পাণ্ডুলিপি ২০/২২ খানা পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে একখানা কাগজের পাতায় লেখা এবং ছবি আঁকা। অন্যান্য কয়টিই তালপাতার পুঁথি। পাণ্ডুলিপিগুলি বেশীর ভাগ পাওয়া গেছে নেপালে, কয়েকটি বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে অন্যত্র। তারিখ সম্বলিত পাণ্ডুলিপি কয়েকটির চিত্রশৈলী থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, এ সমস্ত পাণ্ডুলিপি শুধুমাত্র ধর্মীয় অবস্থার নয় পাশাপাশি তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের বিশেষতঃ রমণীদের পোষাক, অলংকার, কেশ বিন্যাসের এক অপূর্ব প্রতিফলন হয়েছে পাণ্ডুলিপিগুলির অঙ্কিত ছবিগুলিতে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় দেব-দেবীর প্রতিকৃতিগুলির সাজসজ্জার

মধ্যে দিয়ে সেকালের রমণীর বেশ ভূষার পরিচয় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সমসাময়িক অভিজাত নায়ক, ধর্মযাজক এবং বিত্তশালী শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এসব পান্ডু-লিপিগুলি অনুলিখিত ও চিত্রগুলি রূপায়িত।

যেসব গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে পান্ডুলিপিগুলি চিত্রিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, পঞ্চরক্ষা, ধারণী-গ্রন্থ, আর্যকারণ্ডব্যূহ, পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, কালচক্র, তন্ত্র, কারণ্ডব্যূহ, অপরিমিতায়ুর্ণাম, মহাযানসূত্র ইত্যাদি। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্মীয় শাস্ত্র মোতাবেক পুঁথিগুলি অনুলিখিত ও চিত্রিত হয়েছিল। তাই বিভিন্ন মহাযানী বজ্রযানী দেবদেবী চিত্র পান্ডুলিপিগুলিতে রূপায়িত। উৎকীর্ণ দেবদেবীর মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা, বসুধারা, তারা মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, মহাপ্রতিসরা, মহামন্ত্রানুসারিণী, নৈরাত্মা-যোগিনী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি, মঞ্জুশ্রী, ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া বুদ্ধ জীবনের লৌকিক কাহিনী ও জাতক কাহিনীর উপর কয়েকটি চিত্র রূপায়িত হয়েছে।[১]

উল্লেখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ৮টি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পান্ডুলিপি বাংলাদেশের ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই পান্ডুলিপিগুলি পালরাজ, মহীপাল, রামপাল, গোবিন্দপাল, গোপালদেব, বর্মণরাজ হরিবর্মার সময়কালের বলে জানা যায়। এছাড়া কারণ্ডব্যূহ এবং বোধিচর্যাবতারের দুইটি পান্ডুলিপি, পঞ্চরক্ষার একটি পান্ডুলিপি, অজিতঘোষ সংগ্রহের একটি পান্ডুলিপি, একটি গণ্ডব্যূহের সুদীর্ঘ পান্ডুলিপি যা একশত ছাব্বিশটি চিত্র সম্বলিত। শৈবপূজা ও শৈবধর্ম সম্বন্ধীয় একাধিক শৈবগ্রন্থের পান্ডুলিপি এবং অন্যান্য দু'চারটি পান্ডুলিপির কথা জানা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, একটিমাত্র পান্ডুলিপি শৈব-ধর্ম সম্পর্কিত ছাড়া উপরোক্ত প্রত্যেকটি পান্ডুলিপি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় । এই পান্ডুলিপি চিত্রগুলি ছাড়া তাম্রপটে উৎকীর্ণ স্বল্পায়তন তিনটি রেখাচিত্রের কথা আমরা জেনে থাকি। এই তিনটি রেখাচিত্রও একাদশ দ্বাদশ শতকীয় চিত্রশিল্পের নিদর্শন। এগুলির বিষয়বস্তু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী।[২]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৬-৬৬৮।

২ তদেব, পৃ. ৬৭০।

চিত্রগুলিতে ব্যবহৃত রংয়ের মধ্যে প্রধানত হলুদ, নীল, লাল, সবুজ, সাদা ও মিশ্র রং দেখা যায়। রংয়ের বিন্যাসে এবং বর্তনা সৃষ্টির কৌশলে অজন্তা শৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়।[১] পরিশেষে একথাই উল্লেখ করতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, লিপিমালা, সাহিত্যিক এবং চিত্রিত পাণ্ডুলিপি প্রাচীন বাংলার তথ্য নির্দেশনার বিশেষ সহায়ক।

লেখমালাগুলি হচ্ছে প্রাচীন বাংলার ভূমিদান বিক্রয়ের পট্টোলী বা দলিল শিলালিপি ও মূর্তিলিপি। খ্রীস্টীয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত বহু তাম্র পট্টোলী প্রাপ্তির কথা আমরা জানতে পারি। লেখমালার মধ্যে সর্বপ্রাচীন সাক্ষ্য পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে। এ লিপিটি আনুমানিক খ্রীঃপূঃ তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতকের একটি শিলাখণ্ড লিপি। ইহা মৌর্য সম্রাট অশোকের এদেশ অধিকার প্রতিষ্ঠার তথ্য প্রদান করে। সাথে সাথে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক উপকরণের সংবাদ এ লিপি হতে পাওয়া যায়।[২] এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পর্বত গাত্রে খোদিত লিপি চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা চন্দ্রবর্মার রাজত্বের সাক্ষ্য বহন করে। লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই লিপি হতে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩]

অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের পাল, সেন ও অন্যান্য রাজবংশের পট্টোলীগুলিতে প্রাচীন বাংলার ভূমিজাত দ্রব্যাদির অর্থাৎ ভূমি সম্পর্কিত যাবতীয় খবর এবং সামাজিক বর্ণ-বিন্যাস, আহার্য, পরিধেয় সম্বন্ধে প্রচুর উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান আছে।[৪] দু ধরনের লেখমালার কথা জানা যায়, একটি রাজ প্রশস্তি বা রাজাদের সাফল্যের বিবরণ প্রদান করে,

---

১ সরসী কুমার সরস্বতী, পাল যুগের চিত্রকলা, (কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮), পৃ. ১২-২৩।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

এগুলি রাজসভার কবি অথবা রাজস্বীকৃত ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত অপরটি ব্যক্তিগত লিপিমালা যাতে সুপরিসর বক্তব্য লেখা হত। কোন পারিবারিক বা একক জীবনের কথা দুই তিনটি শব্দের ছন্দে ছোট আকারে সফলভাবে প্রকাশ করা থাকত। সমাজ জীবনের নানা বৈষয়িক চিত্রের কথা ও সমাজের বিচিত্র তথ্য, সমাজের নিম্নকোটির অর্ন্তভুক্ত মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের উল্লেখ পাল অনুশাসন গুলিতে সুস্পষ্ট।

তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ঐতিহাসিক-গণ তথ্যের অনুসন্ধান করেন প্রাচীন যুগের সাহিত্যকর্মে। সাহিত্যে প্রাচীন বাংলার সমসাময়িক ঘটনাবলী ও সমাজের বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে রচিত হয়েছে। সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজ জীবনের চিত্রের মাঝে রয়েছে প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণের পরিচয় লাভ করার আরও একটি বিশেষ উৎস। প্রাচীন বাংলায় রচিত হয়েছে সংস্কৃত কাব্য সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, ধোয়ীর পবনদূত, গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতী এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ। এছাড়া সংস্কৃত কবিতা সঙ্কলন সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, বৌদ্ধ সাহিত্য চর্যাপদ, দোহাকোষ, ভবদেবভট্টের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণম, জিমূতবাহনের কালবিবেক, ও দায়ভাগ গ্রন্থ, হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্ব, অনিরুদ্ধের হারলতা ও পিতৃদয়িতা, রাজাবল্লাল সেনের অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর এবং কুল্লুকের ভাষ্য মানবধর্মশাস্ত্রাবলী এ সময়ে রচিত হয়েছে।[১] কাব্যগুলি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করলে দেখা যায় পাল যুগের সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত রামচরিত[২] গ্রন্থটির রচনা প্রণালী একটি দুরূহ শ্লেষাত্মক কাব্য এবং ইহার প্রতিটি শ্লোক সুকৌশলে রচিত হয়েছে। এতে একদিকে রামায়নের রামচন্দ্রের ও অপরদিকে পাল সম্রাট রামপালের (১০৭৭-১১২০ খ্রীষ্টাব্দে) রাজত্বকালের ঘটনাবলীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের উপসংহারে একটি কবি প্রশস্তি আছে, তা হতে জানা যায় যে, সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রের পুণ্ড্রবর্ধনের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা প্রজাপতি নন্দী রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।[৩]

---

১ S. Hussain, S.L.W.E.M.B., p. 6.

২ Sandhyakarandndi, Rāmacaritam, edited by R.C. Majumder and others, (Rajshahi, 1939).

৩ রামচরিত, কবি প্রশস্তি, ৩ ও ৯।

মদনপালের রাজত্বকালে এই কাব্য রচিত হয় এবং এই বংশের কথা রামচরিতে উল্লেখ আছে যে, রামপাল ভীম নামক কৈবর্ত রাজকে পরাজিত ও নিহত করে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করেছিলেন।[১] শ্লোকগুলিতে ঐতিহাসিক আখ্যান বর্ণনাহেতু এই কাব্যে কবিত্ব সর্বত্র পরিস্ফুট হয়নি। কিন্তু বরেন্দ্র ও রামাবতী নগরীর বর্ণনা ও ভীমের সাথে যুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি সাহিত্যের দিক দিয়ে উপভোগ্য। রামচরিত বাঙালীর সংস্কৃত কাব্যে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের পরিচয় এবং গৌরবময় সমাজ জীবনের চিত্রে সমৃদ্ধ।[২]

কবি ধোয়ীর 'পবনদূত'[৩] কাব্য মেঘদূতের অনুকরণে রচিত। খুব সম্ভব কবি ধোয়ী লক্ষণসেনের সভাকবি ছিলেন। গৌড়ের রাজা লক্ষণসেন যখন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন তখন মলয় পর্বতের গন্ধর্ব কন্যা কুবলয়বতী তাঁর রূপে মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রণয় বার্তা রাজার নিকট প্রেরণ করেন এই বিষয়বস্তুর উপর ১০৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এই দূত কাব্য রচিত হয়েছে।[৪] সমাজ জীবনের অনেক প্রতিচ্ছবি এই কাব্যে পাওয়া যায়।

রাজা লক্ষণসেনের সভাকবি কবি গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী' শৃঙ্গার কাব্যটি গোবর্ধনের অপূর্ব কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য শক্তির পরিচায়ক। সাত শতের অধিক শ্লোক সমৃদ্ধ এই কাব্যে প্রাচীন বাংলার সমাজ জীবন ও রমণীদের পোষাক, শিরোবিন্যাস, গহনা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।[৫] লক্ষণসেনের আরেক সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় রসশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি ধর্মগ্রন্থ বলে গণ্য। 'গীতগোবিন্দে' রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়া কেবলমাত্র

---

১ রামচরিত, ১ম পরিচ্ছদ, ৩৮ শ্লোক, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, P. 31.

২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-৮৬।

৩ Pavanaduta by Dhoyi, edited by Chintaharam Chakravarty, (Sanskrit Sahitya Parisat Series; No. 13, Calcutta, 1926).

৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৫ Shabanara Hussain, S.L.W.E.M.B., p.7.

ভাব ও রসের বিচারে সংস্কৃত সাহিত্যে এটি একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বলে বিবেচিত। গীত-গোবিন্দের একটি শ্লোক থেকে জানা যায় তাঁর পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম রামদেবী। তাঁর স্ত্রীর নাম সম্ভবতঃ পদ্মাবতী। জয়দেবের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে।[১] কাব্যটি প্রচলিত সংস্কৃত কাব্য হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এবং সাহিত্যিক দিক থেকে এক নতুন সৃষ্টি। জয়দেব এতে তাঁর সংগীতে নৈপুণ্য এবং রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর মধ্যে দিয়ে সমাজের অন্যান্য বিষয়াবলী ছাড়াও রমণীদের বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে বহু চিত্রের উপস্থাপন করেছেন। একাদশ দ্বাদশ শতকের আদি বঙ্গাক্ষরে লিখিত, অসম্পুর্ণ এবং খণ্ডিত পুঁথি 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' এর উদঘাটন করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বিভিন্ন কবি বিরচিত ৫২৫টি শ্লোকে সমৃদ্ধ এই কবিতা শ্লোক সংকলনের বেশীর ভাগ কবিই ছিলেন বাঙ্গালী। বাংলাদেশে সঙ্কলিত সর্বপ্রথম সংস্কৃত কবিতা সংকলন। কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় গ্রন্থের সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে সমসাময়িক বাঙ্গালীর কল্পনা এবং মানস প্রকৃতি ও অন্যান্য তথ্যে তাদের জীবনচর্যা সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে।[২]

১৯৫৭ সালে ডি ডি কৌশাম্বি এবং ভি ভি গোখলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অপর একটি কবিতা সংকলন গ্রন্থ সুভাষিতরত্নকোষ। এটি সম্ভবতঃ বরেন্দ্রের জগদ্দল বিহারে বিদ্যাকর নামীয় একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত এর রচনা। এটির প্রথম সংস্করণ সংকলিত হয়েছিল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং বর্ধিত সংস্করণটি ১১৩০ এর মধ্যেই। খ্যাতোক্ত কৌশাম্বি গবেষণা করে দেখিয়েছেন বিদ্যাকরের সুভাষিতরত্নকোষ এর একটি খণ্ড কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় গ্রন্থটি। পুরো সংকলনটি ৫০টি অংশে বিভক্ত এবং শ্লোকগুলি স্মরণীয় ভারতীয় কবি কালিদাস, অমরু, রাজশেখর, ভবভূতি, প্রভৃতি ছাড়া বহু বাঙ্গালী কবি দ্বারা রচিত হয়েছে। পাল আমলে অনেক বাঙ্গালী কবির আবির্ভাবের ফলে পাল যুগে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল সন্দেহ নাই। যোগেশ্বর পাল আমলের সভাকবি ছিলেন। মূলতঃ এই সুভাষিতরত্নকোষ

---

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-৪৭।

২ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

গ্রন্থটি পাল আমলের রাজসভা এবং বৌদ্ধ মঠের কাব্য ধারার ঐতিহ্য বহন করছে।[১] রাজা কেশব সেনের রাজত্বকালে ১২০০ খ্রীস্ট বৎসরে শ্রী বটু দাসের পুত্র শ্রীধর দাস সংকলিত সদুক্তিকর্ণামৃত প্রকীর্ণ শ্লোক গ্রন্থটি প্রাচীন বাঙালী জীবনের একটি আলেখ্য। ইহা পাঁচটি প্রবাহ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করে তরঙ্গ এবং প্রত্যেক তরঙ্গে পাঁচটি করে শ্লোক বিশিষ্ট গ্রন্থটির শ্লোকগুলির শেষে সাধারণতঃ কবির নাম উল্লেখিত হয়েছে, তবে শ্রী ধরদাসের নিকট যে নামগুলি অজ্ঞাত ছিল সেগুলির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 'কস্যচিৎ'। গ্রন্থটিতে সর্বমোট ৪৮৫ জন বিভিন্ন কবির রচনায় ২৩৭০টি শ্লোকের নমুনা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে পানিনি, ভাস, ভারবি, কালিদাস, ভাসহ, অমরু, বাণভট্ট, কলহন, ভর্তৃহরি, রাজশেখর, বাকপতিরাজ, বিশাখদত্ত, প্রভৃতি সর্বভারতীয় কবির কথা জানা যায়। তাছাড়া অসংখ্য বাঙালী কবির রচনা এই গ্রন্থে ছিল। তারা সম্ভবতঃ গৌড় বঙ্গীয় কবি।[২] সমসাময়িক বাংলাদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার চমৎকার নিদর্শন এই কবিদের প্রকীর্ণ শ্লোক গুলিতে। এই গ্রন্থের কিছু প্রকীর্ণ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, লক্ষণ সেন, কেশব-সেন, শরণ ও জয়দেব পাল্লা দিয়ে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। তাছাড়া কবি শরণ, উমাপতিধর শুধু বিজয় সেন ও লক্ষণ সেনের প্রশস্তি ও স্তুতি শ্লোকই রচনা করেননি। তাঁরা বাঙালীর লোকায়ত জীবন নিয়ে নানা প্রকীর্ণ শ্লোক রচনা করেছেন। আরো বলতে হয় এই গ্রন্থে নাম না জানা আশিটি বাঙালী কবির শ্লোকে প্রাচীন বাংলার জীবন যাত্রার নানান চিত্র আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।[৩] সুতরাং প্রাচীন বাঙালীর জীবনের উপর আলোকপাত করার উৎস রূপে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থটির গুরুত্ব অধিক। সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে প্রাচীন বাংলার রমণীর জীবন চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থে। যেমন শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, কলহনের রাজতরঙ্গিণী এবং রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায়। উচ্চকোটি স্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যাকে কিভাবে সজ্জিত ও অলংকৃত করা হত তার বর্ণনা আছে নৈষধচরিতে। কাব্য মীমাংসা গ্রন্থে রাজশেখর গৌড় রমণীদের বেশ

---

১ Subhasitratnakosa, ed. by D.D. Gosambi and V.V. Gokhole, Harvard Oriental Series, 42, Preface. p.VII.

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১-৯২।
মূলঃ Sridharadasa, Sadiktikarnāmrta, ed., Pandit Ramavatara Sharma and Motilal, (Lahore: Banarasi Das, 1933), P.11.

৩ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

ও ভূষণের বর্ণনা করেছেন।[১] তাই বলতে হয় কোনো বিশিষ্টকালের সামাজিক ইতিহাস রচনায় সেকালের রচিত সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। সে সাহিত্যের মধ্যেই সেকালের মানুষের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা-ধারা প্রভৃতি প্রতিফলিত হয়। যদিও লেখকের ব্যক্তিগত রুচি সে প্রতিফলনকে কিছুটা অস্পষ্ট করে। তথাপিও প্রকৃতপক্ষে কোনো বিশিষ্টকালে রচিত সাহিত্যই সেকালের মানুষের সমাজগত জীবনযাত্রার দর্পণ।[২]

ভিন্নধর্মী সাহিত্য চর্চাও প্রাচীন বাংলায় হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় পাল আমলে রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই সময় একমাত্র তাঁদের রাজ্যেই অর্থাৎ বাংলা ও বিহারেই বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল। মহাযান মতবাদের বিবর্তিত রূপ সহজযান বা সহজিয়া ধর্মের উদ্ভূত হয়েছিল এই সময়। সুতরাং সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের বিপুল সাহিত্যের পরিচিত থেকে বলা যায় যে এগুলির অধিকাংশই বাঙ্গালীর রচিত। তবে এসব সাহিত্য কর্ম বেশীর ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিব্বতীয় ভাষায় যে সমুদয় গ্রন্থগুলির অনুবাদ হয়েছিল তা থেকে আমরা এক বিরাট ধর্ম সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি। তাছাড়া নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাল যুগের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙ্গালীর একটি মূল্যবান সম্পদ। তিব্বতী লামা তারনাথের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারের কয়েকজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে সোমপুর বিহারের বোধিভদ্র এবং জগদ্দল বিহারের মোক্ষাকর গুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র এবং শুভাকরের নাম আমরা বলতে পারি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন কিনা তা সঠিক জানা যায় না। দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সিদ্ধাচার্যগণ অনেকেই অপভ্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় তাদের ধর্মমত প্রচার করেন।[৩] তাঁদের প্রণীত দোহাকোষ ও চর্যাপদ উল্লেখযোগ্য। আর সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে লুইপাদ, কৃষ্ণপাদ, সরহপাদ প্রভৃতির নাম বলা যেতে পারে। আরো বলতে হয় সংস্কৃত ও প্রাকৃতের চেয়ে এই সময় বেশী প্রচলিত ছিল

---

১ Shahanara Hussain, S.L.W.E.M.B., p. 16.

২ শ্রী সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাঙালার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪), পৃ. ২৮।

৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-৪৩।

পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপভ্রংশ। যা সমগ্র উত্তর ভারত ব্যাপী প্রসারিত হয়েছিল। বাংলাদেশের এই সহজযানী সিদ্ধাচার্যরা এবং ব্রাহ্মণ্য কবিরাও কেউ কেউ শৌরসেনী অপভ্রংশে কাব্য রচনা করেছেন।[১] এইভাবে স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে সংস্কৃত ভাষা থেকে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষার বিস্তার হয়েছে। তবে বাংলা ভাষার সৃষ্টি ঠিক কোন সময়, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে বৌদ্ধচর্যাগীতির যে সংকলন আবিস্কার করেন, তা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে ধরা হয়। এই গ্রন্থ বিভিন্ন সিদ্ধাচার্য কর্তৃক গুহ্যতান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধীয় সন্ধ্যা ভাষায় রচিত কয়েকটি গানের সমষ্টি। গ্রন্থটির নাম চর্যাচর্য বিনিশ্চয় বা চর্যাগীতি, চর্যাপদগুলিতে প্রত্যেকটিতে চার থেকে ছয়টা পদ আছে। মোট ২৩ জন কবি রচিত ৫১টি চর্যাগীতির সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলি দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর সংকলন বলে ধরা হয়। প্রাচীন বাংলার প্রচলিত বাংলা ভাষার নমুনা রূপে এবং বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন হিসেবে আমরা এই চর্যাগীতিগুলি গণ্য করতে পারি। এর প্রভাবেই পরবর্তী যুগের বাংলায় সহজিয়া গান, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত ও বাউল গান প্রভৃতির উৎপত্তি। সুতরাং বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির এবং চর্যাগীতিগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অধিকরূপে উপলব্ধি করা যায়।[২] চর্যাগীতিসালগুলিতে বাঙ্গালীর সমসাময়িক গার্হস্থ জীবনের চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। একাধিক গীতে প্রাচীন শবরদের জীবনযাত্রা তাদের বৃত্তি, পোষাক, সাজসজ্জার কথা উল্লেখিত।[৩] ফলে বাঙ্গালীর আদিপর্বের কিছু চিত্র চর্যাপদগুলিতেই বিধৃত হয়েছে বলা যায়। ডঃ গ্রীয়ার্সনের আবিস্কৃত পুঁথি প্রকাশের পর উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ময়নামতীর গান, গোপীচন্দ্রের গীত, মানিক চাঁদের গীত ইত্যাদি বিভিন্ন নামে একই কাহিনীর বিভিন্ন পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতগণ এইসব রচনাকে বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের বলে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। পুঁথিগত নিদর্শনের অভাব থাকলেও পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থেকে নিশ্চিত অনুমান করা

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২।

২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫-৯৭।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

যায়, খ্রীস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে অন্ততঃ তুর্কী আক্রমণের পূর্বে এগুলি কেবল বাংলাদেশেই নয় সর্বভারতেই প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত গীতকাহিনীর মধ্যে তৎকালীন প্রচলিত জীবনের যে আভাষিক পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে বিবেচ্য। সমকালীন লোক জীবন চরিত্রের একটি স্পষ্ট চিত্র গীতিকাব্যগুলিতে রূপায়িত হয়েছে।[১]

দ্বাদশ শতকের সেন রাজবংশের অভ্যুদয়ে অপভ্রংশ ও বাংলায় রচিত তান্ত্রিক সহজিয়া সাহিত্যের প্রসার কমে যায় এবং সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি লাভ করে। এই সময় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা, ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি গ্রন্থাদির অধিকতর আলোচনা ও রচনা, ব্রাহ্মণ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকতর প্রচার এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জীবনাদর্শের প্রসার হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা এ সময়ের অবদান। এই পর্বের তিনজন রাজা হরিবর্মা, বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেন ছিলেন এ সময়কালের সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ যুগে বাংলায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি ছিল জ্যোতিষমীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতিশাস্ত্র সম্পর্কিত। এ প্রসঙ্গে ধর্ম শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ লেখক ব্রাহ্মণ ভট্টভবদেবের প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে মানুষের জীবন যাত্রায় পালনীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে নানা দিক নির্দেশনা আছে।[২] ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতার মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখ করতে হয়, তিনি পারিভদ্রীয় জীমুতবাহন। খুব সম্ভব তিনি রাঢ় দেশীয় এবং দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁর তিনটি গ্রন্থ কালবিবেক, ব্যবহার মাতৃকা এবং দায়ভাগ। এর মধ্যে দায়ভাগই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ হিন্দু সমাজে দায় বা উত্তরাধিকার, সম্পত্তি বিভাগ এবং স্ত্রী ধন সম্পর্কে একতমভাবে সুবিখ্যাত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। জীমুতবাহনের এই গ্রন্থ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথাই প্রমাণ করে। এছাড়া তাঁর কালবিবেক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজানুষ্ঠান শুভকর্ম, আচার, ধর্মোৎসব প্রভৃতি পালনের শুভাশুভ কাল, সৌর মাস, চন্দ্রিমাস প্রভৃতি

---

১ শ্রী ভূদেব চৌধুরী, <u>বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস</u>, (কলিকাতাঃ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭), পৃ. ৬৯-৭০।

২ Shahanara Hussain, S.L.W.E.M.B., p. 10.

নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫-৮৭।

সম্বন্ধে আলোকপাত করে, যাতে বাঙালী জীবনেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।[১] জীমূতবাহনের ব্যবহার মাতৃকা গ্রন্থটিতে বিচার বিষয়ক রীতি নীতির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

সেন রাজগণ শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উপাসক ছিলেন এবং তাঁরা বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতেন। সুতরাং সেন আমলে তাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বংগ দেশে সাহিত্য ও হিন্দুধর্মের নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটায়।[২] এই আমলের রাজা বল্লাল সেনের অদ্ভুতসাগর এবং দানসাগর গ্রন্থ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দানসাগর গ্রন্থটিতে সত্তরটি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের দান, রাজার দানপুণ্য, দানের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, স্থান-কাল-পাত্র কুদান, ক্ষুদ্রদান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। তবে অদ্ভুতসাগর গ্রন্থটি নানা শুভাশুভ লক্ষণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।[৩] বাংলাদেশের লিপি প্রমাণে জানা যায় যে, এ সময় মীমাংসার চর্চা হয়েছে। অনিরুদ্ধ এবং ভবদেবভট্ট এই দুজন ছিলেন মীমাংসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দেখা যায়, বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক মতের প্রভাবে হিন্দু আনুষ্ঠানিকতা, ক্রিয়া পদ্ধতি কিছুটা এ সময় লোপ পেয়েছিল। ধর্মাধ্যক্ষ বরেন্দ্রাগত চম্পা হট্টীয় অনিরুদ্ধ ছিলেন রাজা বল্লাল সেনের গুরু। তাঁর 'হারলতা' এবং 'পিতৃদয়িতা' এই দুটি গ্রন্থ হিন্দু রীতি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন। তিনি অশৌচ, শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুর বিবিধ আচার অনুষ্ঠানের ও নিত্যকর্মের কথা তুলে ধরেন।[৪] এই গ্রন্থগুলি সেকালের মানুষের জীবন চরিত তথা জীবনের প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করে থাকে। ফলে বাঙালী রমণীর বেশ ভূষার একটি পটভূমি ও পরিবেশ এই প্রাচীন গ্রন্থে পরিলক্ষিত। এদিক দিয়ে গ্রন্থগুলি আমাদের তথ্যের অবশ্যম্ভাবী উৎস।

---

১ Jimutavahana, ed., by Sir Asutosh Mookherjee in MASB, 11,5 (Calcutta: 1910).

২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।

৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-৯২।

লক্ষণ সেনের মহাধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ ছিলেন এ যুগের আর একজন অন্যতম পণ্ডিত। হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব, মীমাংসাসর্বস্ব, বৈষ্ণবসর্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্বস্ব নামে পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণসর্বস্ব ছাড়া বাকি চারটি গ্রন্থই বিলুপ্ত। এই গ্রন্থটি হলায়ুধ রচনা করেছিলেন প্রধানতঃ শুক্ল-যজুর্বেদীয় কান্বশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের নিত্যকর্ম সংস্কারাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য। তিনি লিখেছেন, রাঢ় ও বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণগণ বেদ পড়তেন না, বৈদিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁদের প্রকৃত জ্ঞান ছিলনা। সুতরাং হিন্দুর আহ্নিক অনুষ্ঠান ও বিবিধ সংস্কারে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার জন্যই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন।[১] এই সেনপর্বের প্রায় সমসাময়িক কালে বা কিছু পরবর্তীতে বাংলায় সুবিস্তৃত স্মৃতিসাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনচর্চা নিয়ে কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে। এগুলি আনুমানিক দশম থেকে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছে। এই সকল গ্রন্থের লেখকগণ বাঙালী এবং কেবলমাত্র প্রাচীন বাঙলার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। এই গ্রন্থগুলিতে সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন পরিলক্ষিত। একই সময়ের রচিত প্রাকৃত পৈঙ্গল বা অপভ্রংশ ভাষায় রচিত গীতি কবিতার সংকলন গ্রন্থটি রচিত হয়। প্রাকৃত ছন্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দৃষ্টান্ত সংকলন করাই ছিল অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।[২] প্রাকৃত পৈঙ্গলে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ যুগের প্রাকৃত বাঙালী তথা লোক সাধারণ ভক্তি কিংবা হাস্যরসের সংগে আদি রসের চর্চায় পরাঙ্মুখ ছিলনা। শুধু প্রেমগীতি রচনায়ই নয় নিছক গাল গল্পে সেদিনকার বাঙালী বুৎপত্তি লাভ করেছিল এবং রূপকথা কাহিনীর বিচার করেছিল। এই শ্রেণীর অদ্ভুত গল্পের অভ্যন্তরে বাংলার প্রাচীনতম যুগ-জীবন ঐতিহ্য প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু আজ এইসব রচনার প্রাচীন ঐতিহ্য আবিস্কারের উপায় নাই। লেখকগণের পরিচয় উদ্ধারের কোন অবকাশ নাই। যেমন 'ডাক' ও 'খনা' নামে যে রচনাগুলি বাংলাদেশে আজও প্রচলিত তা বোধ হয় প্রাকতুর্কী আমলের চলতি প্রবাহ সংগ্রহ। কালে কালে তাদের ভাষা বদলিয়ে গেছে মাত্র। পণ্ডিতেরা একথা

---

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬-৮৪।

সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করেছেন। কারণ 'ডাক' ও 'খনার' পরিচয় আবিষ্কার আজ আর সম্ভব নয়। এসব ছোট ছোট প্রবাদ প্রবচনাংশে আদিম যুগের বাঙ্গালীর আদি ভৌতিক মর্মবুদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায় তারই ঐতিহ্যটুকু এসব রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ।[১] সুতরাং দেখা যায় যে সব সামাজিক রীতি নীতি পল্লী ও নগরবাসী সাধারণ মানুষ তথা নারীরা দৈনন্দিন জীবনে আজও পালন করে থাকে। প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীদের মধ্যেও মোটামুটি তাই-ই ছিল সক্রিয়। বাংলার সুদীর্ঘ লিপিমালা ও সমসাময়িক সাহিত্যই তার প্রমাণ।

একথা সত্য যে, প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের উৎসাবলী সংখ্যায় সীমিত এবং কেবলমাত্র পোড়ামাটির ফলক, চিত্র, ভাস্কর্য শিল্পের ও চিত্রিত পাণ্ডুলিপিগুলির নিদর্শন ব্যতীত অন্যান্য উৎসগুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করা দুরূহ। কিন্তু এই অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্যগুলি হচ্ছে, যে সামাজিক কাঠামোতে প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর জীবন অতিবাহিত হয়েছে তার বেশ ও ভূষণের বিশ্লেষণ করে সেই কাঠামোতে তার অবস্থান নির্ণয় করা, সর্বভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে তার বেশ ও ভূষণের নান্দনিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং শিল্পশৈলী বিশ্লেষণ করা। তাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত উৎসগুলির প্রতিটিই এই অভিসন্দর্ভের জন্য প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান।

---

১ শ্রী ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহের পরিচয় :

প্রাচীন সাহিত্যে এবং ঐতিহাসিকের বিভিন্ন বিবরণীতে প্রাচীন বাংলার বহু সমৃদ্ধশালী নগরী, প্রাসাদ, মন্দির, দুর্গ ও বিহার ইত্যাদির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বাংলার নানাস্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন বাংলার বহু প্রত্নবশেষ রয়েছে। অনেক সময় প্রয়োজনের তাগিদে বা গুপ্তধনের আশায় খননের ফলে এ সকল নিদর্শনাদির আবিস্কার হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করতে হলে আমাদের আবিস্কৃত বিভিন্ন নিদর্শনাদি যথা তাম্রশাসন, প্রস্তর নিদর্শন, পোড়ামাটির ফলক, চিত্রিত পাণ্ডুলিপি, মুদ্রা, নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষপত্র প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সভ্যতার নিদর্শন পর্যায়ক্রমে স্তুপীভূত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং ধ্বংসাবশেষগুলিতে আবিস্কৃত বিভিন্ন প্রামাণ্য উপকরণের যথাযথ পর্যালোচনা করলে দেশের তৎকালীন অবস্থার একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে ধরা পড়ে।[১] প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি, পাণ্ডুরাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানের লুপ্তপ্রায় সভ্যতা পুনরুদ্ধার করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এ সমস্ত স্থানের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এ সকল স্থানের পরিচয় দান করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া স্থানগুলিতে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের মধ্যে প্রতিফলিত প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের সাক্ষ্য প্রমাণ গুলি আমাদের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সুতরাং নিম্নে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির আলোচনা করা হল।

মহাস্থানগড় :

মহাস্থানগড় অর্থাৎ পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধন নগর উত্তর বাংলার সর্বপ্রাচীন ও সর্ব প্রধান নগর। আনুমানিক দ্বাদশ শতকের করতোয়া-মাহাত্ম্য গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধন পুরকে পৃথিবীর আদিভবন বলে

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, মহাস্থান, ময়নামতি, পাহাড়পুর, (ঢাকা: পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬), পৃ. ৭,৮।

বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে পবিত্র করতোয়া-তীরবর্তী মহাস্থানকে পুণ্য পৌণ্ড্রক্ষেত্র বা পৌণ্ড্রনগর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যে এই নগর এক সমৃদ্ধিশালী লোকালয় রূপে গড়ে উঠে। পুণ্ড্রবর্ধন নগর পাল ও অন্যান্য হিন্দু সামন্ত রাজবংশের শাসনাধিষ্ঠানরূপেই নয় ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্ররূপে প্রাচীন বাংলায় ইহার খ্যাতি ও মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় ২৪^{0}৫৭ মিঃ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯^{0}২৫ মিঃ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় মহাস্থান বা মহাস্থানগড় অবস্থিত। বগুড়া হতে ৭ অথবা ৮ মাইল দূর-বর্তী করতোয়ার পশ্চিম তীরে মহাস্থানগড়ের সুবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এবং পাহাড়পুর হতে পূর্বদিকে ৩০ মাইল দূরে এই মহাস্থান চতুস্পার্শ্বস্থ ভূমি ভাগ হতে প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ। প্রাচীর বেষ্টিত এই প্রাচীন নগরীর দৈর্ঘ উত্তর দক্ষিণে ৫০০০ ফুট এবং প্রস্থ পূর্ব পশ্চিমে ৪০০০ ফুট। এই নগরীর প্রাচীর বেষ্টিত এলাকার বাইরে প্রায় ৪ মাইল পরিধি বিশিষ্ট স্থানে এখনও বহু প্রাচীন প্রত্নবশেষের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় উত্তর, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকের বিভিন্ন স্থানগুলিতে।[২] এক সময় পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত খরস্রোতা করতোয়া মহাস্থান শহরকে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা প্রাচীর হিসেবে নিরাপদ রক্ষা ছাড়াও পূর্ব দিকে শহরের সীমা নির্দেশ করত। এই শহরের বিস্তার এবং প্রাচীনত্ব থেকে বলা যায় বাংলার যে কোন স্থানের চেয়ে মহা-স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্টপূর্ণ নগরে পরিণত হয়েছিল।[৩] নগরটির দুই অংশ, একটি পরিখা চিহ্নিত ও প্রাকার বেষ্টিত, এই অংশই যথার্থত নগর। অন্য অংশ প্রাকারের বাইরে, এই অংশ নগরোপকণ্ঠ। নগরটি চারিধারের সমতল ভূমি চারকোণে চারটি উচ্চতর প্রাকার-মধ্য। প্রাকারের বাইরেই উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে পরিখা। নগর হতে নগরোপকণ্ঠ

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

২ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৩ Archaeological Survey of India Annual Reports, 1928-29, P. 88.

এবং বাইরে যাতায়াতের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি করে সুপ্রশস্ত নগরদ্বার। পশ্চিম দিকে উত্তর কোণের কাছে প্রধান নগরদ্বার। এখনও এই দ্বার তাম্র দরওয়াজা নামে খ্যাত। পূর্বদিকে ঠিক এর বিপরীত কোনে শিলা দেবীর ঘাটে যাবার জন্য আর একটি দ্বার, এই শিলাদেবীর ঘাটেই করতোয়ায় স্নানের প্রধান তীর্থ কেন্দ্র। নগরাভ্যন্তরে ছিল রাজকীয় প্রাসাদ, অধিকরণ-গৃহ এবং অন্যান্য রাজকীয় প্রাসাদ ইত্যাদি, সার্থবাহ বণিক নাগরিকদের বাসগৃহ, হাট, মন্দির, সভাগৃহ, সৈন্য সামন্তদের আবাসস্থল ইত্যাদি।[১] এই ধ্বংসাবশেষের বিবরণ সর্বপ্রথম বুকানন হ্যামিল্টন ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি দিনাজপুরের ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করা কালে মহাস্থানগড় প্রসংগে বলেন, "The ruins of Mahasthan are said to be very considerable"[২] সি,জে, ও ডোনেল, এইচ বেভারিজ ও কানিংহাম প্রমুখ পন্ডিতগণ বিশদভাবে এই প্রাচীন নগরীর বর্ণনা করেন। তবে মহাস্থানকে মুসলমান পূর্ব যুগের বিখ্যাত পুন্ড্রনগর বলে সনাক্ত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব স্যার কানিংহামের। তিনি বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণের উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। য়ুয়ান-চোয়াঙ ৬৩৯ হতে ৬৪৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পুন্ড্রবর্ধন পরিদর্শন করেন। এছাড়াও ১৮৭৯-১৮৮০ সালে কানিংহাম বিহার ও বাংলা সফরকালে মহাস্থান হতে যে সমস্ত প্রত্ন নিদর্শন পরিদর্শন করেছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিলো কিছু সংখ্যক বড় ইট এবং বারটি চারকোনা মাটির ফলক। বেভারিজের মত তিনি মহাস্থানে কোন বৌদ্ধ নিদর্শন পাননি।[৩]

১৯২৮-২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ হতে সর্বপ্রথম কাশীনাথ দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন মহাস্থানগড়ে নিয়মিত খননকার্য আরম্ভ হয়। এ বৎসর যে তিনটি স্থানে খননকার্য চালান হয় তাদের নাম বৈরাগীর ভিটা, গড়ের উপকণ্ঠে উত্তর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত গোবিন্দভিটা

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৩৮৬।

২ Martin, <u>Estern India</u>, Vol. II, P. 609.

৩ A. Cunningham, <u>op.cit.</u>, p. 109.

ধ্বংসস্তূপ ও মুনীর ঘোন নামে পূর্বদিকের রক্ষা প্রাচীরের কিয়দংশ।[১] প্রথমে উত্তর দিকের রক্ষা প্রাচীরের প্রান্তসীমা থেকে বৈরাগী ভিটার পাদমূল পর্যন্ত ২৫০ ফুট দীর্ঘ একটি খাত খননের কাজ শুরু হয়। কিন্তু এ খাতে কয়েকটি পাতকোয়া ও অসংলগ্ন দেওয়ালের ভগ্নাংশ ছাড়া তেমন কোন স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তবে এখানে পাল যুগের মাটির ফলক, মূল্যবান পাথরের গুটিকা ও মাটির হাড়ি ও পাত্রের টুকরো পাওয়া যায়। এ বছরে খনন কার্যের ফলে অবহিত হওয়া যায় যে প্রাচীন যুগে এ স্থান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান এলাকা ছিল। এছাড়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কিছু সংখ্যক প্রত্নবস্তু আবিস্কার করে যেমন— খণ্ড মাটির ফলকে চিত্রিত রমণী যার বৈশিষ্ট শুংগ আমলের শিল্পকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[২] ১৯৩০-৩১ সালে শুংগ আমলের কয়েকটি মাটির ফলক মহাস্থানগড়ে পাওয়া যায়। বৃষ্টির পানি নির্গমনের ফলে ও খনন করে কয়েকটি ফলক পাওয়া যায়।[৩] ১৯৩৪-৩৫ এ খনন কার্যের ফলে মহাস্থান থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ও গোকুল গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি সমতল শিখর বিশিষ্ট উঁচু ঢিবির উপরে বিরাট মেধ বা লক্ষীন্দর মেধটি পাওয়া যায়। চতুর্দিকে ভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৪৩ ফুট। এই মেধ বিস্তারিত কক্ষ বিশিষ্ট স্থাপত্য চাতুর্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।[৪] এই বছরেই মেধটির খনন কার্য অব্যাহত থাকে। এই সময়ে খননের ফলে নানা মাপের মোট ১৭২টি ভরাট করা কুঠুরী আবিস্কৃত হয়। কুঠুরীগুলিকে বিভিন্ন তলে একই সারিতে নির্মাণ করে মৃত্তিকা দ্বারা এমনভাবে ভরাট করে দেওয়া হয়েছিল যাতে এগুলি কোন এক সুউচ্চ মন্দির অথবা স্তুপের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে মনে হয়।[৫]

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২ A.S.I., A.R., 1929-'30, P. 142.

৩ A.S.I., A.R., 1930-'34, P. 128.

৪ A.S.I., A.R., 1934-35, PP. 40-42.

৫ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

১৯৩৬-৩৭ সালে মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গোবিন্দভিটার খনন কার্য শুরু হয়।[১] করতোয়া নদীর বেষ্টনীতে অবস্থিত এই ভগ্নাবশেষটি মহাস্থান দুর্গ প্রাচীরের বহির্দেশে উত্তর দিকে দুইশত গজ দূরে অবস্থিত। "করতোয়া মাহাত্ম্য" গ্রন্থে এখানকার মন্দিরটি পবিত্র নগরীর শেষ সীমা বলে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু খননের ফলে এখানে কোন বিষ্ণু মন্দির পাওয়া যায়নি। গোবিন্দভিটার প্রত্নস্থানকে পশ্চিম ও পূর্ব এই দুইভাগে ভাগ করে চিহ্নিত করা হয়েছে, পশ্চিম দিকে পরবর্তী গুপ্তযুগ থেকে মুসলমান আমল পর্যন্ত চার পর্যায়ে নির্মিত ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। পূর্বদিকে যে সমস্ত স্থাপত্য নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে তা পর্যায়ক্রমে চারটি নির্মাণ যুগের বলে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। এখানে সর্বশেষ যুগের একটি ইট বাঁধান মেঝের অংশবিশেষ এখনও বিদ্যমান, এছাড়া চতুর্থ নির্মাণ যুগের ভগ্নাবশিষ্টের মধ্যে একটি মন্দির উল্লেখযোগ্য। যার কয়েকটি থাক বিশিষ্ট অলংকৃত ভিত্তিমূল লক্ষ্য করা যায়।[২] কিছু সংখ্যক মাটির ফলক পাওয়া যায় যা পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ফলকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩] মহাস্থানগড় ও এর সংলগ্ন এলাকার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে গোবিন্দভিটার মন্দির সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হয়।

দুর্গ নগরী মহাস্থানগড়ের ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিহার ও ভাসুবিহারের বিস্তীর্ণ ধ্বংস স্তুপকে ক্যানিংহাম য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ বর্ণিত পো-শি-পো বিহারের ধ্বংসাবশেষ বলে সনাক্ত করেছেন তার গ্রন্থে। তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এ ঢিবির ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন।[৪] বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ পুণ্ড্রবর্ধনের চার মাইল পশ্চিমে পো-শি-পো নামে এক বিরাট বিহার পরিদর্শন করেছিলেন। কানিংহাম বর্তমানের ভাসুবিহারকে উক্ত পো-শি-পো বিহার বলে উল্লেখ করেছেন। এটি বিরাট এক সংঘারাম। এখানে মহাযান মতাবলম্বী

---

১ A.S.I., A.R., 1936-37, P. 51-54.

২ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৩ A.S.I., A.R., 1936-37, P. 52-54.

৪ A.S.I., A.R., Vol. XV, P. 103.

কমপক্ষে সাতশত জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন।[১] এই সংঘারামের কিছু দূরেই সম্রাট অশোক নির্মিত একটি স্তূপ ছিল। পন্ডিত পরশুরাম লিখিত খ্রীস্টীয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দের "করতোয়া মাহাত্ম্য" নামে একটি সংস্কৃত কাব্যের আবিস্কার কানিংহামের এরূপ সনাক্তিকরণকে আরও দৃঢ়তর করে। এই কাব্যে করতোয়া নদীর মহিমা কীর্তনকালে নদী তীরে অবস্থিত মহাস্থান এবং পুন্ড্রনগরকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[২] পরশুরামের মতানুসারে মহাস্থান পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান এবং করতোয়ার পানি পবিত্র ভূমি। এ স্থানকে বিষ্ণুর স্থায়ী আবাস রূপে এবং হিন্দুদের একটি পীঠস্থান রূপে গণ্য করা হয়েছে। এখানে ১,২৫,০০০ ব্রাহ্মণের নিবাসসহ স্কন্দ, বিষ্ণু, বলভদ্র, শিব এবং অন্যান্য দেবতা একত্রে থাকার উল্লেখ আছে। এ স্থান সম্পর্কে পরশুরামের বর্ণনা সম্পর্কে শাহানারা হোসেন বলেছেন, He mentions the holy land as five krosa in circuit, in which again, a circuit of one krosa encloses the most sacred spot, where Bhargava muni resides (V.57). This spot was created by Rama, and became the Mahasthana of the whole world on account of its nineteen specialities ... (Verses 58-59).[৩]

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মতানুসারে ভাসুবিহার রূপে আখ্যাত ক্ষুদ্র বিহার দুটিকে পার্শ্ববর্তী মন্দিরটিসহ যৌথ শ্রেণীর বিহার মন্দির বলা হয়েছে। কেননা, ভাসুবিহার গ্রামের একটি আয়তাকার টিলার উপর অবস্থিত পাঁচটি মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে তিনটি খুঁড়ে উল্লেখিত বিহার দুটি ও একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। এই ক্ষুদ্রাকৃতি বিহার দুটি আয়তকার। একটি বিহার উত্তর দক্ষিণে ১৬২ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ১৫২ ফুট বিস্তৃত। এখান থেকে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে অপর বিহারটির প্রস্থ ১৬২ ফুট এবং দৈর্ঘ ১৮৫ ফুট, অপেক্ষাকৃত

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

২ তদেব, পৃ. ১২।

৩ S. Hussain, Everyday Life in the Pala Empire, (Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1968), p. 5[6], V.R.S.M. No.2, pp. 20-27.

ছোট বিহারটির পূর্ব দিকের মাঝখানে প্রবেশ পথ, চারটি বাহুর সঙ্গে সন্নিহিত কক্ষের সংখ্যা মোট ২৬টি, অপর বিহারটির কক্ষ ৩১টি।[১] উল্লেখ করা যেতে পারে কোনটির প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় মন্দির নাই। উল্লেখিত প্রথম বিহারটি থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে আয়তাকার, অর্ধ-এশ্বাকৃতি একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, এই মন্দিরের ভিত্তি গাত্র পোড়ামাটির ফলকে অলংকৃত।[২]

মহাস্থানের ভাসুবিহারের সঙ্গে সংলগ্ন মন্দিরের ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখা যায় মানুষ, অর্ধদেবতা, অর্ধমানব, পশুপক্ষী, ফুলের বিন্যাসরূপের পুনরাবর্তি। মনুষ্যরূপের প্রতিকৃতি কতকগুলি ফলকে রয়েছে। রাজারাণীর দৃশ্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ, অলং-কার ও অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ব্যক্তিদের উৎকীর্ণ চিত্র তাদের রাজকীয় মর্যাদা সম্বন্ধে অবগত করে। একটি দৃশ্য রয়েছে হস্তীর প্রতি তীর নিক্ষেপে উদ্যত শবর। দুই শ্রেণীর পোড়ামাটির ফলক এ মন্দির গাত্রে দেখা যায়। এক শ্রেণীতে আছে অত্যন্ত প্রথাসিদ্ধ ও পরিণত কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত ফলক এবং অন্য শ্রেণীটি অপেক্ষাকৃত নতুন ফলক। প্রথম শ্রেণীর ফলকগুলিতে রাজারাণী দৃশ্যে উৎকীর্ণ নরনারীরা মূর্তিগুলি অলংকার ও পোষাক পরিচ্ছদে সমৃদ্ধ এবং তাদের দেহ ভঙ্গীমাগুলি মনে হয় কমনীয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ফলকে উৎকীর্ণ মানুষ ও জীবজন্তুকে শিল্পীর গতিশীল ও স্বাচ্ছন্দ্য রীতিতে এবং স্পষ্ট রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। যা দশম একাদশ শতকের পাল আমলের প্রস্তর ভাস্কর্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়।

মহাস্থান তথা পুণ্ড্রবর্ধনে প্রাপ্ত প্রস্তর খন্ডের উপর উৎকীর্ণ মৌর্য আমলের একটি খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর ব্রাহ্মী লিপি হতে জানা যায় এদেশে মৌর্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাস্থানে খনন কার্যের ফলে মৌর্য যুগের ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত মুদ্রা, পোড়ামাটির ফলক চিত্র এবং গুপ্ত ও কুষাণ যুগের অতি সীমিত সংখ্যক মুদ্রাও পাওয়া গেছে, যা

---

১ Nazimuddin Ahmed, Bangladesh Archaeology, Vol.I, (Dhaka: 1980), P. 40-44.

২ Ibid.

৩ Ibid., PP. 57-83.

মহাস্থানে কুষাণ ও শুংগ আমলের পরিচয় বহন করে।[১] মহাস্থানে প্রাপ্ত কনিস্কের একটি স্বর্ণ মুদ্রাও পাওয়া যায়। এছাড়া খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের পরে উৎকীর্ণ অনেকগুলি তারিখযুক্ত লিপিমালা এদেশের ইতিহাস নির্ণয়ে বিশেষ সাহায্য করে। গুপ্তযুগের লিপিপাঠে জানা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ বিভাগ ছিল। এ আমলে একমাত্র সমতট ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ সমুদ্র গুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। কুমিল্লা জেলাসহ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা সমতটের অনুর্গত ছিল। যা হোক কিছু সংখ্যক গুপ্তযুগীয় তাম্রশাসন থেকে জানা যায় রাজধানী পুণ্ড্রনগর-সহ সমস্ত উত্তরবংগ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত গুপ্ত শাসনাধীন ছিল।[২]

বাংলাদেশে গুপ্তশাসনের অবসানের পর গৌড় ও বঙ্গ নামে দুটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থায় শশাঙ্ক নামে এক দুঃসাহসী রাজা মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজধানী কর্ণসুবর্ণসহ এই সাম্রাজ্য কামরুপরাজ ভাস্কররাজ ভাস্করবর্মার হস্তগত হয়। এই সময় ৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে হুয়ান্ চোয়াঙ বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশকে পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্ত এই চার ভাগে বিভক্ত দেখেন। তিনি পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীতে ঘনবসতি, বৃহৎ জলাশয়, জনসাধারণের জন্য দফতর এবং ফলবৃক্ষের প্রাচুর্য্য দেখেছিলেন।[৩]

এরপর ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ আভ্যন্তরীণ যুদ্ধবিগ্রহ বিশৃংখলা দ্বারা এদেশ আএবনু হয়েছিল। বৈরাগী-ভিটার ঢিবি খনন কার্যের সময় গুপ্ত এবং পাল যুগের ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত নমুনা থেকে এ সময়ের সমাজ জীবনের নিরাপত্তাহীনতা এবং অরাজকতা সম্পর্কে জানা যায় যা শহরের

---

১ আ, কা, ম, যাকারিয়া, বাঙলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, (বাংলাদেশঃ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৩৫-৩৬।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

৩ R.C. Majumdar (ed.,) H.B.,,Vol.I,P.60.

সুখ সমৃদ্ধিকে মারাত্মকভাবে পশ্চাৎপদতার দিকে ঠেলে দেয়।[১] বৈরাগীভিটা খননের ফলে পালযুগের দুটি বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নবিশেষ আবিস্কৃত হয়। মন্দিরের ভিত্তিতে চতুর্দিকে নকশা এবং ইট দ্বারা অলংকৃত ছিল। অনুমান করা হয় এরূপ অলংকরণ কৌশল সাধারণতঃ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দে প্রচলিত ছিল।[২] বৈরাগীভিটার উত্তর প্রান্তে ১৭৫ ফুট দীর্ঘ ও ৩ ফুট প্রশস্ত ইটের তৈরী একটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র কুঠুরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এগুলিকে প্রথম পর্যায়ে নির্মিত মন্দিরের অংশ বিশেষ বলে ধারণা করা হয়। এই স্থাপত্য মন্দিরগুলি গুপ্ত ও পরবর্তী যুগে মহাস্থানে নির্মিত হয়েছিল বলা যায়।[৩] বৈরাগীভিটা হতে ২০০ গজ দক্ষিণ পূর্বে একই বৎসরে আর একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়। এই মন্দির গাত্রে কিছু সংখ্যক অলংকৃত ইট ও পোড়ামাটির চিত্রফলক সন্নিবেশিত দেখা যায়। ইট ও পোড়ামাটির ফলকগুলি পাহাড়পুর প্রাপ্ত অলংকৃত ইট ও চিত্র ফলকের অনুরূপ। এতে অনুমিত হয় খ্রীস্টীয় নবম, দশম শতাব্দের কোন এক সময় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোন দ্রব্য না পাওয়ার ফলে মন্দিরটির উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি বলা কঠিন।[৪]

পুণ্ড্রবর্ধন নিবাসী বপ্যটের পুত্র, পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে রাজ্য শাসনের মধ্যে দিয়ে বিগত একশ বছরের অরাজকতা অবসান করেন। এই সময়ই মহাস্থান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত হয়। করতোয়া মাহাত্ম্য গ্রন্থেও এখানে হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের কথা জানা যায়। এই আমলের নগরে প্রাসাদগুলি হতে মহাস্থানের বেশ সমৃদ্ধি এবং বিলাসাড়ম্বরের কথা বোঝা যায়। আবার সন্ধ্যাকরনন্দী

---

১ A.S.I., A.R., 1928-29, P. 92.

২ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩ আ,কা,ম, যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-৮১।

৪ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

তাঁর রামচরিত গ্রন্থে পুণ্ড্রবর্ধনকে বরেন্দ্রীর মুকুটমণি বলে উল্লেখ করেছেন।[১] আর এই বরেন্দ্রভূমিই পাল রাজাদের আদি নিবাস ছিল। এই শহরটি মুসলিম আগমনের পূর্বে প্রধান ধর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অর্থাৎ স্থানটি এ সময় মুসলিম এবং হিন্দুর একটি পবিত্র ভূমি বলে পরিচিত ছিল। মুসলমানদের জন্য এ স্থান পবিত্র হওয়ার কারণ এখানে শাহ সুলতান বলখী মাহী সাওয়ারের মাজার এবং মুগল আমলের একটি মসজিদ অবস্থিত ছিল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে এখানে একটি মেলাও বসতো। তাছাড়া দেখা যায় মহাস্থান হিন্দুদের পবিত্র ভূমি বলে এখানে প্রতি বার বছর পর পৌষ মাসে হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রায় আসত এবং করতোয়া নদীতে স্নান করত।[২] কিন্তু পরবর্তীতে মহাস্থানের প্রাধান্য কমে যায়। কেননা, মহাস্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সেন-রাজগণের আমলে উত্তরবঙ্গের শাসনকেন্দ্র মহাস্থান থেকে গৌড়ে স্থানান্তরিত হয়। যার ফলে পুণ্ড্রনগর দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।[৩]

মহাস্থানে মন্দির, দুর্গ প্রাচীর ছাড়াও মহাস্থানের শেষ নরপতি পরশুরামের রাজপ্রাসাদ এর ঠিক পার্শ্বেই বিখ্যাত জীয়তকুণ্ড বা জীবনকূপ, পরশুরামের সভাবাটি খোদার পাথর ভিটা, মানকালির কুণ্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ ছিল। এ থেকে এবং অন্যান্য সমসাময়িক প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন থেকে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য কৌশল ছাড়াও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির সাক্ষ্য মেলে। এই মন্দির গাত্রে এবং এ সময়ের আর দুইটি মন্দিরের মাঝে অলিন্দ গাত্রে কিছু সংখ্যক পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক এস, কে, সরস্বতীর মতে এগুলি পাহাড়পুরের ফলকগুলির সমসাময়িক। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে যক্ষী মূর্তির চিত্র। অপর একটি ফলকে দেখা যায় একজন দেবতা তার মাথার উপরে একটি পাশ উঁচু করে ধরে রেখেছেন।[৪] গোবিন্দভিটায় ষষ্ঠ শতক থেকে

---

১ <u>Ramacarita</u>, ed, and tran by R.G. Basak, P. 142.

২ Hunter, <u>A Statistical Account of Bengal</u>, Vol.III, P.196.

৩ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৯৯।

৪ R.C. Majumdar, <u>H.B.</u>, Vol.I, P.508, <u>A.S.I.</u>, <u>A.R.</u>, 1936-37, P. 52-54.

একাদশ শতকের তৈরী একাধিক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। তবে পূর্ববর্তীকালের মন্দিরভিত্তির উপর পরবর্তীকালে নির্মাণ কার্যের ফলে এই মন্দিরগুলি ভূমি নকশা বা পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন।

মহাস্থানে শিলাদেবীর ঘাট সংলগ্ন টিবিটির স্থানীয় নাম খুনীর ঘোন। এ স্থানে দুর্গ প্রাচীর প্রায় ১০ ফুট উঁচু ও ১১ ফুট চওড়া। দেওয়ালের দুই প্রান্ত সীমায় ইটের গাঁথুনী কিন্তু মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের টুকরো দিয়ে কাদার সাহায্যে ভরাট করা। একটি টিবির মধ্যস্থলে খোদার পাথরভিটা নামে বৃহৎকার প্রস্তর খণ্ডটির আয়তন ৯'-৪" x ২'-৪" x ২'-৫" এবং পূর্বদিকের সম্মুখভাগ পুষ্পের নক্সা দিয়ে অলংকৃত। প্রস্তর খণ্ডটি বর্তমানে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যাদুঘরে রক্ষিত।[১]

মহাস্থানে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে বেলে পাথরের একটি গণেশ মূর্তি, কৃষ্ণ প্রস্তরের ভাংগা একটি নরসিংহ মূর্তি, বেলে পাথরের দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি, কতকগুলি নীলাভ প্রস্তরের গোলাকার প্রস্তর মূর্তির অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২] এছাড়া অনুসন্ধানের ফলে ব্রোঞ্জের নৃত্যরত গণেশ ও একটি গরুড় মূর্তি এবং একটি নীলাভ পাথরের বেদী উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া পাল শৈলীতে নির্মিত কিছু ভাস্কর্য মহাস্থানগড়ে পাওয়া গেছে। এগুলি বৌদ্ধমূর্তি যেমন, পদ্মপানি এবং বুদ্ধদেব। এখানে প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শন সমূহের মধ্যে শিব, গৌরীর প্রতিমাও লক্ষ্য করা যায়।[৩]

ধ্বংসাবশেষগুলি ইতস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। খননের ফলে প্রাপ্ত ছাঁচে ঢালা ও ছাপযুক্ত তাম্রমুদ্রা ও বিখ্যাত N.B.P. (Northern black polished ware) পাত্র খণ্ড থেকে অনুমান করা যায় যে খ্রীঃপূঃ চতুর্থ শতকে এখানে বসতি ছিল। তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সামগ্রী যেমন মূল্যবান ও স্বল্প মূল্যের প্রস্তর বোতাম ও গুটিকা, অলংকার

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২ তদেব, পৃ. ৩২।

৩ A.S.I., A.R., P.95.

তথা কানবালা, লম্বমান কুন্ডল, নাকফুল, আংটি, মালা ছাড়া পোড়ামাটির খেলনা, তামা ও ব্রোঞ্জের সুরমাদণ্ড ইত্যাদি প্রাচীন নিদর্শনাদি মহাস্থানের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া যায়।[১] বেশীর ভাগ চিত্রফলকেই জমকালো বেশভূষা ও অলংকারে সজ্জিত স্ত্রী লোকের মূর্তি দেখা যায়। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে লিপি উৎকীর্ণ একটি গোলাকার সীল ও মহাস্থানে প্রাপ্ত ছাঁচে গড়া মুকুট পরিহিতা একটি নারীর মস্তক বিশেষ আকর্ষণীয়। ইহা গুপ্ত আমলের বলে মনে করা হয়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় অথবা প্রথম শতাব্দে নির্মিত আদি মাতা অঙ্কিত তথাকথিত শুঙ্গযুগের প্রায় ছয়টি পোড়ামাটির ফলক ও নীলাভ প্রস্তরে উৎকীর্ণ একটি প্রসাধন থালার কথাও উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বেশভূষায় সজ্জিত এক হাত কোমরে ও অন্যহাত হয় কোমর বন্ধনী না হয় ফুলের তোড়াধৃত দেবীমূর্তি দেখা যায়। দেবী মূর্তিগুলির মাথার দুপাশে ত্রিশূল, বজ্র, তীর, অঙ্কুশ অস্ত্র জাতীয় চারটি চুলের কাঁটা পরিহিত দেখা যায়।[২] স্বর্ণের বা অন্যান্য ধাতুর অলংকার তৈরীর ছাঁচ, অষ্টধাতুর বলয় ও আকর্ষণীয় কারুকার্যখচিত গোলাকার প্রস্তর খন্ড এ সময়ের মানুষের জীবনযাত্রা ও বেশ ভূষণের শৈল্পিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক।[৩]

সর্বোপরি এই আলোচনায় এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মহাস্থান একটি অতি প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান প্রাচীন পুণ্ড্রনগরীর সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করছে।

পাহাড়পুর ঃ

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামটি বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রধান শাখা লাইনের জামালগঞ্জ ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত।

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

২ তদেব, পৃ. ৩১।

৩ তদেব।

এখানে রয়েছে ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুর মহাবিহার।[১] স্হানটি ২৫°২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩´ পুর্ব দ্রাঘিমা রেখায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তথা মহাস্হানের উত্তর পুর্বে ২৯ মাইল এবং প্রাচীন জনপদ 'বর্ধ্নের'-এর দক্ষিণ পুর্বে ৩০ মাইল দুরত্বে সমতল সমভুমিতে অবস্হান করছে।[২] পলিমাটির দেশ উত্তর বর্ধ্নের সমভুমির বুকে এমনি এক জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু পাহাড়ের অবস্হিতি স্বাভাবিকভাবে এক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। সাধারণ জনগণ এই উঁচু ঢিবিটিকে পাহাড় বলত। এ থেকে এ গ্রামটির নাম পাহাড়পুর নামকরণ হয়। ঢিবিটির আশেপাশের ভুমি থেকে উচ্চতা ৮০ ফুটের বেশী নয় এবং মন্দিরের সংলগ্ন অঙ্গন থেকে ৭০ ফুট উঁচু মাত্র।[৩]

পাহাড়পুর প্রত্নাবশেষের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশক্রমে তিনি ১৮০৭ হতে ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পুর্ব ভারত সফরকালে পাহাড়পুর আসেন। পাহাড়পুরের এই বিশাল ধ্বংসস্তুপ দেখে তিনি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হন। এই খাড়া পাহাড় তিনি ১০০´ থেকে ১৫০´ ফুট উঁচু বলে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে ওয়েষ্ট ম্যাকট পাহাড়পুর পরিভ্রমণে আসেন এবং তিনিও এই বিশাল প্রত্নাবশেষের বর্ণনা করেন। কিন্তু তার বর্ণনাও বুকাননের বর্ণনার মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দে শীতকালীন সময়ে সফরকালে আলেকজান্ডার কানিংহাম পাহাড়পুরে এসে পাহাড়পুর সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই স্হানের ব্যাপক আকারে খননের উদ্দেশ্যে তিনি কিছু দক্ষ শ্রমিক আনয়ন করেন। কিন্তু এখানকার ভুস্বামী 'বলিহারের' জমিদার কিশেনচন্দ্রের (Raja Kishen Chandra) এর বিরোধিতায় তার এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। তথাপি তিনি কিছু শ্রমিক দ্বারা সেই দুর্গম জংগলের কিছু অংশ পরিস্কার করান

---

১ M.A.A. Qudir , "A Guide to Paharpur', (Departmental of Archeology Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, 1980), P.1.

২ M.A.S.I. No. 55, P. 3.

৩ Cunningham, A Tour in Bihar and Bengal, P. 117, A.S.I. A.R. Vol.VI, .. Shahanara Hussain, Paharpur and its Meterial Contents, Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. VI, 1961, P. 1.

এবং পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি ছোট আকারের খনন কাজ চালান। ফলে চারিপার্শ্বে অভিক্ষেপন যুক্ত প্রায় ২২ ফুট উঁচু একটি চতুষ্কোন কক্ষ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। বুকানন এটিকে বৌদ্ধ মন্দির বলে ইংগিত করেছেন। ওয়েস্টম্যাকট এটিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাস কক্ষের ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু কানিংহাম এর বিপরীত যুক্তি দাঁড় করিয়ে ঢিবিটি বৃহৎ ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলেছেন কারণ, এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলির মধ্যে একটিতে হিন্দুদেবী কালীর প্রতিকৃতি অংকিত ছিল।[১] লিপি সাক্ষ্য হতে অনুমিত হয় যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে সেখানে জৈন বিহার ছিল।[২] এতদসত্ত্বেও বুকানন, ওয়েস্টম্যাকট ও কানিংহামের এইসব সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে অনেক পন্ডিতদের মধ্যে নানা তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। ঐতিহাসিক শ্রী অক্ষয়কুমার ১৯২৭ সালে পাহাড়পুরকে বৌদ্ধ কীর্তির নিদর্শন বলেছেন। অতঃপর পাহাড়পুর নিবাসী একজন সুর্ণকার উক্ত ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি প্রাচীর হতে ইষ্টক আনতে গিয়ে একটি প্রস্তর স্তম্ভের লিপিযুক্ত কিয়দংশ পড়েন এবং এই লিপি প্রমাণাদি হতে এটি বৌদ্ধ স্তূপ বলে প্রতিভাত হয়।[৩] বাংলার অন্যতম প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান পাহাড়পুরের এই ধ্বংসস্তূপ 'পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন' বলে তৎকালীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ১৯১৯ সালে একটি সংরক্ষিত ধ্বংসাবশেষ বলে ঘোষিত হয় এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ হতে ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাসে পাহাড়পুরের খনন কাজ শুরু হয়। রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই খনন কার্যে সহযোগিতা করে।[৪] প্রাথমিকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডি,আর, ভান্ডারকরের নেতৃত্বে স্থানটির খনন কাজ শুরু হয়। তারপর বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ১৯২৫-২৬ সালে

---

১ Cunnigham, <u>Op.Cit.</u>, Vol. XV, PP. 118-19,
নাজিমউদ্দীন আহমেদ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২১।

২ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৭১।
S. Hussain, <u>Terracotta Find Spots of Pre-Muslim Bengal</u>, <u>J.A.S.P.</u>, Vol. XV, No. 2, P. 129-30.

৩ কাজী মিছের, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১৩৯।

৪ চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত, <u>পাহাড়পুরের বিবরণ</u>, (কলিকাতাঃ ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১), পৃ. ২-৩,

এই অংগনের কেন্দ্রস্থ বিশাল স্তুপের উত্তরাংশের খনন করে উত্তর দিকের প্রধান সিড়ি, পোড়ামাটির ফলক সন্নিবেশিত দেওয়াল ও সম্মুখস্থ প্রদক্ষিণ পথসহ উত্তরদিকের স্তম্ভযুক্ত হলঘর বা মণ্ডপ আবিস্কার করেন। ফলে এই প্রথম পাহাড়পুর মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা ও দেওয়াল অলঙ্করণ রীতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায়, ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩১-৩২ এর দিকে মিঃ জি সি চন্দ্র এ স্থানটির খনন কার্যে নিয়োজিত হন। এরপর ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত মিঃ কে এন দীক্ষিত পাহাড়পুরের খনন কাজ চালিয়ে কেন্দ্রীয় মন্দিরের ৪০০ গজ পুর্বদিকে সত্যপীরের ভিটা, চতুর্দিকবেষ্টিত বিশাল সোমপুর বিহার এবং তারা মন্দির আবিস্কার করেন।[১] পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষ হতে আনুমানিক ৪৭৮ খ্রীস্টাব্দের একটি গুপ্ত তাম্রশাসন পাওয়া যায়।[২] এতে লিখিত আছে যে নাথশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং তার পত্নী ভূমি ক্রয়ের জন্য পুণ্ড্রবর্ধনের নগর শ্রেষ্ঠীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে এই ভূমি চাষাবাদ করে যে অর্থ উপার্জন হবে তার দ্বারা জৈনগুরু গুহনন্দীর জন্য বটগোহালীতে অবস্থিত বিহারে একটি বিশ্রামাগার নির্মিত হবে। এ লিপি হতে জানা যায় খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে উত্তর বংগ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাস্তবিকই ঐ সময়ে পাহাড়পুরের একাংশের নাম ছিল বটগোহালী (বর্তমানে গোয়ালভিটা)। অতএব পাহাড়পুরে আবিস্কৃত তাম্রশাসন হতে এ ধারণা করা যেতে পারে যে গুপ্তযুগে পাহাড়পুরে একটি জৈন বিহার অথবা মন্দির ছিল। প্রত্নবিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে সঠিক করে কিছুই উল্লেখ করেননি। তবে ৫ম শতাব্দীর গুপ্ত তাম্রশাসন পাহাড়পুরের অতি প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।[৪]

অষ্টম শতক হতে প্রায় চার শত বৎসর পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের ও অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে পাল আমলের যুগ পর্ব অতিবাহিত হয়েছে। এই বৌদ্ধ পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা-

---

১ M.A.A. Qudir, Op.Cit., P.1-2, A.S.I.,A.R., 1930-34, P.122.

২ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২,
Epigraphia Indica, ed. by N.K. Dikshit, XX, P.61.

৩ চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

লাভের সংগে সংগে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ও বিহারে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়ের অনেক বৌদ্ধবিহার যেমন বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী এবং সোমপুর বিহার প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোটকথা পাল রাজত্বের প্রথমভাগে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দে ধর্মপাল নিজেদের পিতৃভুমি বরেন্দ্রে একটি বিশাল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। এই সোমপুর বিহারটির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান পাহাড়পুরে বিদ্যমান।[১] পাহাড়পুরে ধর্মপাল দেবের নামাঙ্কিত কতগুলি মৃণ্ময় মুদ্রিকা পাওয়া গেছে। এই মুদ্রিকাগুলিতে "শ্রীসোমপুরে শ্রীধর্মপালদেব মহাবিহারীয় ভিক্ষু সংঘস্য"[২] লিখিত আছে। এতে বোঝা যায় যে, সোমপুরের মহাবিহার শ্রীধর্ম পাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি আনুমানিক ৭৬১-৮১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বিখ্যাত তিব্বতীয় ইতিহাস গ্রন্থ পাগ্-সাম্-জোন-ঝাং (Pag-Sam-Jan-Zong)এর লেখক তারানাথ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেবপালের পিতা ধর্মপাল কর্তৃক সোমপুরে নির্মিত বিশাল বিহার ও সুউচ্চ মন্দিরের উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন লিপিমালাতেও খ্রীস্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দে এই বিহারের সমৃদ্ধিশীল অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্ব যুগের ভাস্কর্য ও নানা প্রকার লিপি এখানে আবিস্কৃত হলেও নিঃসন্দেহাতীতরূপে পাহাড়পুর মন্দির পাল রাজত্বের প্রথম যুগে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে।[৩] এছাড়া অষ্টম শতাব্দীর শেষ অর্ধশতাব্দীতে ধর্মপুর নামক একটি গ্রামে অবস্থিত বিহার হতে এই বৃহৎ মঠের প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায়।[৪] দেবপালের রাজত্বকালের পর পাল বংশের ইতিহাসে অবক্ষয় ও পতনের যুগ শুরু হয়।

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

২ S. Hussain. J.A.S.P., Vol. VI, 1961, p. 3.
M.A.S.I., No. 55, p. 7.

৩ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৪ V.R.S. Monographs No. 5, p.27.

পরবর্তীতে পাল শক্তি প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৬) এর আমলে পুনরুজ্জীবিত হয়। এই দশম শতাব্দীর শেষ এবং একাদশ শতাব্দীর শুরুতে এখানে প্রধান মন্দির, মঠের কক্ষ পুনঃসংস্কার করা হয় এবং সত্যপীরের ভিটা, তারা মন্দির অসংখ্য স্মারক (Votive) স্তুপ উন্নতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ গয়াতে প্রাপ্ত একটি লিপিতে সোমপুরের মহাবিহারবাসী বীরেন্দ্র ভদ্র এই বিহারের সুদূর প্রসারী যশ এবং বিস্তৃতির উল্লেখ করেছেন। অতঃপর প্রথম মহীপালের রাজত্বের পর পাল রাজাদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বহিরাগত সৈন্যরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে এই বৌদ্ধ বিহারের ক্ষতি সাধন করে। বিপুলশ্রীমিত্রের নালন্দা লিপির দ্বিতীয় শ্লোক হতে এই তথ্য পাওয়া যায়।[১] দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রামপাল পুনরায় স্বীয় প্রচেষ্টায় পাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ নালন্দায় প্রাপ্ত বিপুলশ্রীমিত্রের অনুশাসনে লিখিত আছে তিনি বহুকাল সোমপুরের মহাবিহারে বাস করেছিলেন। তিনি এখানে একটি তারা মন্দির নির্মাণ, সোমপুর মহাবিহারের অন্তর্গত চারটি প্রকোষ্ঠের আমূল সংস্কার এবং একটি বুদ্ধমূর্তি অলংকৃত করার জন্য স্বর্ণালংকার প্রদান করেন।[২] পাল নৃপতি রামপালের রাজত্বকালের পর পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন হয় এবং বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন বংশীয় নৃপতিগণ ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁরা বাংলায় ব্রাহ্মণ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[৩] এই সময় থেকে সোমপুর মহাবিহার অবহেলিত হয়ে পড়ে।

তবে পাহাড়পুর বিহারের বহির্দেশে দক্ষিণ পূর্ব দিকে পরবর্তী যুগের নির্মিত একটি মন্দির আবিস্কৃত হয়েছে। তার গাঁথুনীতে চুনের ব্যবহার করা হয়েছে এবং মেঝেতে গোলাপ-ফুল অলংকৃত কয়েকটি ইট পাওয়া গেছে। এই সমস্ত খ্রীষ্টীয় পনর, ষোড়শ শতাব্দের নিদর্শন।[৪] পাহাড়পুরের পশ্চিমদিকের কক্ষগুলিতে খন্ড পাথরের ভিত্তিমূল, পাথরের সুস্তের ব্যবহার

---

১ চারুদাসগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

২ তদেব।

৩ S.Hussain, E.L.P.E., P. 47.

৪ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

হয়েছিল। কোন কোন স্তম্ভ ছাঁচে ঢালা পত্রগুচ্ছের নকশা এবং মুক্তাখচিত অলংকৃত ফিতায় বাঁধা রাজহংস এবং অন্যদিকে পদ্ম গাছের দৃশ্য খচিত ছিল। এগুলি সপ্তম শতাব্দীর প্রথম-দিকের নিদর্শন বলা যায়।[১] পালবংশের শাসনামলে শিল্পকলা রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। বিশেষতঃ ধর্মপাল, দেবপালের সাম্রাজ্যকালের বৌদ্ধ মহাবিহারগুলি বৌদ্ধ ধর্মের এবং শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ এ সময়ের দুইজন ভাস্কর ধীমান এবং তার পুত্র বীটপাল এর উল্লেখ করেছেন।[২] তারা দুজনই খোদাই শিল্পী হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং শিল্পীদ্বয় ধাতব, মৃৎশিল্প আর চিত্রকলার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন। বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে পালদের রাজত্বকাল ছিলো গৌরবময় যুগ।

পাহাড়পুরে আবিস্কৃত বিশাল সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ সমগ্র পাক-ভারত উপ-মহাদেশে আবিস্কৃত বিহারগুলির মধ্যে একক বৃহৎ বিহার। এটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৯২২ ফুট দীর্ঘ এবং পূর্ব পশ্চিমে ৯০৯ ফুট প্রস্থ। এর চতুর্দিকের ১৭৭টি বাসোপযোগী কক্ষ, বিস্তৃত প্রবেশ পথ, অসংখ্য নিবেদন স্তূপ, ছোট ছোট মন্দির, পুষ্করিণী ও সংলগ্ন অন্যান্য নিদর্শনগুলি ছড়িয়ে আছে।[৩] ভূমি পরিকল্পনায় এর আকার একটি ক্রশের মত এবং প্রতিবাহু অতিরিক্ত যুক্ত। মন্দিরটি ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠেছে এবং চলা ফেরার জন্য মন্দিরে প্রদক্ষিণ পথ আছে। মন্দিরের দেওয়ালের বর্হিভাগ অলংকৃত ইট, উদ্গত বপ্রইটের কার্নিস এবং নীচে কারুকার্য করা পোড়ামাটির ফলক ও প্রস্তর ফলক দিয়ে অলংকৃত করা হয়েছে। এই মন্দির স্থাপত্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিশেষ করে বার্মা ও জাভার মন্দির স্থাপত্যকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। সাম্প্রতিককালে খননের ফলে কুমিল্লা জেলার ময়নামতী পাহাড়ে শালবন বিহার নামক স্থানে অনুরূপ স্থাপত্য শৈলী বিশিষ্ট এক বিহার আবিস্কৃত হয়েছে। আকারে ছোট হলেও এককভাবে এই শালবন বিহার ও মন্দির অত্যন্ত আকর্ষণীয়।[৪]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

২ M.A.A. Qudir, Op.Cit., P. 3.

৩ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৪ M.A.A. Qudir, Op.Cit., P. 9.

সোমপুর বিহার পাল আমলে বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। বীরেন্দ্র ভদ্রের বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত লিপি এবং বিপুলশ্রী মিত্রের নালন্দার লিপিতে সোমপুর বিহারের উল্লেখ আছে। সপ্তদশ অষ্টাদশ পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধদের ঐতিহ্য বহন করছে এই বিহার।[১]

বহু সংখ্যক পোড়ামাটির ফলক পাহাড়পুর ধ্বংসস্তূপ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এগুলির বেশীর ভাগ মন্দিরের বহির্দেওয়ালে লাগান অবস্থায় এবং কিছু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। দেখা যায় লোক জীবনের চরিত্র চিত্রনই পাহাড়পুর পোড়ামাটির ফলক চিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট। তবুও উন্নতমান, বৈচিত্র এবং প্রাণগতিতে পরিপূর্ণ অসংখ্য পাহাড়পুরের ফলকচিত্রগুলি শুধু ময়নামতীর ফলকের সাথেই তুলনীয়। বাংলার বৌদ্ধ ধর্মের এই দুটি কেন্দ্রস্থলের সময়কাল আনুমানিক একই। ভারতীয় উপমহাদেশের পোড়ামাটি শিল্প সিন্ধু সভ্যতার মতই প্রাচীন। পাহাড়পুর মন্দিরের অলঙ্করণ ফলকগুলির অনুরূপ ফলক বিকানীরের হনুমানগড়ে, সিন্ধুর মিরপুর খাসের স্তূপে এবং সাহেত মাহেত এর একটি মন্দিরেও পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের ফলক-গুলিতে দেখা যায় পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের বিচিত্রমুখী জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডের দৃশ্য, বাংলার প্রত্যন্ত সীমায় বসবাসকারী আদিম উপজাতী শবরদের চিত্র, রামায়ণ কাহিনী, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, দেব-দেবীর মূর্তি, কৃষ্ণলীলা, অর্ধ মানব অর্ধ দেবতা রূপে চিত্রিত নরনারী। এছাড়া পশু-পাখী, ফুল, গাছ, জনপ্রিয় পঞ্চতন্ত্র ও লোক সাহিত্যের উপাখ্যান পাহাড়-পুরের শিল্পীরা শিল্পের বিষয়বস্তু করেছিল। শিল্পীরা অত্যন্ত সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে, কাদামাটির সাহায্যে ফলক চিত্রগুলিতে শিল্প মানসের রূপ দিয়েছে।[২] এসব শিল্পে উচ্চ-সুরের শিল্প উৎকর্ষতা যদিও লক্ষ্য করা যায় না তবু প্রকৃতি, মানুষ ও জীব জন্তুর জীবনা-লেখ্য শিল্পায়নে শিল্পীদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রকাশ অনস্বীকার্য। বাস্তবিক পক্ষে এ যুগের বাংলার সমাজ ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে পোড়ামাটির ফলক চিত্রগুলিতে পাল আমলের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যই ধরা পড়েছে। আর দৈনন্দিন জীবন চিত্র হতেই সেকালের

---

১ R.C. Majumder, (ed), H.B., Vol. I, p. 182.
E.I., XXI, p. 98.

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০।

রমণীদের বেশ ও ভূষণের একটি স্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে ধরা পড়ে।[১] পাহাড়পুরে প্রাপ্ত বেশীর ভাগ পোড়ামাটির ফলক চিত্রগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বা তার মাঝামাঝিতে নির্মিত কারণ ফলকগুলির অধিকাংশই মন্দির নির্মাণকালের সমসাময়িক। কিছু ফলক পরবর্তী আরও দুই শতাব্দী পর্যন্ত তৈরী হয়েছে বলে জানা যায়।[২]

পাহাড়পুরের প্রধান মন্দিরের চতুর্দিকে দেওয়াল গাত্রের নিচের অংশ থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন অংশ পর্যন্ত ৬৩টি পাথরের মূর্তি দ্বারা অলংকৃত ছিলো। ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি যেমন, ইন্দ্র, শিব, অগ্নি, উষা, কুবের ইত্যাদির খোদিত ভাস্কর্য, রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান থেকে রামের কাহিনী ও কৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত ছাড়া কিছু সংখ্যক ভাস্কর্যে নৃত্য-রত নারীও প্রণয়রত যুগলের মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। এ সমস্ত প্রস্তর ভাস্কর্যে উন্নতমানের শিল্প সৌকর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়না। মূর্তিগুলিকে সুন্দরভাবে গড়ারও কোন প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় না। পাল শৈলীতে নির্মিত শিল্পের সাথে এগুলির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাহাড়পুরের ভাস্কর্যের সময়কাল সম্বন্ধে কোন উৎকীর্ণ লিপি সংক্রান্ত তথ্য নাই, কেবলমাত্র নির্মাণের রীতিনীতি বা ধারার উপর ভিত্তি করে এর সময়কাল নির্ণয় করা হয়। পাহাড়পুরের এই বিরাট মন্দির বিহারের মধ্যে শুধুমাত্র একটি বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব, পদ্মপানির অস্তিত্ব বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি করে। এটি অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর তৈরী বলে ধারণা করা হয়। অন্য একটি রিলিফ ভাস্কর্যে দেখা যায় বুদ্ধের জন্মের দৃশ্য।[৩] দেখা যায় এ দুটি মূর্তির কর্মদক্ষতা অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় বিষয়বস্তুর খোদিত প্রস্তর মূর্তি চিত্র থেকে পৃথক। এখানে প্রাপ্ত খোদিত হিন্দু মূর্তিগুলি দুধরনের ছিল। কিছু মূর্তি ছিল

---

১ R.C.Majumder, H.B., Vol.I,P.528;
Shahanara Hussain, E.L.P.E., P.48;
নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

২ R.C. Majumder, (ed), H.B. Vol.I,P.528;
S. Hussain, J.A.S.P., Vol. VI, 1961, P. 6.
M.A.S.I., No. 55, P. 58.

৩ S. Hussain, J.A.S.P. Vol. VI, 1961, P.6-7;
M.A.S.I. No. 55, P. 49.

উন্নত ধাঁচের। কিছু মূর্তি দেখে মনে হয় সেগুলি পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তি নয় এগুলি নিকটবর্তী কোন ব্রাহ্মণ্য মন্দির ধ্বংস প্রাপ্তের পর এখানে আনা হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে উন্নতমানের প্রস্তর ভাস্কর্যগুলি সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর অপরিপক্ক ধাঁচের ভাস্কর্যগুলি সম্ভবতঃ মন্দিরের অলংকরণের জন্য আনা হয়নি।[১] এস কে সরস্বতী পাহাড়পুরের প্রস্তর ভাস্কর্যগুলিকে গঠনশৈলী ও শৈল্পিক উৎকর্ষতার বিচারে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীর মূর্তিগুলির শৈল্পিক উৎকর্ষ ও গঠন সৌকর্য দেখে এগুলিকে গুপ্ত ঘরানায় নির্মিত বলে ধরা হয়। দেহের সংগে সংলগ্ন সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ আবরণ এবং সর্বোপরি মূর্তিগুলির গঠনে স্বাভাবিকতা ও বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের সামঞ্জস্য, সুন্দর কারুকার্যখচিত অলংকার, ভাস্কর্যগুলিকে সূক্ষ্মতা ও কমনীয়তা দান করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাস্কর্যগুলিতে গুপ্তরীতির প্রভাব লক্ষণীয়। এই শ্রেণীর প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির শরীরের বিরাটত্ব, বস্ত্রের স্থূলতার এবং অলংকরণ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথম শ্রেণীর মূর্তির তুলনায় এগুলিতে গঠন মাধুর্যের ও সূক্ষ্মতার অভাব থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাস্কর্যগুলিকে আকর্ষণীয় মনে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাস্কর্যের সংখ্যা প্রচুর এবং এগুলিতে প্রথম শ্রেণীর গুপ্তরীতির ভাস্কর্যের কোন বৈশিষ্টই পরিলক্ষিত হয়না। উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির দেহ ভারী। দেহের সর্বাংগে কাপড় জড়ানো। বেশীর ভাগ মূর্তি আঁটসাঁট পোষাক পরিহিত তবে মূর্তিগুলির সাবলীল, গতিশীলতা এবং প্রাণবন্ত রূপ আকর্ষণীয়। শৈল্পিক বিচারে এই ভাস্কর্যগুলি কিছুটা স্থূল এবং ত্রুটিপূর্ণ হলেও এই মূর্তিগুলির মাঝেই প্রাচীন বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সুখ ও দুঃখের বিভিন্ন দিক অপরূপভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[২]

সরস্বতীর মতে এই তিন শ্রেণীর ভাস্কর্য ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের এবং নিজস্ব বৈশিষ্টে পরিপূর্ণ, উপাদানগুলিতেও বিশেষত্ব আছে যেমন প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্যগুলি ধূসর বেলে পাথরের,

---

১ S. Hussain, J.A.S.P. Vol. VI, P. 7.

২ S.K. Saraswati, "Early Sculpture of Bengal", Journal of the Department of Letters, Vol. XXX., 1938, P. 33-41.
S. Hussain, J.A.S.P., Vol. VI, P. 7.

দ্বিতীয় শ্রেণীর গুলি নীলাভ ভারী শিলা পাথরের এবং কালো ভারী শিলা পাথরের তৈরী তৃতীয় শ্রেণীগুলি। এই তিন শ্রেণীর ভাস্কর্য ভিন্ন ভিন্ন সময়কালের যেমন এগুলিকে পর্যায়-ক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শতকের বলা যেতে পারে। সরস্বতী আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলিকে সপ্তম শতাব্দীর এবং প্রথম শ্রেণীগুলিকে গুপ্তযুগের প্রাচ্য সংস্করণ বলে ধারণা করেন।[১] ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতানুসারে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রস্তর মূর্তিগুলি তিনটি শ্রেণীভুক্ত এবং এগুলি দুই শতাব্দীর সাংস্কৃতিক মানসের অভিব্যক্তি যা বিহার মন্দিরে উৎকীর্ণ হয়েছে। মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির ফলক ছাড়াও মন্দির সজ্জায় প্রস্তর ফলকের ব্যবহার প্রচুর করা হয়েছে। এগুলিতে নির্মাণকলার কোমল সংবেদনশীল রূপায়ন ছাড়া দেবদেবীর বসন-ভূষণের গঠন ও বিন্যাসে সুসামঞ্জস্যের রুচি ও সুরুবোধ প্রত্যক্ষ। প্রস্তর ফলকগুলি প্রতিমালক্ষণ শাস্ত্র দ্বারা নিয়মিত। দেহ ভঙ্গীমাগুলিকে অবসরপুষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত সমাজের উচ্চতর বর্ণ ও শ্রেণী স্তরের বলে মনে হয়।[২]

প্রস্তর ফলক মূর্তি ছাড়া পাহাড়পুরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ব্রোঞ্জের স্বল্প সংখ্যক মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলির মধ্যে অলংকৃত দণ্ডায়মান নারী মূর্তি, হরগৌরী, বোধিসত্ত্বের মাথা, অর্ধাংশ বোধিসত্ত্বের মূর্তি, গণেশ মূর্তি, দণ্ডায়মান বুদ্ধ, উলংগ জৈন মূর্তি ইত্যাদি যেগুলিকে পাল রীতির অধিভুক্ত বলা যায়।[৩] পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের সংক্ষেপ আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পাহাড়পুরের প্রাচীন কীর্তি অষ্টম শতকের ধর্মপাল আমলের সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এর বিস্তৃতি এবং সমৃদ্ধি মুসলিম আগমণ তথা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। মোটামুটি পাহাড়পুরের ইতিহাসকে চারশত বৎসরের শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে বিচার করা যায়।

---

১ S.K. Saraswati, Op.Cit., P. 80; R.C. Majumder, (ed), H.B., Vol. I, P. 509.

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-১১।

৩ S.K. Saraswati, Op.Cit., P. 39.
S. Hussain, J.A.S.P., Vol. VI, P. 10.

<u>ময়নামতী ঃ</u>

কুমিল্লা জেলা শহর থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে ছোট ছোট পাহাড় শ্রেণী সম্বলিত ময়নামতী অঞ্চলটি অবস্থিত। এলাকাটির গড় উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ৯০ ফুট এবং চারি-পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি থেকে ৪০ ফুট এবং ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত।[১] নিকটস্থ ময়নামতী নামে একটি গ্রামের অস্তিত্বহেতু এই পাহাড় শ্রেণীর উত্তর অংশের নাম ময়নামতী, আর দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত অংশটিকে লালমাই বলা হয়ে থাকে।[২] দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর জন্য আবাসাদি নির্মাণের জন্য কুমিল্লার ৬ মাইল পশ্চিমে ময়নামতীতে খননকালে আকস্মিকভাবে পাহাড়গুলিতে বৌদ্ধ সভ্যতার সমৃদ্ধিশীল কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জরিপের ফলে এই দীর্ঘ উঁচু শ্রেণীর পাহাড় এলাকা-টি এক বৃহৎ প্রাচীন কীর্তির উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে চিহ্নিত হয়। কিন্তু এই সুপরিকল্পিত কাঠামো সম্পন্ন স্থান হতে বেশ কিছু সংখ্যক ইট খুলে নিয়ে সামরিক ঠিকাদাররা নির্মাণ-কার্যে ব্যবহার করে ফেলে। এই সময় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ একাজে বাধা দেয় এবং ১০টির বেশী এলাকাকে 'পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন' বলে রক্ষা করে এবং ১৯৫৫ হতে তদানীন্তন পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতি বছর খননকার্য চালাতে থাকে।[৩]

এই ময়নামতী গ্রাম এবং সংযুক্ত পাহাড়টি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলার লোকগাঁথা ও লোকগীতির প্রসিদ্ধ মানিক চন্দ্রের স্ত্রী এবং গোপীচন্দ্রের মাতা রাণী ময়না-মতীর কথা। এই ময়নামতী এবং তার পুত্রকে ঘিরে বাংলায় অনেক জনপ্রিয় গীত প্রচলিত আছে। এই সমস্ত গোপীচন্দ্রের গীতের কোন কোনটি হতে জানা যায়, তিনি মৃকুল (Mrkula) বর্তমানে যা ত্রিপুরা বিভাগের মেহরকুল (Meharakula) নামে পরিচিত সেখানকার

---

১ F.A. Khan, <u>Mainamati</u>, (Exavation, 1955), P. 1.

২ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৪৯।

৩ F.A. Khan, <u>Op.Cit.</u>, P. 1.

একজন শাসক ছিলেন। লামা তারনাথের বিবরণে আমরা জানতে পারি পাল সাম্রাজ্যের পুর্বে বাংলায় চন্দ্র বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। আর এ রাজবংশের একজন রাজা হলেন গোপীচন্দ্র, যিনি রাজত্ব করেছিলেন প্রায় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে পর্যন্ত। এই ময়নামতীর রাজা গোপীচন্দ্র বা গোপী চাঁদের লৌকিক কাহিনী অনুসারে রাজ্য পরিত্যাগের পর গোপীচাঁদ তাঁর দুই স্ত্রী অদুনাপদুনাসহ সিদ্ধাচার্য হাড়িপার (জালন্ধরিপাদ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাড়িপা, কাহ্নপা বা কৃষ্ণপাদের শিষ্য ছিলেন। কাহ্নপাদ চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে একজন। তিনি চর্যা গীতগুলি দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচনা করেছিলেন।[১]

তীব্বতী ঐতিহাসিক বৌদ্ধ লামা তারনাথের বিবরণ হতে পুর্ব ও দক্ষিণ বাঙলায় ষষ্ঠ হতে অষ্টম শতাব্দীতে চন্দ্রবংশের রাজত্বের কথা আমরা জানতে পারি। এছাড়া কিছু তাম্র ও প্রস্তর লিপি, মুদ্রা এবং বার্মার ইতিবৃত্ত বা কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী থেকে চন্দ্র রাজবংশের সম্পর্কে জানা যায়।[২] উল্লেখিত ঘটনাপঞ্জীতে চন্দ্রবংশের নয়জন রাজার ৭৮৮ থেকে ৯৫৭ শতাব্দীর মধ্যে এখানে রাজত্ব করার কথা লিখিত আছে। আরাকানে প্রাপ্ত কিছু মুদ্রার সাথে আনন্দ রাজার প্রাসাদের ধ্বংস স্তুপে প্রাপ্ত মুদ্রার সাথে সাদৃশ্যও তাৎপর্যপুর্ণ। আরাকানের মুদ্রাগুলি ছিল পাতলা দস্তার এবং প্রতীক ধর্মী যা প্রাচীন প্রস্তর যুগীয় নিদর্শনের ইঙ্গিত বহন করে।[৩] কিন্তু ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের বর্ণনা থেকে আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজা আনন্দচন্দ্রের (আনুঃ ৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে) একটি সুদীর্ঘ প্রশস্তি শিলালেখ প্রাপ্তির কথা জানা যাচ্ছে। এই প্রশস্তি-তে একুশ জন রাজার উল্লেখ আছে, অর্থাৎ প্রায় চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠানহয়েছিল বলে মনে হয়। তবে আরাকানের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের প্রচুর

---

১ R.C. Majumder, (ed), H.B., Vol. I. pp. 182-87.

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৩ R.C. Majumder, (ed), op.cit., Vol. I. p. 192.

৪ B.C. Law Volume, Part-II, p. 217.

ধাতু মুদ্রার সাথে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মুদ্রার ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা সকলেই স্বীকার করেছেন। আবার আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন অনেক প্রতিমা পাওয়া গেছে যার সাথে লালমাই ময়নামতীর নবাবিস্কৃত প্রতিমা-সাকোর সমৃদ্ধ এ দুটি অঞ্চলের ঘনিষ্ট যোগাযোগের।[১] এ থেকে অনুমিত হয় যে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গের শক্তিশালী চন্দ্ররাজ বংশের সাথে আরাকানের চন্দ্র রাজবংশের এবং আরাকান অঞ্চলের সাথে সমতট অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিলো।

ময়নামতী অঞ্চলে শক্তিশালী চন্দ্রবংশের নবম শতাব্দীর শেষার্ধ হতে একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত রাজা শাসনের ইতিহাস লুকায়িত আছে যা ময়নামতীতে প্রাপ্ত চন্দ্রবংশীয় তাম্র-শাসন হতে জানা যায়। এই বংশের প্রথম দুইজন রাজা পূর্ণচন্দ্র ও তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র রোহিতাগিরিতে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ পূর্ণচন্দ্র বৌদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু সুবর্ণচন্দ্র বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করেন এবং পরবর্তী রাজাগণ সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন।[২] ময়নামতী ও লালমাই পাহাড়গুলি বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল এবং এ কেন্দ্রভূমির বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরগুলি এ বংশের রাজারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। চন্দ্র-বংশের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের রাজধানী দেবপর্বত ময়নামতী-লালমাই পর্বতে অবস্থিত ছিল।[৩]

তাম্রশাসন ও মুদ্রা হতে লালমাই ময়নামতী পাহাড়ে দেব উপাধিধারী রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৌদ্ধ রাজবংশের বংশানুক্রমে রাজত্বের কথা জানা যায়। তাদের রাজধানী ছিল দেবপর্বত। এই দেব রাজারা স্বাধীনভাবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দের শেষ ভাগে ও অষ্টম শতাব্দের প্রারম্ভে খড়গ বংশীয় রাজাদের পরে এদেশে এসে রাজত্ব করেন।[৪]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯-৪০৬।

২ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৩ Shahanara Hussain, E.L.P.E., PP.62-63.

৪ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

কুমিল্লা হতে ২০ মাইল দক্ষিণে দেউলবাড়ী নামক স্থানে খড়্গ বংশীয় রাণী প্রভাবতীর নামসহ একটি ব্রোঞ্জের সর্বাণী মুর্তি আবিস্কারের ফলে কুমিল্লার প্রান্তসীমায় খড়্গ বংশীয় রাজাদের অস্তিত্বের কথা সুদৃঢ় হয়।[১] খড়্গ বংশীয় পঞ্চম নৃপতি রাজপুত্র বলভট্টের জয়-স্কন্ধাবার ছিল দেবপর্বত নগর। খড়্গদের সামন্ত রাজ বংশীয় নৃপতিগণের রাজধানীও দেবপর্বতে ছিল।

ময়নামতীতে আবিস্কৃত একখানি তাম্রশাসনে শ্লোক আছে যে, দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দে সপ্তদশ শতক বৎসরের রাজত্বকালে রাজা রণবঙ্কমল্ল শ্রী হরিকেল দেব পট্টিকেরা নগরীতে এক বৌদ্ধ বিহারের জন্য কিছু ভূমিদান করেন। লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের নিকটস্থ বর্তমান পট্টিকেরা পরগণা ও তাম্রশাসনে পট্টিকেরা নগরীর উল্লেখ দৃষ্টে মনে হয় ময়নামতী পাহাড় অঞ্চলে ঐ নামের একটি রাজ্য ছিল। পট্টিকেরা রাজ্য সম্পর্কে আমরা বার্মার ইতিবৃত্ত হতেও জানতে পারি।[২] শ্রী হরিকেল দেব প্রাচীন পট্টিকেরা রাজবংশীয় ছিলেন এবং নিজেই একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩] নীহাররঞ্জন রায়ের মতে,"প্রাচীন পট্টিকেরা নগর এবং ময়নামতী গ্রাম এক এবং অভিন্ন"। এই গ্রাম পাহাড় এ প্রাপ্ত অনেক প্রত্নবস্তু, লিপি মুর্তি ও মুর্তির অংশ, তাম্র মুদ্রা খন্ড, পোড়ামাটির ফলক ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সম্প্রতি আকস্মিক খননের ফলে ময়নামতীর ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ধ্বংস স্তুপের ভিতর হতে এই সুপ্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। ময়নামতী পাহাড়ের এলোমেলোভাবে শায়িত এবং এই সুবিস্তৃত ধ্বংসা-বশেষই প্রাচীন পট্টিকেরার ধ্বংসাবশেষ।[৪] কুমিল্লা অঞ্চল যে প্রাচীন সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা তাম্রশাসন থেকে স্পষ্ট জানা যায় এবং পরবর্তীতে এই সমতট রাজ্য বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় রাজাদের হাতে চলে যায়। চন্দ্র রাজাদের আমলে এই ময়নামতী লালমাই অঞ্চল বা সমতট

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

২ তদেব, পৃ. ৫০-৫১।

৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

তাঁদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মুসলমান আগমণের পূর্ব পর্যন্ত এটি যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির তীর্থ ভুমি ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[১]

ময়নামতী-লালমাই পাহাড়গুলি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির, বিহার, স্তুপ ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদে পূর্ণ ছিল। মন্দির গাত্রগুলি অলংকৃত হয়েছে সে যুগের বাংলার লোকায়ত শিল্পের নিদর্শন অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক চিত্র দিয়ে। এ সমস্ত ফলকে দেব-দেবতার, মানুষের, পশু-পাখীর ইত্যাদির প্রতিকৃতি শোভা পেত। ফলে এগুলিতে আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যেত। যেমনটি দেখা গিয়েছিল পাহাড়পুরে ও মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ফলক চিত্রে। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত পঞ্চাশটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের মধ্যে রয়েছে শালবন বিহার, আনন্দরাজার বাড়ী, রুপবান কন্যার মুড়া, ভোজরাজার বিহার, চারপত্র মুড়া, কোটিলা মুড়া, রাণী ময়নামতীর প্রাসাদ ও মন্দির প্রভৃতি। এগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এখানকার সমস্ত বিহারগুলির ভুমি পরিকল্পনা পাহাড়পুরের বিহারের অনুরুপ বলা যায়। আকারে ছোট কয়েকটি বিহারের কথাও জানা যায়। প্রত্যেকটি বৃহৎ বিহারের কেন্দ্রস্থলে এক একটি মন্দির ছিল এবং মন্দির গাত্র অলংকৃত ছিল পোড়ামাটির ফলক চিত্রে। তাম্রশাসন ছাড়া স্বর্ণমুদ্রা, অলংকার, বহু রৌপ্যমুদ্রা, দুইটি ব্রোঞ্জের স্মারকাধার, ছোট ছোট ব্রোঞ্জে নির্মিত বহু বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব অন্যান্য বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি, অলংকৃত ইট, প্রস্তর ভাস্কর্য এবং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসপত্র ময়নামতীতে আবিস্কৃত হয়েছে। ময়নামতীতে প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ্য মূর্তিগুলি পাল ঘরানার মূর্তি বলে মনে হয়।[২] ময়নামতীতে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ ও বেলে পাথরের নির্মিত শেষ পর্যায়ের বিভিন্ন বৌদ্ধ দেব-দেবীর গঠন বৈচিত্রে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূর্তিগুলির গঠন বৈচিত্রে দুটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি মূর্তি অত্যন্ত স্থূল ও বৈচিত্রহীন, অন্যগুলিতে রয়েছে গঠন বিন্যাস ও শিল্প মাধুর্য। বুদ্ধ মূর্তিগুলি প্রায়ই পদ্মাসনের উপরে

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

২ F.A. Khan, Op.Cit., P. 13-14.

ধ্যান মুদ্রায় উপবিষ্ট। অলংকার সমৃদ্ধ একটি বোধিসত্ত্ব পদ্মপানি মূর্তি অত্যন্ত উন্নত শিল্পের নিদর্শন। তার বাম হাতে দীর্ঘ মৃণাল বিশিষ্ট একটি পদ্ম। 'তারা' বা 'সর্বাণী'র মূর্তি দুটি অলংকার সমৃদ্ধ শিল্প নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে। ময়নামতীতে প্রাপ্ত প্রস্তর ভাস্কর্যের সংখ্যা অল্প হলেও শিল্প প্রচেষ্টার দিকে এগুলি উৎকৃষ্টমানের এবং বাংলার মৌলিক শিল্পশৈলীর পরিচায়ক। সংগৃহীত ধূসর রঙের নরম চূর্ণীভূত এক প্রকার প্রস্তর দিয়ে এই ভাস্কর্যগুলি নির্মাণ করা হয়েছে।

সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদেব বংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে নির্মিত ময়নামতীর শালবন বিহারের এখানকার কেন্দ্রীয় মন্দিরের গাত্রে বা পূর্ব পশ্চিমে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক চিত্রের সংখ্যা পাহাড়পুরের তুলনায় অল্প। গ্রাম্য শিল্পীদের দ্বারা সহজলভ্য মাটির তৈরী এই ফলকগুলিতে উচ্চস্তরের শৈল্পিক দক্ষতা তেমন না থাকলেও পাহাড়পুরের ফলক চিত্রগুলির মত এখানকার ফলক চিত্রগুলি তৎকালীন সমাজের জীবন ও সভ্যতার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। ফলক চিত্রের বিষয়বস্তুগুলি জীবনাবেগে ও সহজ প্রকাশ ভংগীতে মূর্ত এবং বিভিন্ন ভংগীতে স্ত্রী-পুরুষ, জন্তু, পক্ষী-দেবতা, অর্ধ দেবতা ও ফুল লতাপাতা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই ফলক শিল্পের বিষয়বস্তু। মানুষের মূর্তি গঠনে স্ত্রী-পুরুষ নর্তকী ও যোদ্ধা ময়নামতীর শিল্পীদের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল। অর্ধ-দেবতাদের মধ্যে কিন্নরী মূর্তি এখানে প্রচুর। পশু পক্ষীর মধ্যে রাজহংসের মূর্তি অপূর্ব মাধুর্যে ফলকে চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া পদ্ম ও জলচর প্রাণী সর্বত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে বালুমাটির হাড়ি ও নানা রকম জিনিসপত্রের সংখ্যাও কম নয়। এখানে খননের ফলে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ নির্মিত আংটি, কানের দুল, হাতের চুড়ি প্রভৃতি অলংকারগুলি সে যুগের রমণীদের ভূষণ সামগ্রীর সাক্ষ্য দেয়।[১] আনন্দ বিহার ও ভোজ রাজার বিহারে বহু পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। এই ফলকগুলির বিষয়বস্তু ও নির্মাণ কৌশল শালবন বিহারে প্রাপ্ত ফলকগুলির অনুরূপ। এগুলি কেন্দ্রীয় মন্দির গাত্র অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়েছিল। উপরোক্ত স্থানগুলিতে

---

১ R.C. Majumder (ed), H.B., PP.256-57.

খননের ফলে আবিস্কৃত প্রত্ন সামগ্রীর গুরুত্ব অনেক। প্রত্নসাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। আবিস্কৃত প্রত্নবিদর্শনগুলির মধ্যে আটটি তাম্রশাসন, স্বর্ণমুদ্রা, ২৭৭টি রৌপ্য মুদ্রা, অলংকার, দুইটি ব্রোঞ্জের স্মারকাধার, ব্রোঞ্জ নির্মিত অনেক বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি, অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, অলংকৃত ইট, প্রস্তর ভাস্কর্য, তামার পাত্র, ছোট আকারের স্তূপ প্রতিকৃতি, দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য। তাম্র-শাসনগুলি থেকে দেব ও চন্দ্ররাজাদের রাজত্বের কথা জানা যায়। চারপত্র মুড়ায় তাম্রশাসন আবিস্কারের ফলে চন্দ্ররাজ বংশানুক্রম, তাদের বিভিন্ন সামরিক অভিযান ও তাঁদের সময়ে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা জানতে পারি। শালবন বিহারে একটি কক্ষে প্রাপ্ত তিনটি মাটির সঞ্চয় পাত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। প্রথম সঞ্চয়পাত্রে স্বর্ণের তিনটি মুদ্রা ও ছয়টি কানের দুল পাওয়া গেছে। দুইটি ব্রোঞ্জ নির্মিত স্মারকাধারের মধ্যে ছোটটি শালবন বিহারে পাওয়া যায় এবং ইহার কিনারা খাঁজকাটা কাঁধের নীচের গোল রিং সম্ভবতঃ বহন করার সুবিধার জন্য লাগানো হয়েছিল। বড় স্মারকাধারটি ঢাকনি আঁটা এবং ভাঙ্গা অবস্থায় চারপত্রমুড়া হতে আবিস্কৃত হয়েছে।

শালবন বিহারের কক্ষগুলি খনন করে ১৫০টির বেশী ব্রোঞ্জের মূর্তি পাওয়া গেছে। এখানকার বুদ্ধমূর্তিগুলিতে সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতি ও অপূর্ব গঠন বৈচিত্রের পরিচয় রয়েছে। বোধি-সত্ত্ব, পদ্মপাণি মূর্তিগুলিকে দেখে অত্যন্ত উচ্চমানের শিল্প মনে হয়। তারা এবং মঞ্জুশ্রী মূর্তিগুলি কমনীয় ভঙ্গীতে পদ্মের উপর উপবিষ্ট। এগুলি শিল্পের আর একটি সুন্দর নিদর্শন। বৌদ্ধজ্ঞান ও বিদ্যাদেবী প্রজ্ঞাপারমিতার কয়েকটি মূর্তি শালবন বিহারের খনন কালে পাওয়া গেছে। এখান থেকে একটি বজ্রপাণি, দুইটি পদ্মপাণি মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। কোটিলামুড়ার কেন্দ্রীয় স্তূপের কক্ষগুলি থেকে পাওয়া গেছে অসংখ্য মাটির নিবেদন স্তূপ। এছাড়া ময়নামতীতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় মন্ত্র ও অন্যান্য লিপিযুক্ত বহু পোড়ামাটির সীল আবিস্কৃত হয়েছে। শালবনবিহারের মন্দিরের ভিত্তিভূমি অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক-চিত্রগুলি সমকালীন বাংলার শিল্পকলার উৎকর্ষতারই সাক্ষ্য।[১]

---

১ নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮–৬৬।

অতএব ময়নামতীতে প্রাপ্ত প্রাচীন নির্দশনাবলী পর্যালোচনা করলে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালের এক উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার তৎকালীন শিল্প সংস্কৃতির কেন্দ্র এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং এখান থেকে শক্তিশালী ও স্বাধীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেব ও চন্দ্র রাজাদের আমলের এক বিস্তারিত বিবরণ আমরা জানতে পারি। তবে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুর্নজাগরণের সময় এই বৌদ্ধ সভ্যতা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারায়।[১]

বেড়াচাঁপা/চন্দ্রকেতুগড় ঃ

চব্বিশ পরগণার উত্তরে প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড়। পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে মাত্র তেইশ মাইল উত্তরে চন্দ্রকেতুগড় অবস্থিত। আনুমানিক ৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতকের বাংলার 'গংগে' যার আধুনিক নাম বেড়াচাঁপা বা দেবালয় বা চন্দ্রকেতুগড়।[২] পেরিপ্লাস ও টলেমীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, 'গংগে' (Gange) নগরী ছিল গংগারিডই রাজ্যের প্রধান নগর ও সমৃদ্ধ বন্দর। এই গংগে নগরীর সন্ধান পাওয়া গেছে পশ্চিম বংগের ২৪ পরগনা জেলায়। কিছুকাল আগে দেগংগা বা দ্বিগংগার নিকটবর্তী চন্দ্রকেতুগড়ে খনন কার্য চালিয়ে দুই বর্গ-মাইল স্থান জুড়ে যে প্রাচীর বেষ্টিত প্রাচীন নগরী আবিস্কার করা হয়েছে তাকেই ঐতি-হাসিকগণ প্রাচীন গংগে নগরী বলে চিহ্নিত করেছেন।[৩] তবে এখনো কোন শীলমোহর, কোন শিলালেখ বা কোন তাম্রশাসন পাওয়া যায়নি, যা থেকে নিঃসংশয় হওয়া যায় এই বেড়াচাঁপাই সেই গংগে। কেবল মাটির গভীরে সংগুপ্ত বহু প্রমাণ হতে ভারত বর্ষের প্রাচীনতম স্থানগুলির মধ্যে বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড় অন্যতম এ ধারণা ঐতিহাসিকেরা করে থাকেন।

---

১ F.A. Khan , Op.Cit., P. 12-15.
নাজিমউদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৮।

২ উৎপল চক্রবর্তী, বিলুপ্ত রাজধানী, (কলিকাতাঃ অমর ভারতী, ১৯৭৮), পৃ. ৯।

৩ আ,কা,ম, যাকারিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

এছাড়া মৌর্য, শুংগ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল বা মুসলমান যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন ঐতিহাসিকদের গোচরীভূত হয়েছে। তাঁরা ভাংগা মন্দিরের ভিত, পোড়ামাটির মূর্তি, গড়, দীঘি আর মৃৎপাত্রের টুকরো দেখে প্রায় দুই হাজার বছর আগে এই বেড়াচাঁপাই ছিল প্রাচীন বাংলার সভ্যতার পীঠস্হান বলে মনে করেন।[১]

তারকানাথ ঘোষ এবং স্হানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতায় ১৯০৬ সালে পশ্চিম বংগের এই এলাকাটির প্রাচীন ধ্বংসস্তুপের অস্তিত্ব প্রথম সরকারের গোচরীভূত হয়। ১৯০৭ সালে বিখ্যাত বিদেশী পুরাতাত্ত্বিক লঙহার্স্ট এ জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক স্হানটি পরিদর্শন করেন এবং তাঁর রিপোর্টে লিখেন, তিনি সেখানে ১৫" লম্বা এবং ১১" প্রশস্ত ইষ্টক, ছাঁচ নির্মিত ইষ্টক এবং মৃৎপাত্রের নিদর্শন দেখতে পান যা অতি প্রাচীন কালের মনে হয়। এছাড়া ছয়কোনা বিশিষ্ট তাম্র আকরিক মুদ্রা আশে-পাশের এলাকায় পাওয়া যায় যা হতে স্হানটি বাংলার প্রাচীন জনপদ বলে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯২২-২৩ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে তাঁর এই বিবরণ প্রকাশিত হয়।[২]

তার কিছু পরে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় চন্দ্রকেতুগড়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর মতে, চন্দ্রকেতুগড়টি দূর হতে পুরাতন পুষ্করিণীর পাড় বলে মনে হয়, কিন্তু ইহা একটি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এমন কি লক্ষ্য করলে এর এক অংশে দুর্গের প্রধান বা সিংহদ্বারের চিহ্ন স্পষ্ট বোঝা যায়। সিংহদ্বারের ধ্বংসাবশেষের কাছ থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ছোট বড় ঢিবি দেখে সহজেই অনুমান করা চলে এর বিস্তার বহুদূর অবধি ছিল।[৩] দুর্গটির দুটি প্রসারিত অংশে প্রাচীরের অস্তিত্ব বোঝা যায় তন্মধ্যে একটির তিন চতুর্থাংশ দক্ষিণ দিকে বেড়াচাঁপা স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত,

---

১ উৎপল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২ A.S.I.A.R. 1922-23, Bainerd Spooner ed.,(Director General of India), p. 109.

৩ বিনয় ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১।

অন্যটি দক্ষিণ দিকের শেষাংশ হতে পূর্ব দিকে জলা ভূমিতে দুই ফারলং পর্যন্ত বিস্তৃত। অনুমান করা হয় উত্তর প্রাচীরটি দেউলিয়া গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পূর্বদিকে জলাভূমি থাকায় সম্ভবতঃ এদিকে কোন প্রাচীর ছিল না। দক্ষিণ প্রাচীরের উপরে ৩০ ফুট মত উঁচু দণ্ডাকৃতি গম্বুজটি মোহাম্মদ নাম খচিত ইষ্টক দ্বারা তৈরী যা ফকির গোরাচাঁদের স্মৃতি বহন করে।[১]

এই স্থানে ফকির গোরাচাঁদ এবং রাজা চন্দ্রকেতুকে কেন্দ্র করে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। বেড়াচাঁপা কথাটির উৎস হিসাবে তাই বলা হয়ে থাকে এখানে ফকির গোরাচাঁদ একটি বাঁশের বেড়ার উপর চম্পা ফুল ফুটিয়ে ছিলেন এবং এ থেকেই স্থানটির 'বেড়াচাঁপা' নামকরণ হয়।[২] আর এক সময় এ স্থানে অসংখ্য মন্দির থাকার জন্য এর নাম 'দেবালয়' হয়। যশোহর ও খুলনার ইতিহাস প্রণেতা সতিশ চন্দ্র মিত্রই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম চন্দ্রকেতু-গড়ের সুউচ্চ ঢিবি, পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'দেগংগা' নামটি বিশ্লেষণ করে এইটিই গ্রীক বিবরণীতে উল্লেখিত বিশাল 'গংগে' নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে ইংগিত করেছিলেন।[৩] প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রী পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় চন্দ্রকেতুগড় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে নানা পত্র পত্রিকায় লিখেছেন এবং ১৯০৯ সালে তত্ত্ব বিভাগের চিত্রকর নৃপেন্দ্রনাথ বসু এ জায়গা সম্বন্ধে রাখাল বাবুকে অবহিত করেন। রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় যখন চন্দ্রকেতুগড়ে আসেন তখন এখানকার খননকার্য শুরু হয়নি। তবু স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে বাংলার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের ধ্বংসাবশেষের তুলনায় চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ অতি প্রাচীন। বেড়া-চাঁপা স্টেশনের নিকটে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে একটি চাউল ছাটা কলের তিনটি অংশের অতি প্রাচীন নিদর্শন দেখেছিলেন প্রথমটি একটি চতুস্কোণ পাথরের চৌকি, বিহারে বা মধ্য প্রদেশে এ জাতীয় পাথরের চৌকির নাম 'গোরেয়া'। এই গোরেয়ার উপরে যে ছোট মূর্তিটি

---

১ A.S.I.A.R. 1922-23, ed. pp. 109-10.

২ Ibid.

৩ উৎপল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

আছে তা অত্যন্ত পুরাতন। এই জাতীয় মূর্তি বাংলাদেশের আর কোন স্থানে আবিস্কৃত হয়নি। ইহা মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তি। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় এই জাতীয় প্রাচীনতম মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। এছাড়া একটি কালো ক্লোরাইড পাথরের সুম্ভের ভগ্নাবশেষও তিনি দেখেছিলেন। এর পালিশ অনেকটা অশোকের সুম্ভগুলির পালিশের মতো। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বংগীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার যে তালিকা রচনা করেন তাতে চন্দ্রকেতু-গড়ের কয়েকটি পুরাবস্তুর বর্ণনা আছে।[১] ১৯৩০ সনে তিনি লিখেছেন এই চিত্রশালায় একটি রূপার পাত্রের টুকরো, একটি তামার পাত্রের টুকরো, মৃৎফলকে তিনটি ডোরাকাটা নল-খাগড়ার বাঁশি (reeds tied with three bands), রমণীর মল বা পাঁইজর পরিহিত পায়ের নিম্নাংশ (plaque bearing lower part of the legs of women, wearing a anklets) এবং একটি রাষ্ট্র সংরক্ষ শীলে (steatite seal) উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মী বর্ণমালায় (খ্রীঃপূর্ব দ্বিতীয়, তৃতীয় শতকের) (ma) বর্ণ উৎকীর্ণ ছিল।[২] শীলমোহরটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাচীন। শীলমোহরটি ছোট ও বহু মূল্য হরিদ্ বর্ণ প্রস্তরে নির্মিত।

দেখা যায়, ১৯৪৮ সালে আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রথম এবং ১৯৫০ সালে ও ১৯৫৬ সালে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর পর খননের ফলে চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহাসিকতার প্রমাণ সাক্ষ্যগুলি আমাদের সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রচুর রৌপ্য মুদ্রা, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের শীল, রোমান পাত্র, গ্রীক প্রভাবিত পোড়ামাটির মূর্তি, কিছু খেলনা পুতুল, পশু-পাখী যেমন হাতি, ভেড়া, ঘোড়ার মূর্তি, মাতৃমূর্তির সন্ধান এখানে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে মিথুন ভাস্কর্য, বুদ্ধমূর্তির ফলক, অঙ্কিত মুদ্রা দেখা যায়।[৩] এছাড়া

---

১ Rakhal Das Benerji, <u>Descriptive List of Sculpture and Coins in the Museum of the Bangalya Sohitya Parishad</u>, Calcutta, 1911, P. 16.
বিনয় ঘোষ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১০৮, উৎপল চক্রবর্তী, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১২-১৩।

২ Rakhal Das Banerji, <u>Ibid</u>.

৩ উৎপল চক্রবর্তী, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১১ ও ১৩, শ্রী দিলীপ কুমার মৈত্রে সম্পাঃ, <u>চন্দ্রকেতুগড়ের কথা</u>, (দেবালয়, চব্বিশ পরগণা, ১৯৭২), বিনয় ঘোষ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১৩০।

গুপ্তযুগের তিনটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে নিকটবর্তী হাতিপুর গ্রামের পুকুর থেকে। এই মুদ্রাগুলির একটি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার দেবীর বিবাহের দৃশ্য সম্বলিত, আর একটি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নামাঙ্কিত মুদ্রা। হাওড়ার শ্রী চৈতন্য মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীগৌরী শংকর দে গ্রামবাসীর কাছ থেকে আর একটি স্বর্ণ মুদ্রা সংগ্রহ করেছিলেন, যার এক পিঠে ধনুর্ধর মূর্তি, অপর পিঠে লক্ষ্মীমূর্তি এবং সমুদ্র কথাটি লেখা আছে। দুর্লভ এই মুদ্রাগুলি একমাত্র বেড়াচাঁপাতেই পাওয়া গেছে। এগুলি স্থানটির প্রাচীনত্বের বিশেষ সাক্ষ্য প্রমাণ বলা যায়।[১]

১৯৫৭–৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এখানকার খনা-মিহির নামক ঢিবিটির খনন কার্য পরিচালনা করা হয়। এখানে একটি বিশাল ৬০ বর্গফুট আয়তাকারের উত্তরমুখী মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দিরটির তিনটি দেওয়াল এবং চতুর্থটির একটি অংশের বৃহদায়তন কাঠামো শেষের বছরের দিকে আবিস্কৃত হয়েছে। এই বৃহৎ মন্দিরটি গুপ্তযুগের সাক্ষ্য বহন করে। মন্দিরের উত্তরাংশ, দক্ষিণাংশ এবং পশ্চিমাংশের প্রত্যেকটির মাঝখানে বহিঃ প্রজেকশন বা বহিঃ অভিক্ষেপন যুক্ত এবং মন্দির সংলগ্ন একটি মণ্ডপও উত্তরদিকে ৪০ বর্গফুট বর্গাকারে অবস্থিত। এর ভিত্তি ভূমি আশেপাশের মাটির উপর থেকে ১০ ফুটের নীচে ছিল যা ইষ্টক নির্মিত পাকা মেঝে দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এছাড়া ঐ মন্দির সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[২]

খনা-মিহিরের ঢিবির কাছ থেকে প্রাক গুপ্ত যুগের কিছু সংখ্যক মূর্তি পাওয়া গেছে। যেমন, লাল বেলে পাথরের বোধিসত্ত্বের মাথা এবং দেহের অর্ধাংশ মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যা হতে কুষাণ আমলের পরিচয় পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম হতে

---

১ গৌরী শংকর দে, কয়েন্স ফ্রম চন্দ্রকেতুগড়,
উৎপল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩–১৪।

২ Indian Archaeology 1958-59, A Review, ed by A. Gosh, (New Delhi: Dept of Archaeology Govt. of India, 1959), P. 55.

তৃতীয় শতকের মধ্যে এই মূর্তিগুলি নির্মিত। লাল বেলে পাথরের নির্মিত এই বোধিসত্ত্বের মূর্তি মথুরা ছাড়া বাংলার আর কোথাও পাওয়া যায়নি। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে স্থানীয় শিল্পী দ্বারা ইহা তৈরী কিন্তু এর কোন যথোপযুক্ত প্রমাণ নাই। কারণ কুষাণ আমলের শৈল্পিক ধারার স্পর্শ এ মূর্তিতে বর্তমান এবং এই শৈল্পিক ধারা পূর্ব ভারতে অজানা ছিল না।[১]

চন্দ্রকেতুগড়ে খনন ও অনুসন্ধানের ফলে আর একটি আশ্চর্য আবিস্কার এর প্রাচীনত্বকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করেছে। দেখা যায়, একস্থানে তিনটি যুগের সভ্যতার স্তরগুলি মাটির নীচে চাপা পড়ে ছিল। খননের ফলে প্রথম স্তরে কাঠ, বাঁশের তৈরী এবং টালির ছাদ বিশিষ্ট মন্দির নিদর্শন পাওয়া গেছে। টালিগুলি সম্ভবতঃ অগভীর ধূসর রঙের পাতলা ধার সম্পূর্ণ থালা বিশেষ। এছাড়া কুষাণ শৈলীর কিছু মাটির ফলক বৈশিষ্টপূর্ণ এবং কিছু তাম্র আকরিক মুদ্রা এ স্থানে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় স্তরে বিভিন্ন ধরণের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির থালা বাসন, ধূসর রং বিশিষ্ট পান পাত্র, পালিশকৃত কালো সরু গলা বিশিষ্ট পাত্র এবং কোন কোনটি কিনার বিশিষ্ট, ত্রিকোণ নকশা সমৃদ্ধ লাল বর্ণের থালা, হাতল, চাকতী-ওয়ালা ধূসর অথবা কালো রংয়ের পালিশকৃত বাটি পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য দ্রব্যাদির মধ্যে মৃৎফলকের ছাঁচের টুকরো সম্ভবতঃ এগুলি স্বর্ণকারেরা ব্যবহার করত, বৃহৎ গজদন্তের টুকরো, একটি অনুমিত হয় মণি রত্নাদি রাখার বাক্স এতদ্ব্যতীত একটি পোড়ামাটির ফলকে একত্রবাঁধা শস্যগুচ্ছ ছিল। এছাড়া গুপ্ত যুগের পৌরাণিক কাহিনীর দৃশ্য সম্বলিত মৃৎফলক পাওয়া গেছে। কোন কোনটিতে এ কাহিনী সূঁচালো বস্তু দ্বারা খোদাই করে অক্ষরগুলি লেখা হয়েছে। এ স্থানের তৃতীয় স্তর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই স্তরে কয়েক ধরণের মৃৎপাত্রের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।[২]

---

১ R.C. Majumder, H.A.B., P. 624.

২ Indian Archaeology 1958-59, A Review, ed by A Gosh, P.55-56.
উৎপল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

এই বেড়াচাঁপা থেকে দশ মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে মৌর্যগুপ্তের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে আর আট মাইল দক্ষিণে খাস-বালান্দা গ্রামে গুপ্তযুগের একটি মন্দির আবিস্কৃত হয়েছে। যা পরবর্তী মুসলমান যুগে মসজিদের রূপান্তরিত হয়েছিল। আর কিছু দুরবর্তী তাংগড় গ্রামে পাওয়া বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী মুর্তিই এই মন্দিরের প্রধান মুর্তি ছিল। এছাড়া এখানকার প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলক মুর্তিতে মৌর্য, শুংগ, কুষাণ, গুপ্তযুগের সাথে পাল যুগেরও নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। বলা যায় পাল সম্রাটগণও উপেক্ষা করতে পারেননি এই বিশাল নগরীকে। কিন্তু সেন যুগের কোন চিহ্ন নাই বেড়াচাঁপাতে। তবে পরবর্তী মুসলমান যুগের মসজিদ আর অলংকৃত মৃৎফলক পাওয়া গেছে। পণ্ডিতদের অনুমান ঐ খাস বালান্দাই পীর গোরাচাঁদের সমাধি অবস্থিত।[১]

উপরে উল্লেখিত আলোচনায় আমরা বলতে পারি বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির মধ্যে চন্দ্রকেতুগড় একটি অতি প্রাচীন পুরাকীর্তি স্থান, যেখানে প্রাপ্ত নিদর্শনাদিগুলি হতে খ্রীস্টীয় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শতকের বাংলার নাগরিক জীবনের ইংগিত পাওয়া যায়। সে সময়-কার মৃৎপাত্রে নকশা, মৃৎফলক, ভাস্কর্য মুর্তি এবং স্থাপত্য নির্মাণ কৌশল শৈল্পিক এবং উন্নত জীবনের পরিচয় দেয়। পরিশেষে সে যুগের স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা এবং অলংকারের মৃৎ-ফলকের ছাঁচ হতে সে যুগের রমণীদের বেশ ও ভূষণের প্রতি যে অধিক গুরুত্ব ছিল তা পুরো-পুরি ধারণা করতে পারি। পরবর্তী অধ্যায়ে চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্যের বিশ্লেষণে এখানকার রমণীদের বেশ ভূষার চিত্র এবং তৎকালীন সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট হবে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি ঃ

১৯৬০ সালের দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ রিপোর্ট থেকে জানা যায় খ্রীস্ট পূর্বাব্দের প্রথম এক হাজার বৎসরের মধ্যে প্রাচীন বাংলায় একটি উন্নত সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পশ্চিম বংগের বোলপুরের দক্ষিণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কেলকাতার

---

১ উৎপল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫।

দিক হতে) রেলওয়ে স্টেশন হতে ছয় মাইল দূরে অজয় নদীর উপত্যাকায় অবস্থিত পাণ্ডু-রাজার ঢিবি নামে প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে বিদ্যমান।[১] পশ্চিম বাংলার সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ১৯৬২-৬৫ সালের শেষ পর্যন্ত শ্রী পরেশচন্দ্র দাস গুপ্তের অধীনে, শ্রী ডি, কে, চক্র-বর্তী এবং এস, সি, মুখার্জির সহযোগিতায় এ স্থানের ভূগর্ভ খননের ফলে বাংলার অতি প্রাচীন তাম্র প্রস্তর যুগীয় সভ্যতা আবিস্কৃত হয়েছে।[২] প্রত্নতত্ত্ববিধগণ এ বছরগুলিতে অজয় নদের দক্ষিণে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে খুব ব্যাপকভাবে মাটি খনন করে যে সমুদয় বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও নানাবিধ দ্রব্যাদির আবিস্কার করেছেন। এই সমস্ত প্রত্ন বস্তু পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেন যে খৃষ্টি জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের উপত্যাকায় এবং মধ্য ভারতে ও রাজস্থানের অনেক জায়গায় যেমন তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল বাংলাদেশের এই অঞ্চলে সেইরূপ সভ্যতা সম্পন্ন মানব গোষ্ঠী বাস করত।[৩] পাণ্ডু রাজার ঢিবির ধ্বংসাবশেষ থেকে এ ধারণা পাওয়া যায় যে এ যুগের মানুষের উন্নত পাকা রাস্তা ও দালান কোঠা সমৃদ্ধ নগর পরিকল্পনার শক্তি ও সামর্থ ছিল। সুরক্ষিত দুর্গ প্রকার, কাঁচা ইট ও চুন প্রলেপযুক্ত দেওয়াল বিশিষ্ট ঘরবাড়ী, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, কৃষি কাজে দক্ষতা, তাম্রের ব্যবহার ইত্যাদি হতে তাদের উন্নত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।[৪] খনন কার্যের সময়, এখানে প্রধান ঢিবির পূর্বাংশে ৮টি কাল ল্যাটেরাইট পাথর খন্ডে নির্মিত একটি বড় চত্বর প্রত্যেকটির সাইজ ৬x৪ মিঃ যা পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং একটি ছোট গর্তের পার্শ্বে প্রধান ঢিবিটির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রধানতঃ এই কয়েক বছরের শেষের দিক পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চারটি যুগের সভ্যতার সমৃদ্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায়।

---

১ R.C. Majumder, H.A.B., P. 22.

২ Indian Archaeology, 1963-64, A Review, ed by A. Ghose, P. 61.

৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

৪ R.C. Majumder, Op.Cit., P. 23.

প্রথম স্তরের মৃৎশিল্পের নিদর্শনাদিগুলির মধ্যে ঘূর্ণিয়মান চাকার সাহায্যে তৈরী শস্য সংরক্ষণের জন্য ধূসর রঙের বেলে মাটির তৈরী পাত্র। সূক্ষ্ম প্রযুক্তি ও দক্ষ হাতের পরিচায়ক, এগুলি অনলংকৃত। হালকা লাল রংয়ের পাত্রও পাওয়া গেছে। এ স্তরে শহর সমৃদ্ধির কোন চিহ্ন নাই। দ্বিতীয় স্তরের সাক্ষ্য প্রমাণাদি হতে এখানে তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতির ব্যাপক সমৃদ্ধি সম্পর্কে জানা যায়। এ স্তরের পণ্য দ্রব্যগুলির বৈশিষ্ট হচ্ছে, রঙিন লাল অথবা কালো রংয়ের উজ্জ্বল পাত্রগুলিতে কালো রঞ্জক পদার্থ দ্বারা এবং চকলেট রংয়ের পাত্রগুলিতে বাদামী সাদা রংয়ের নকশা অংকন করা। এছাড়া কড়ি, তাম্র নির্মিত গহনাপত্র পুঁতির মালা এই স্তর হতে আবিস্কৃত হয়েছে। লাল কালো পাত্র গুলিতে (raws of chevrous), ডট, হাইফেন ইত্যাদি অংকিত থাকত। উজ্জ্বল লাল পাত্রগুলি আড়াআড়ি এবং সমান্তরাল ডোরাকাটা দাগ, তিনকোনা নকশায় পূর্ণ। তৃতীয় স্তরে লৌহ নির্মিত বস্তুর সাক্ষ্য মেলে। পূর্ববর্তী স্তরের মত এখানে রঙিন নকশাবহুল পণ্যদ্রব্য, তাম্র গহনা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এছাড়া কাদা-মাটির সীল যাতে কুঠার মোটিফ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া দুইটি মৃৎফলক যাতে মানুষের দেহের চিত্রে দেখা যায় অতিরঞ্জিত চিবুক। অন্যদিকে ছুঁচালো হেলমেট পরিহিত মানুষের মাথা। এই ঢিবির চতুর্থ স্তরটিতে একটি বাতিক্রম আছে এখানে ঐতিহাসিক বিষয়ের তথ্য মেলে। এখানকার প্রাপ্ত মৃৎশিল্পগুলি ছিল কারুকার্য করা। পণ্য - দ্রব্যগুলি মোটা পুরু করে তৈরী ছিল। এছাড়া হাতল, ঢাকনা এবং নলওয়ালা চাটু, মোচা-কৃতি বাটি, ছোট পালিশকৃত পাথরের সেল্ট (stone celt), হাড়ের তৈরী যন্ত্রপাতি, পুতির মালা প্রাপ্ত নিদর্শনাদি উল্লেখযোগ্য।[১]

ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন স্তরের তাম্র ও লৌহের অলংকার, যন্ত্রপাতি, মৃৎপাত্র ছাড়া তাদের ইটের ও পাথরের ভিত্তির উপর প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ, গৃহগুলি ত্রিকোণাকৃতি, চতুস্কোন গোলাকৃতি, কাঠের খুঁটির উপর টালির অথবা মৃৎফলকের টুকরোর ব্যবহার, মাটির সাথে গোবর মিশিয়ে প্রলেপ দিয়ে মজবুত করা, মেঝে দুরমুজ দ্বারা সমান করার কৌশল সম্পর্কে জানা যায়।[২]

---

১ Indian Archaeology, 1963-64, P. 61-62.

২ R.C. Majumder, H.A.B., P. 23.

পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে স্টেটাইট পাথরের নির্মিত একটি গোলাকার শীল পাওয়া গেছে। এর উপর কতকগুলি চিহ্ন খোদিত আছে। এগুলি চিত্রাক্ষর এবং শীলটি ভূমধ্য সাগরস্থ ক্রীট দ্বীপে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। এতে অনুমান করা যেতে পারে যে উক্ত সময় প্রাচীন সভ্যতার আবাসস্থল ক্রীট দ্বীপের সাথে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের উপর এই চিহ্ন হতে এগুলি বাংলাদেশের প্রাচীন যুগের অক্ষর বলে মনে করা যেতে পারে।পোড়ামাটির তৈরী নরনারী মূর্তি এবং অন্য দ্রব্য পাওয়া গেছে। এগুলি সে যুগের শিল্পকলার নিদর্শন।[১]

শীলমোহর ছাড়া এখানে আবিস্কৃত মাটির লেবেলের সংগে বাঁধা থাকত মৃৎফলকের উপর লিখিত পণ্য ও বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্কিত হিসাব। এ থেকে আমরা বলতে পারি বাঙ্গালীরা ক্রীটদেশের লোকের সংগে বাণিজ্যিক লেন দেন করত। একথা মিশরবাসী এক নাবিক প্রণীত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।[২] এ স্থানের অধিবাসীদের ব্যবসা বাণিজ্য সভ্যতার সাথে ক্রীট দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠে শুধু তা নয়, এ সমস্ত মেলামেশার মধ্যে দিয়ে তাদের সংস্কৃতির সাথে ক্রীট দেশের সংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য ঘটে। যেমন, উভয় দেশেরই মাতৃদেবীর সংগে সিংহের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ক্রীট দেশে প্রচলিত লিপি ও প্রাচীন বাংলার পাঞ্চমার্কযুক্ত মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপি পাশাপাশি রেখে এই দুই লিপির মধ্যে সাদৃশ্যের কথাও অনেকে স্বীকার করেছেন। আবার দেখা যায়, ক্রীট দেশের মেয়েরা দেহের উপর অংশ অনাবৃত রাখত। বাৎস্যায়ন তাঁর 'কামসূত্রে' লেখেন, বাংলার রমণীদের কখনো কখনো দেহের উপরাংশ অনাবৃত রাখত।[৩] এ থেকে ক্রীটবাসীদের সাথে বাঙ্গালীদের সম্পর্কের কথা স্পষ্ট হয়।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে পণ্ডিত প্রবর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ সিদ্ধান্ত করেন যে আর্য উপনিবেশের পূর্বে ভারতবর্ষের সভ্যতা বর্তমান কালে প্রচলিত হিন্দু

---

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২।

২ অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩ তদেব, পৃ. ২৬। পৃ. ২৬।

ধর্মের কয়েকটি বিশেষ অঙ্গ, যেমন কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজাপ্রণালী, শিবশক্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীর আরাধনা এবং পুরাণ বর্ণিত অনেক কথা ও কাহিনী, লৌকিক ব্রত, আচার অনুষ্ঠান, বিবাহ ক্রিয়ায় হলুদ-সিঁদুর প্রভৃতির ব্যবহার, ধুতি-শাড়ীর পরিচ্ছেদের ব্যবহার ইত্যাদির অনুরূপই ছিল বলে মনে হয়।[১] সুতরাং বাংলার আদিবাসীগণ এত প্রাচীনকালেও একটি উচ্চাংগ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল তা এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত নিদর্শনাদি সাক্ষ্য দেয়। পরিশেষে বলতে হয়, পাণ্ডুরাজার ঢিবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডব বহুদিন ধরে বাংলার বীরভূম জেলার এক চক্রনগরে বাস করেছিলেন সেই কাহিনী। তাই অজয় নদীর তীরে যেখানে পাণ্ডুরাজার ঢিবি অবস্থিত তার নিকটে ও অদূরে পাণ্ডবদের স্মৃতির সংগে বিজড়িত এই স্থান।[২]

প্রাচীন বাংলার প্রত্নস্থানগুলি আলোচনা সাপেক্ষে উল্লেখ করতে হয়, মহাস্থানের ভাসুবিহারটি ছিল কেন্দ্রীয় মন্দিরবিহীন। তার একটু দূরেই ছিল অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। মহাস্থানের চার মাইল পশ্চিমে ভাসুবিহার গ্রামে একটি আয়তাকার টিলার উপর অবস্থিত মৃত্তিকাস্তূপ খননের ফলে উল্লেখিত বিহার দুটি এবং একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিস্কৃত হয়। এই প্রত্নস্থানটি উন্নত স্তূপ ও বৌদ্ধ দেবদেবী শোভিত মন্দিরে এবং বিদ্যায়তন বা মহাযানী ভিক্ষুতে সমৃদ্ধ ছিল। প্রাপ্ত প্রত্ন সামগ্রীগুলি দশম-একাদশ শতকের তৈরী বলে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন।[৩]

অপরপক্ষে কেন্দ্রীয় মন্দির সমন্বিত বিহারগুলি হচ্ছে প্রত্নস্থান ময়নামতীর শালবন বিহারসহ লালমাই পাহাড়ের অন্যান্য কয়েকটি বিহার এবং পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার।

---

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

২ অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৩ Nazimuddin Ahmed, B.A., Vol. I, PP. 40-44.

প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ মন্দিরের পরিণতরূপ নিহিত আছে উল্লেখিত বিহারগুলির মধ্যে। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের শালবন এবং সোমপুর বিহার নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে শালবন বিহারটি সোমপুর বিহারের কিছু কাল আগে নির্মিত হয়েছিলো বলে মনে হয়। এই দুটি বিহারেই ভিক্ষুশ্রমণদের আবাসিক কক্ষগুলি একটি বিশাল প্রাঙ্গণের চারদিকে বিন্যস্ত ছিল। সুতরাং মহাস্থান পাহাড়পুর ও ময়নামতীর বিস্তীর্ণ এলাকায় বৌদ্ধ সংস্কৃতিরই বিকাশ ঘটেছিল সন্দেহ নাই।[১]

বাংলার বৌদ্ধ মন্দির সমূহের ভিত্তি গাত্রে লোক শিল্প ও প্রস্তর ভাস্কর্যের নমুনাগুলি দেখে মনে হয়, এখনো যে সকল বিহার মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ মাটির টিলার নীচে চাপা পড়ে আছে তাদের দেয়াল ও ভিত্তি গাত্র পোড়ামাটির ফলকে যথারীতি অলংকৃত হয়েছিল। বৌদ্ধ মন্দিরসমূহে লোক শিল্পের নিদর্শন স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত অলংকরণের মাধ্যমে মন্দির গাত্র সজ্জিত করে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করা। প্রস্তর মূর্তি স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীদের মনোরঞ্জন করা। পাল ও সেন পর্বে মৃৎ-শিল্পের তুলনায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ে প্রস্তর ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল বেশী। সমাজের উচ্চ স্তরের লোকজনের আশ্রিত এই হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্যে তাই নিম্নস্তরের সমাজ জীবনের প্রতিফলন নাই।[২]

এছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ে আবিস্কৃত একটি মন্দিরে বিভিন্ন নির্মাণ যুগের প্রত্নিদর্শন পাওয়া গেছে। গর্ভগৃহ ও সংলগ্ন হলঘর নিয়ে এ মন্দিরের প্রধান অংশ গঠিত। সম্মুখভাগে একটি প্রবেশ তোরণের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সমগ্র মন্দির ভিত্তি সুষম ছাঁচের কয়েকটি স্তরে চিহ্নিত, দেয়ালগাত্র ইটের লম্বা প্যানেলে বিভক্ত। প্রত্যেকটি প্যানেলে কুলুঙ্গি আছে তবে শূন্য কুলুঙ্গি গুলিতে পোড়ামাটির ফলক সন্নিবেশিত ছিল। এখানে পোড়ামাটির ফলক শিল্পের

---

১ F.A. Khan, Mainamati, (Karachi, 1963), P. 7-10, & K.N. Dikshit, Excavations at Paharpur (ASM, No. 55), Delhi: 1938.

২ আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-২০০।

বেশীর ভাগই পূর্ব শক্-কুষাণ আমলের। আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে বলা যায়। চন্দ্রকেতুগড়ে ভগ্ন ও জীর্ণ একটি জৈন মূর্তি ও একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে।[১] পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে খ্রীস্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বের বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের মানুষের উন্নত সভ্যতার নিদর্শন উদঘাটিত হয়েছে। আবিস্কৃত নিদর্শন-সমূহ হতে অনুমান করা হয়ে থাকে এখানকার আদি অধিবাসীরা চাষাবাদ করেছে। পশু শিকার ও পালন করেছে, চিত্রশোভিত মৃৎপাত্র তৈরী করেছে, প্রস্তর ও তাম্র, লৌহের ব্যবহার করেছে। সর্বোপরি ইটের এইসব পাথরের ভিত্তির উপর প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ এবং বস-বাসের নমুনাও পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক এবং মূর্তি বাংলাদেশের সভ্যতার প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে।[২]

---

১ S.K. Sarasuati, Architecture of Bengal, (Calcutta: 1976), P. 92–93.

২ আবদুল মমিন চৌধুরী ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিপিসাক্ষ্যের বিশ্লেষণে প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ

প্রত্নসাক্ষ্যের বিশ্লেষণের পূর্বে এগুলির বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আদিপর্ব থেকে প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামলের যেমন মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু গুপ্ত উত্তর কাল হতে শিল্পকলার প্রভুত উন্নতি সাধিত হয়। গুপ্তপূর্ব অধ্যায়ে এদেশে উপাদানের অভাবহেতুই সম্ভবতঃ মৃৎফলকের তুলনায় প্রস্তর ভাস্কর্য শিল্প নগন্য সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এদেশের কাদা মাটি ভাস্কর্য তৈরীর জন্য উপযুক্ত ছিলনা। তথাপিও খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে কুষাণ শিল্পের মথুরা ধাঁচে গুপ্ত ভাস্কর্যের সুচনা ও বিকাশ হয়েছিল এবং বাংলায় তার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল বলে জানা যায়।

পাথরের তৈরী অথবা পাথরে খোদাই মূর্তি যাই-ই নির্মিত হয়েছিল, তার নমুনা আমরা পেয়ে থাকি উৎখনন ও অনুসন্ধানের ফলে। দেখা যায় মূর্তিগুলি বিশেষভাবে মন্দির সজ্জা এবং প্রতিমা রূপে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল। সেজন্য প্রস্তর ভাস্কর্য নিদর্শন-গুলি যা পাওয়া যায় তা সবই জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি। তাই প্রস্তর ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিচয় ধরা পড়ে কম। পোড়ামাটির শিল্প এই সময় ব্যবহৃত হয়েছে ঘরের কুলঙ্গি, মঞ্চ, দেয়াল প্রভৃতি অলঙ্করনের জন্য এবং প্রয়োজন-বোধে বড় বড় মন্দির, বিহার প্রভৃতির বহিরঙ্গ সজ্জিত করার জন্য। প্রাচীন স্থাপত্যের অলঙ্করণ হিসেবে এই ধরনের পোড়ামাটির শিল্প ফলক এবং ভাস্কর্য বাংলার নানাস্থান হতে বেশ কিছু পাওয়া যায়। অধিক সংখ্যায় পাওয়া গেছে পাহাড়পুর ও ময়নামতীর ধ্বংসা-বশেষ হতে। পোড়ামাটির ফলক শিল্পগুলিতে সাধারণতঃ দেবদেবীর মূর্তি কম। চলমান

---

১ Nazimuddin Ahmed, Discover the Momuments of Bangladesh, (Dhaka, 19840) pp. 80-82.

জীবনের প্রাণপ্রবাহ এগুলিতে বর্তমান। প্রতিমা লক্ষণ শাস্ত্র দ্বারা পোড়ামাটির শিল্পকর্মগুলি নিয়ন্ত্রিত ছিলনা বলে এইগুলিতে লোকায়ত জীবনের বহু দুর্লভ তথ্য পাওয়া যায়, যা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবে অমূল্য। তবে সমসাময়িক পাথরের খোদাই শিল্পের প্রভাব ফলক-গুলিতে লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার কিছু প্রাচীন চিত্র নিদর্শনের সাক্ষাৎ আমরা পেয়ে থাকি চিত্রিত পান্ডুলিপি হতে। এগুলিতে অঙ্কিত দেবদেবীর চিত্রে সমাজের উচ্চকোটি স্তরের মানুষের বেশ ও ভূষণ প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। পুঁথিসজ্জা ও পুঁথি বর্ণনার জন্য দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কন করে পুঁথিচিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে।[১]

আরো উল্লেখ করতে হয় যে, সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করবার অনেক আগেই পোড়ামাটির ফলক শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্র প্রভৃতি শিল্পে মানুষের জীবনের বিশিষ্ট বিষয়গুলি প্রকটিত হয়েছিল। যেমন, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে বাঙালা ভাষায় রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়, তা বহু পূর্বে অষ্টম শতাব্দীতেই মন্দিরের অলঙ্করণে পাওয়া গেছে। আবার দেখা যায় এমন অনেক কাহিনী মন্দির চিত্রের মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেছে যা কখনো সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়নি।[২]

প্রাচীন বাংলার মৌর্য, গুপ্ত, কুষাণ আমলের সভ্যতার চেয়েও প্রাচীনতর সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর নিকটবর্তী পান্ডুরাজার ঢিবিতে উৎখননের বিভিন্ন স্তর থেকে। এই স্থানে তাম্রপ্রস্তর যুগের প্রত্ন দ্রব্যাদি পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তামা, ব্রোঞ্জ বা মিশ্র ধাতুর যন্ত্র ও দ্রব্যাদি হতে এ যুগের মানব সমাজের বৈশিষ্টতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নানা আকৃতির ও বর্ণের মাটির বাসনের টুকরো, তামার

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৫-৬৩৬।

২ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

তৈরী রমণীদের অলঙ্কার, পোড়ামাটির মূর্তি, ইত্যাদি প্রত্নোপকরণ এ সময়ের সভ্যতার পরিচয় দান করে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্য একটি এলাকা চব্বিশ পরগণার বাসারত দুর্গ এলাকার চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থানে আবিস্কৃত প্রত্ন নিদর্শনগুলিতেও তাম্র প্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র নজরে পড়ে। খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টপর কয়েক শতাব্দীর মানুষের শিল্পকর্মের পরিচয় বহন করে এই প্রত্নসাক্ষ্যগুলি। এখানে প্রাপ্ত অলংকৃত মৃৎপাত্র এবং কতকগুলি পোড়ামাটির মূর্তির পরিধেয় সুবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১]

পান্ডুরাজার ঢিবির প্রত্নদ্রব্যের মধ্যে স্টেটাইট পাথরের সীলমোহরে উৎকীর্ণ চিত্রাবলী ও একটি মাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতীক চিহ্নে এবং চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত কয়েকটি সীলমোহর ও মৃৎপাত্রের মধ্যে প্রাচীন ক্রীট ও মিশরীয় সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাতে মনে হয় এ সমস্ত অঞ্চলের ন্যায় বাংলার আদি সংস্কৃতি বাণিজ্য নির্ভর ছিল। আর বৈদেশিক বাণিজ্যের সূত্রে এদেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের।[২]

মহাস্থানের ভাসুবিহারের সংলগ্ন মন্দিরের ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে মানুষ, অর্ধদেবতা, অর্ধমানব ও অর্ধ-পুষ্পের সম্মিলিত রূপ, পশুপক্ষী, ফুলের বিন্যস্ত রূপ। মনুষ্য রূপের প্রতিফলন আছে কতকগুলি ফলকে। রাজা-রাণীর দৃশ্যে উৎকীর্ণ মানব মূর্তিগুলির দামী পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও অস্ত্রশস্ত্র তাদের রাজকীয় মর্যাদা সম্বন্ধে ইংগিত দিচ্ছে। সাধারণ বৈশিষ্ট, শৈলী ও কারুকার্যের দিক দিয়ে এই পোড়ামাটি ফলকগুলি ময়নামতী ও পাহাড়পুরের ফলকগুলির তুলনায় অনেক পরিশীলিত এবং উচ্চ মানের।

এখানকার প্রথম শ্রেণীর ক্ষয়প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে বিশেষ করে রাজা-রাণীর যুগল চিত্রে মানবদেহ দীর্ঘ ও ক্ষীণ, নরনারীর বক্ষস্থল প্রশস্ত বা উন্নত এবং অংগপ্রত্যঙ্গ কমনীয়।

---

১ বাদলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "প্রত্নতত্ত্বের আলোকে আদি ঐতিহাসিক পর্বের বঙ্গীয় সভ্যতা", ইতিহাস, ১১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (ঢাকাঃ ১৩৮৪ বাং), পৃ. ৩০-৩২।

২ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস,আদিপর্ব, দ্বিতীয় খন্ড, (কলিকাতাঃ ১৯৮০), পৃ ১১৮-১২৫।

অলঙ্কার ও পোষাক পরিচ্ছদের রূপায়নে দেখা যাচ্ছে আংগিক ও রীতিগত পরিপূর্ণতা। দ্বিতীয় শ্রেণীর নতুন ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতির অবয়বে আছে শিল্পরীতির গতিশীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্পষ্ট রেখার মাধ্যমে রূপায়িত বলিষ্ট প্রকাশভংগী। বলা যায় ময়নামতী ও পাহাড়পুরের ফলকের তুলনায় অধিকতর আংগিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা মহাস্থানগড়ের ফলকগুলিতে প্রতীয়মান এবং এগুলিতে গুপ্ত ঐতিহ্যের ধ্রুপদী সৌষ্ঠব ও বলিষ্ঠতা ধরা পড়েছে। মহাস্থানগড় পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তি সমূহের বৈশিষ্টাবলীর সাথে পাল আমলের প্রস্তর ভাস্কর্যের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তবে পোড়ামাটির শিল্পগুলিতে ময়নামতী ও পাহাড়পুরের পোড়ামাটি শিল্পের সরল প্রাণবন্ত অভিব্যক্তি এবং স্থূল ও বলিষ্ঠ লৌকিক শৈলী অনুপস্থিত।[১] আবার দেখা যায় বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ময়নামতী, পাহাড়পুর ও মহাস্থানের মৃৎফলকগুলির মধ্যেকার সাদৃশ্য উপেক্ষা করা যায়না। এই সাদৃশ্যের মূল কারণ উৎকীর্ণ মূর্তি চিত্রের জীবনধর্মী বৈশিষ্ট এবং ফলকগুলির মাধ্যমে প্রতিফলিত জীবন-বোধের সচেতনতা ও ব্যাপকতা।[২]

ময়নামতীর মৃৎফলকগুলিতে যে এলাকার শিল্পীগণের পরিবেশ সচেতনতা ও সক্রিয় মানসিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। ফলকসমূহে দেখা যায় যেমন বাস্তব জীবনের চিত্র, তেমন কাল্পনিক বস্তুর নিদর্শন। এ থেকে এখানে প্রাপ্ত প্রত্ন নিদর্শনে সেকালের সমাজজীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ ফলকগুলির শৈল্পিক সৌষ্ঠবে এক অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলকচিত্রগুলি শিল্পগুণের দিক দিয়ে পাহাড়পুরের মৃৎশিল্পের সাথে তুলনীয়। পাহাড়পুর মন্দির গাত্রে সংযোজিত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী, রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা, কৃষ্ণকাহিনী, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথার বিভিন্ন জনপ্রিয় উপাখ্যানিক উপাদান। এসব ধর্মীয় পৌরাণিক বিষয়বস্তু ছাড়া রয়েছে সেকালের মানুষের কল্পনা জগতের বহু উপাদান। আরো আছে বাংলার প্রান্তসীমায় বসবাসকারী

---

১ Nazimuddin Ahmed, <u>B.A.</u>, No.1, P. 57.

২ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫২৮-২৯।

উপজাতীয় লোকজনের বৈচিত্রময় জীবনের প্রতিফলন এবং জন্তুজগতের বিভিন্ন চিত্র। দৈনন্দিন জীবন থেকে নেয়া চিত্রের সমাবেশ ফলকগুলিতে দেখা যাচ্ছে।[১]

চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানে আবিস্কৃত মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ প্রভাব নির্দেশক অলঙ্করণযুক্ত পোড়ামাটির শিল্প, পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত পাথরে তৈরী নির্মিত সীল, মসৃণ কালো মৃৎপাত্রের টুকরো, পোড়ামাটির তৈরী নরনারী মূর্তি ও চিত্রাঙ্কিত মুদ্রা গাঙ্গেয়, উত্তরবঙ্গ, নিম্নগাঙ্গেঁর চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান-এর একটি পূর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠার কথা যথার্থ প্রমাণ করেছে।[২] তদ্রুপ পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ময়নামতীতে প্রাপ্ত পরবর্তী যুগের শিল্পকর্মের নিদর্শনগুলিও বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের পরিচায়ক।

উন্নত শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যগুলি সেই আদিকাল থেকে বাংলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে। প্রাচীন বাংলার মানুষের সৌন্দর্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ এই শিল্প-কলার মাঝেই হয়েছিলো বলা যায়। প্রাচীন রীতিনীতির প্রেক্ষাপটে জনগণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্যচর্চার বিকাশের একটি মাধ্যম এই প্রত্নশিল্পগুলি। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির তথ্য প্রদান করার জন্য এবং সেকালের নন্দনতাত্ত্বিক জ্ঞান ও চারুকলার চিন্তা চেতনাকে উপলব্ধি করার জন্য এগুলিকে প্রধান উৎস হিসেবে ধরতে হয়। সুতরাং মানুষের আচার, আচরণ, বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবন, পরিধেয়, অলঙ্কার, কেশ-বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য পোড়ামাটির ফলক, লিপিমালা, চিত্র, মূর্তি ইত্যাদি মাধ্যমগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে বাস্তব জীবনের ছবি অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট। কারণ মানুষের কার্যকলাপ ও চিন্তাচেতনার প্রভাব শতাব্দীর পর শতাব্দী শিল্পকলার উপর প্রতিফলিত হয়েছে, ফলে এগুলিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সমাজ ইতিহাস বা সমাজ চিত্র। ভাস্কর্য ও চিত্র-সমূহে সমাজেরই চিত্র রূপায়িত হয়েছে সুকুমার ভঙ্গীতে। সুতরাং বাংলার সংস্কৃতির পূর্ণ

---

১ Nazimuddin Ahmed, D.M.B., pp. 80-82.

২ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৯২৫-২৬।

চিত্র পেতে হলে সেকালের সুকুমার কলাশিল্প নিদর্শনের মধ্যে নিহিত তথ্যের অনুসন্ধান করতে হয়। প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ প্রাচীন বাংলার মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি মূল্যবান দিক। প্রত্নসাক্ষ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা এ প্রাচীন যুগের বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে পারি।

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে শুরু করে খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে তৈরী বিভিন্ন ঘটমান জীবনের চিত্র সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক, ধর্মীয় উদ্দীপনায় নির্মিত বহু প্রস্তর ও ধাতু মূর্তি প্রত্ন সাক্ষ্য সমূহে সমাজের দু'ধরণের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সামাজিক অবস্থা বিষয়ে, অপরটি ধর্মীয় রীতিনীতি ও দেবদেবী ইত্যাদি বিষয়ে। সমাজ জীবনভিত্তিক প্রত্নসাক্ষ্যসমূহ হতে প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ভূষণ তথা পোষাক, অলঙ্কার, কেশবিন্যাস, শিরোভূষণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। অপর পক্ষে ধর্মীয় অবস্থার আলোকপাত হয়েছে প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, দেবদেবী ও অর্ধদেবতা উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলক ও ভাস্কর্য কর্মগুলিতে। পোড়ামাটির ফলক এবং ভাস্কর্যগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত এবং কৃষ্ণের উপাখ্যানের দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর বর্ণনাও এগুলিতে দেখা যায়। এ সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস এবং প্রাচীন বাংলার প্রস্তর বা তাম্রপটে খোদিত লিপিমালায় এবং পালযুগের কিছু চিত্রিত পান্ডুলিপিতে প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিপি সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে সেই তথ্যগুলি আমরা তুলে ধরতে পারি।

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব এক থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বের মধ্যীয় বরেন্দ্র ও বদ্বীপ এলাকার একান্ত নিজস্ব এবং প্রাচীন ঐতিহ্য আমরা খুঁজে পেয়েছি পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত কিছু পোড়ামাটির কাজে ও অন্যান্য প্রত্ননিদর্শন সাক্ষ্যে। এ স্থানে উৎখনন কার্যের ফলে আবিস্কৃত পোড়ামাটি ফলকে প্রটো ঐতিহাসিক সভ্যতারই পরিচয় পাওয়া গেছে।[১] ঐতিহাসিক

---

১ S.S. Biswas, Terracotta Art of Bengal, (Delhi: Agamkala Prakashan, 1981), p. 29.

অতুল সুরের মতানুসারে পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত প্রত্নসমূহে বাঙালীর অতি প্রাচীন ঐতিহ্য এবং বাংলার উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে।[১]

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পান্ডুরাজার ঢিবি উৎখননের ফলে নকশাপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির মৃৎপাত্র, মূল্যবান গুটিকা বা দামী পাথর ইত্যাদি এবং কম মূল্যের পাথরখন্ড, তাম্রের বস্তু, লৌহ, হাতিয়ার ছাড়া কিছু সংখ্যক পোড়ামাটির ফলকের আবিস্কার এখানকার কয়েকটি যুগের পরিচয় দান করেছে। প্রত্নবস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির তৈরী একটি নারী মুর্তির দেহের অর্ধাংশ এবং ভিনজাতীয় হেলমেট পরিহিত পুরুষ মূর্তি এবং কালো স্টেটাইট পাথরের একটি গোল সীলমোহর উল্লেখযোগ্য। নারী মূর্তির লাল ইট রংয়ের পোড়ামাটির চিত্রটিতে দেখা যায় রমণীটির মস্তক বাখির ঠোঁটের মত (চিত্র নং-১২)। রমণীর এরূপ গঠনের শির দেখে মনে হয় এটি সে যুগের এক প্রকার কেশবিন্যাস রীতি বা শিরোভূষণ। তার বক্ষ স্ফীত ও অনাবৃত। মনে হয় রমণী মূর্তিটি ধর্মীয় চেতনায় নির্মিত একটি মাতৃকা দেবীর মূর্তি। এছাড়া এস এস বিশ্বাস অপর একটি রমণী মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর অভিমতে মূর্তিটি উৎপাদনের বা উর্বরাশক্তি' রূপিনী দেবী। রমণীর নিম্নাংশে কোমরে একটি কটিবন্ধের প্রতীক লক্ষ্য করা গেছে।[২] বলতে হয় খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ত্রয়োদশ থেকে দ্বাদশ শতকের দিকে পান্ডুরাজার ঢিবিতে একটি স্থায়ী সমাজবদ্ধ জীবনের উদ্ভবের সাক্ষ্য মেলে। এ স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু, রমণীর মূর্তিচিত্রগুলির সাক্ষ্য থেকে সুস্পষ্ট হয়। বিশেষতঃ তামার তৈরী নানা রকমের অলঙ্কার যেমন পেঁচানো, সর্পিল আকৃতির বালা, আংটি ও কাজল ব্যবহারের কাঠি এ সময়ের রমণীদের ভূষণ ও প্রসাধনীরই সাক্ষ্য বহন করে। এ থেকে বোঝা যায়, পান্ডুরাজার ঢিবিই বাঙালীর আদি ইতিহাসের প্রত্নস্থান এবং প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহ এখানকার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবস্থার নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য।

---

১ A.K. Sur, Prehistory and Begining of Civilizatioh in Bengal, p. 7.

২ P.C. DasGupta, Excuvationsat Pandu Rajar Dhibi, (Director of Archaeology, West Bengal, 1964), P.19.

পশ্চিম বঙ্গের ২৪ পরগণার চন্দ্রকেতুগড়ে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টপর কয়েক শতাব্দীর মানুষের শিল্পকর্ম যেমন বৃত্তাকার, সমানুরাল রেখায় অলংকৃত মৃৎপাত্র এবং কতকগুলি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তির পরিধেয়ের ভাঁজে গ্রীসীয় রোমক প্রভাব লক্ষ্যে বুঝতে পারা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে নিম্নগাঙ্গেয় অববাহিকার সংগে উত্তর ভারতের সংস্কৃতির যোগাযোগ ছিল।[১] চন্দ্রকেতুগড়ের খনন কার্যের ফলে ধারাবাহিকতা পূর্ণ মূল্যবান কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার প্রতিফলন ফলকগুলিতে হয়েছে। তাই সময়কালের পার্থক্য চিত্রগুলিতেই ধরা পড়ে। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে অলঙ্কার ভারগ্রস্ত, চূড়াযুক্ত শিরোভূষণ শোভিতা ও পর্যাপ্ত কেশবিন্যাস-যুক্ত যক্ষিণী বা অপ্সরা মূর্তি। রমণী মূর্তির বেশ ভূষণের চিত্রে সৌন্দর্য চর্চার প্রতি গুরুত্ব লক্ষ্যণীয় বিষয়। রমণী মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ মাতৃকাদেবীর ধারণা প্রসূত।[২] শুঙ্গ আমলের এবং সমসাময়িক কালের চন্দ্রকেতুগড়ের আবিস্কৃত পোড়ামাটির ফলকে খচিত সুন্দর দেহভঙ্গিমায় রমণীরা নমনীয় তন্তুজাত সূক্ষ্ম পোষাক পরিহিতা। রমণীদের তিনসারি বিশিষ্ট কটিবন্ধনীতে যুক্ত বৃহদাকার ঝুলন্ত অলঙ্কার। রমণীদের ঝোলানো ঘাঘরা এবং সিল্কের ভাঁজযুক্ত লম্বা কাপড়ের ফালি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে পরতে দেখা যায়। কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের রমণী মূর্তিতে বৈদেশিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ফলকে উৎকীর্ণ রমণীর শুধুমাত্র নিম্নাঙ্গের চিত্র পাওয়া যায়। এ ধরনের কোন কোন ফলকে ভাঁজযুক্ত সূক্ষ্ম কাপড় পরিহিতা যক্ষী রমণী মূর্তিগুলিকে চুলে অস্কুশ, কুঠার, তীর, তলোয়ার, ত্রিশূল এই পঞ্চায়ুধ প্রতীকের পঞ্চচূড়া ব্যবহার করতে দেখা যায়।[৩] ফলক সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে কখনো কখনো পাঁচটি হতে দশটির অধিক চুলের কাঁটা বা যাদুকরী চুলের কাঁটা ও গুটিকার অলঙ্কার পরিধানের বাহুল্যতা রমণীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, এই

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব</u>, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৯৭৬-৭৭।

২ S.S. Biswas, <u>op.cit.</u>, p. 40-42.

৩ <u>Ibid.</u>, p. 78.

প্রকার যক্ষী বা অপ্সরা মূর্তিগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কারণ তাদের কেশবিন্যাস প্রচুর অলঙ্কার দ্বারা সুষমামন্ডিত থাকত। পাখাযুক্ত বিশেষ ধরনের যক্ষী মূর্তি চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিস্কৃত হয়েছে। একই স্থানে প্রাপ্ত দুটি ফলকে উৎকীর্ণ মূতিকে ডানাযুক্ত যক্ষিণী মূর্তির ফলক বলে সনাক্ত করা হয়েছে। এই দুইটি ফলকে উৎকীর্ণ যক্ষী মূর্তিগুলি দেবদূত সদৃশ অনুপম সৌন্দর্যের নিদর্শন (চিত্র নং- ২ক ও চিত্র নং- ২খ)। তাদের মস্তকাবরণ এবং গহনার ও পোষাকের মধ্যে মিল রয়েছে কিন্তু যক্ষী রমণীদের ডানাগুলি দুটি ভিন্ন রীতিতে তৈরী।[১] এখানকার উৎকীর্ণ একটি ফলক ভগ্ন বলে যক্ষীর একটি ডানা দেখা যায় (চিত্র নং- ২ক)। অপর ফলক চিত্রে যক্ষীর দুটি ডানাই পাওয়া গেছে (চিত্র নং- ২খ)। তার বৃহৎ কেশবিন্যাস দুই পাশ দিয়ে ক্ষুদ্রকায় গুটিকার মালা দ্বারা সজ্জিত। সে দুটি গুটিকার সুন্দর হার পরিহিতা। তার গলদেশের একটি হার লম্বা। হারের গুটিকা গুলির সাথে বড় দোলক বা লকেট যুক্ত। অন্য হারটি রত্নময়। তার দুটি হাত ভগ্ন অবস্থায় দেখা যায়। অপর যক্ষীর বাম ডানাটি অক্ষত এবং ডান ডানাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। যক্ষী কর্ণে কুন্ডল, গলবন্ধ আকৃতির ভারী কয়েকটি হার, বৃহৎ গোলাকার ঝুলন্ত অলঙ্কার যুক্ত মালা দ্বারা শোভিত (চিত্র নং- ২ক)।[২] উল্লেখিত ২খ ফলকটিতে যক্ষী দুই সারিবদ্ধ কটিবন্ধ এবং চুড়ি পরিহিতা। তার দামী পোশাকে সারি সারি মুক্তা খচিত। তার একটি ডানার শেষাংশ কুন্ডলী আকৃতির বা গোলাকারভাবে গুটানো।[৩]

মৌর্যযুগের বৈশিষ্টসূচক কিছু পোড়ামাটির ফলক চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া গেছে। এ সকল ফলক চিত্রে রমণীকে ভিন্ন রীতির পোষাক পরিহিতা দেখা যায়। একটি চিত্রে রমণী কাঁধ সংলগ্ন হয়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলন্ত স্কার্ট বা ঘাঘরা পরিধান করেছে (চিত্র নং-৩ক)। তার পরিধানে একটি কটিবন্ধনী লক্ষ্য করা যায়। একটি ওড়না দৈহিক শোভাবৃদ্ধির জন্য রমণী পরেছে। রমণীর বেশভূষায় মার্জিত রুচি ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত। এরূপ কোমর-

---

১ S.K. Sarasvati, Early Scuipture of Bengal, 2nd ed., (Calcutta: 1962), p. 101-102.

২ S.S. Biswas, op.cit., p. 186.

৩ Ibid., p. 156.

-বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ ঘাঘরা তৎসহ ওড়না পরিহিত পোষাকের রেওয়াজ বা ফ্যাশন মৌর্য-যুগের রমণীদের সৌন্দর্য চেতনার সাক্ষ্য বহন করেছে।[১] শুঙ্গ ও কুষাণ আমলে রমণীদের বেশভূষণে বিভিন্ন দেশীয় ধাঁচ ও ধারার এক অপূর্ব সমন্বয় ছিল। ফুলহাতা ব্লাউজ এবং ঘাঘরার পাশাপাশি শাড়ী পরিধানের রীতিও সে সময় ছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক চিত্রে মা ও শিশুর দৃশ্যে দেখা যায় মায়ের পরিধানে ফুলহাতা ব্লাউজ এবং শাড়ী সূক্ষ্ম ভাঁজবিশিষ্ট, এই শাড়ী কোমরের সংগে সংলগ্ন (চিত্র নং- ৩খ)। শাড়ীর পাড় সুতা বা জরি দিয়ে অলঙ্কৃত, যা অপরূপ সৌন্দর্যে মনোরম হয়েছে। শিশুর শিরোস্ত্রাণে ব্যবহৃত পাখির পালক সদৃশ মুকুট দেখে তাকে রাজপুত্রের মত মনে হয়।[২] চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর একটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রমণী চিত্রটি যক্ষী মূর্তির (চিত্র নং- ৪ক)। তার গলায় গল-বন্ধনী আকৃতির হার বা নেকলেস, ভারী কটিবন্ধনী, চুড়ি, অনন্ত, ফুল আকৃতির কানের গহনা, মাথার দুই পাশে চুলের কাঁটা বা হেয়ার পিন সংযুক্ত করে রমণীটি সুসজ্জিত। রমণী একটি ভাঁজযুক্ত ওড়না পরিহিতা, যা উপবীত ধাঁচে বুকের উপর দিয়ে তার স্কন্ধের উপর দিয়ে দেহের ঊর্ধ্বভাগ বেষ্টন করে আছে। এই ওড়নাকে পোষাকের সংগে দৃঢ়ভাবে আঁটি-কানোর জন্য কারুকার্য করা এক প্রকার পিন ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ফলকে একটি দন্ডায়মানা যক্ষী রমণী উৎকীর্ণ হয়েছে (চিত্র নং- ৪খ)। তাকে অভিজাত পরিবারের রমণী মনে হয়। সরু কোমর বিশিষ্ট রমণীটির চিত্রে যৌবনা নারীর সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত। তার কোমরে পরিহিতা একটি মেখলা অত্যন্ত সুন্দর, সূক্ষ্ম এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রমণীর কেশবিন্যাস বিস্তৃত হয়ে কান পর্যন্ত ছুঁয়েছে। রমণীর কানে গুটিকার সারি যুক্ত বৃহৎ কানদুল।[৩] অপর একটি পোড়ামাটির ফলক চিত্রে রমণীকে শিরে মৌর্যযুগীয় মস্তকাবরণ পরিহিত দেখা যায় (চিত্র নং-৪গ)। থালা আকৃতির এই মস্তকাবরণে ভূষিত রমণীর মুখভাব বিশেষ স্বর্গীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে।[৪]

---

১ S.S. Biswas, op.cit., pp. 78,169.

২ Ibid.

৩ Ibid., p. 162.

৪ Ibid., p. 114.

খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি পোড়ামাটির ফলকের দৃশ্যে লক্ষীদেবীকে পদ্মফুলের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র নং-৫ক)। দেবীর দুই করে পদ্মের কলি। দেবীর মুখমন্ডল গোলাকার, বাহু সরু এবং তার ব্যবহৃত অন্যান্য জিনিসপত্র দৃষ্টি আকর্ষণীয়। শাড়ী পরিহিতা এই দেবীর পোষাক কটিবন্ধনী যুক্ত। তাঁর হাঁটুর নিম্নাংশ ভগ্ন। কটিবন্ধনী থেকে ঝুলন্ত ও ভাঁজযুক্ত কাপড় দুপায়ের মাঝখানে দোদুল্যমান। রমণীর ললাটের উর্ধভাগের প্রান্ত থেকেই কেশবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। একই ধরনের পোড়ামাটির ফলক চিত্র কৌশাম্বীতেও দৃষ্টিগোচর হয়।[১] পরেশচন্দ্র এই লক্ষী দেবী মূর্তিগুলিকে পৌরাণিক কাহিনীর আখ্যান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লক্ষী দেবীকে দুধের সাগরের দেবী বলেছেন।[২] কেশদামে বা কেশ-বিন্যাসে পাঁচটি যুদ্ধাস্ত্র আকৃতির পঞ্চায়ুধ প্রতীকের পঞ্চচূড়া পরিহিতা অপ্সরাগুলিকে বৃষ্টি ও প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিতা ভারতীয় মাতৃকাদেবী বা মায়াদেবী বলা হয়। একই ধরনের মূর্তি খচিত মৃৎফলক চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া গেছে। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অলঙ্করণে শিরোভূষণে ও কেশবিন্যাসে শুঙ্গ শৈলীর বৈশিষ্টসূচক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের কতকগুলি যক্ষিণী মূর্তিতে অলঙ্কার প্রাচুর্য এবং যৌন আবেদনের প্রাধান্য দেখা গেছে। প্রতীক চিহ্ন হিসেবে মাছ বা শঙ্খের ব্যবহার হয়েছে যা দেখে মনে হয় পোড়ামাটির ফলকগুলি ছিল প্রজনন শক্তির ও প্রাচুর্যের প্রতীক।[৩]

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি ভগ্ন ফলকে দেখা যায় রমণী দুটি মাছ দড়িতে ঝুলিয়ে হাতে ধরে আছে (চিত্র নং- ৫খ)। রমণী শাড়ী অত্যন্ত শোভনীয় রূপে পরিহিতা। শাড়ীর কিছু অংশ ভাঁজযুক্ত অবস্থায় সামনের দিকে ঝুলানো। রমণীর উর্ধাঙ্গ অনাবৃত। রমণীর শাড়ী পরার শৈলী তাকে সুষমা ও সৌন্দর্য দান করেছে। তার দেহে অলঙ্কার বিশেষ দেখা যায়না।[৪]

---

১ S.C. Kala, Terracotta Figurines from Kausambi, (1950), p. 35.

২ P.C. DasGupta, An Introduction to the State Archaeological Gallery, West Bengal, Plate-VI.

৩ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৯৭-৯৮।

৪ S.S. Biswas, op.cit., p. 117.

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর একটি পোড়ামাটি ফলকে একটি রমণীর নিম্নার্ধের চিত্রে তাকে ঘাঘরা জাতীয় পোশাক পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৫গ)। রমণী উত্তরবাস হিসাবে উত্তরীয় পরিধান করেছে। রমণীর পদযুগলের অলঙ্কার মল, যা মণি খচিত হতে পারে।[১] রমণীর বলাকার ভাঁজযুক্ত স্বচ্ছ বা নির্মল পোষাক হেলেনিস্টিকশিল্প রীতির সাথে তুলনীয়।

শুঙ্গ আমলে রমণীদের মধ্যে ললাটে অলঙ্কার পরিধানের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ তার পরবর্তী সময়েও এ অলঙ্কার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিস্কৃত একটি পোড়ামাটির ফলক দৃশ্যে একটি রমণী শিরে মণিমুক্তা খচিত টিকলী পরে আছে (চিত্র নং- ৬ক)। রমণীর মস্তকের পোড়ামাটির ফলক চিত্রটি হতে এক বিলাসী রমণীর চিত্র পরিস্ফুট হয়। অলঙ্কার পরিহিতা রমণীর টিকলীর উপর গুটিকা দিয়ে গাঁথা কয়েক সারি অলঙ্কার বিন্যাস দেখা যায়, যা আলো বিকিরণ করছে। তার কেশবিন্যাসে দেখা যায় অস্ত্রাকৃতি পাঁচটি চুলের যাদুকরী কাঁটা ব্যবহার করা হয়েছে। কাঁটাগুলি একটি অন্যটির সাথে তুলনীয় নয় এবং ভিন্ন নকশাপূর্ণ। কেশবিন্যাসের প্রান্তের নকশা মোচাকৃতি এবং কৃত্রিম গোলাপ সদৃশ। ললাটের টিকলী বা সোনকটি দ্যুতিময় ও আকর্ষণীয়।[২] শুঙ্গ ও কুষাণ আমলে কানের বহুবিধ ও বিভিন্ন নকশায় তৈরী গহনা সে যুগের কারিগরি দক্ষতারই নিদর্শন। এ সময়কালের অধিকাংশ কানের গহনা ছিল বৃহৎ কুন্ডল। তবে মাথামোটা পেরেক আকৃতির কর্ণাভরণও রমণীরা পরতো। বৃহৎ কুন্ডল গুলিতে পুষ্পের নকশা লক্ষণীয়। এসব কুন্ডলের নিম্নভাগে আবার পাথরের গুটিকার সারি বা গুটিকার মালা ঝুলানো থাকত।

অপর একটি মৃৎফলক চিত্রে রমণীকে নকশাপূর্ণ ঝুলন্ত ছোট ছোট অলঙ্কার সংযোজিত গুচ্ছ হার গলবন্ধনীর ন্যায় পরতে দেখা যায় (চিত্র নং-৬খ)। ক্ষুদ্রাকৃতি পোড়ামাটির এই ফলক চিত্রের রমণীটিকে অলঙ্কার ভারে সুসজ্জিতা যুবতী নারীর প্রতিকৃতি মনে হয়। তার ললাটে ফুলের আকৃতির বন্ধনী বা ফিতা। গলায় একটি গলবন্ধের মত হার ও একটি দীর্ঘ

---

১ S.S. Biswas, op.cit., p. 118.

২ Ibid., p. 166, Plate-VIIa.

হার, কর্ণে লতানো ফুলের ন্যায় গহনা পরিহিতা এই রমণী একটি টিকলীও পরিধান করেছে।[১] সন্দেহ নাই যে এই ফলকে উৎকীর্ণ রমণী অত্যন্ত বৈভবশালী ও সৌখিন। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ রমণী একটি আকর্ষণীয় পাঁচ সারি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গুটিকা দ্বারা গাঁথা মালা পরেছে (চিত্র নং-৬গ)। এ ধরণের মালাকে পঞ্চলহর মুক্তাহার বলা হয়। এতে একটি বড় আকৃতির রত্ন বসানো আছে।[২] অপর একটি ভগ্ন পোড়ামাটি ফলক চিত্রে রমণীর একটি হাতে ভারী ও মোটা বলয় লক্ষ্য করা যায় এবং তার পরিহিতা ওড়না দ্বারা বক্ষদেশ আংশিক আবৃত (চিত্র নং-৬ঘ)। সে ডান হাত দিয়ে তার সেরেক আকৃতির বৃহৎ কানের গহনা ধরে আছে।[৩]

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর ফলকচিত্রে যক্ষী রমণী সুপ্রচুর অলঙ্কার ভারগ্রস্তা (চিত্র নং-৭ক)। অসংখ্য গুটিকা অথবা মুক্তা বা মূল্যবান রত্ন খচিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত রমণীর মাঝে নারীত্বের মোহনীয়তা ও মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছে। গোলাকার মোচাকৃতি মুকুট তার মাথায় স্বর্গীয় সৌন্দর্যের নিদর্শন স্বরূপ। রমণীর কেশবিন্যাসে পাঁচটি করে চুলের কাঁটার গুচ্ছ অপূর্ব রীতিতে উভয় পাশে সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম শতাব্দীর অতি প্রাচীন এই রমণী মূর্তি চিত্রের ভূষণ সামগ্রী অত্যন্ত মোহিতকর এবং সমকালীন বিত্তশালী সমাজের রমণীকুলের বেশ ও ভূষণের পরিচায়ক।[৪]

অপর একটি ভগ্ন পোড়ামাটির ফলক চিত্রে উৎকীর্ণ রমণীর মণিমুক্তা দিয়ে শোভিত বৃহৎ খোঁপা দেখা যায় যার আকার পাগড়ির মত (চিত্র নং- ৭খ)। খোঁপার গোঁড়া মুক্তার

---

১ S.S. Biswas, <u>op.cit.</u>, p. 120, Plate-XXXVIb

২ <u>Ibid.</u>, p. 124.

৩ <u>Ibid.</u>, p. 174, Plate- XXXVIC.

৪ <u>Ibid.</u>, p. 165, Plate- XXV.

সারিবদ্ধ অলঙ্কার দিয়ে বাঁধা হয়েছে এবং একটি ফুল আকৃতির গিঁট দিয়ে তা ঝুলিয়ে খোঁপাটিকে অলঙ্কৃত করা হয়েছে।[১] চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর যক্ষী মূর্তিতে অভিজাত রমণীর পরিচয় পাওয়া যায় (চিত্র নং- ৭গ)। তাঁর দেহে বিবিধ কারুকার্য খচিত জমকালো অলঙ্কার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রমণীর কেশবিন্যাসে দেখা যায় উভয় পাশে ছয়টি করে চুলের কাঁটা যা থেকে মনে হয় আলো বিকিরণ করছে। উচ্চ বিত্তের এই রমণী অতি সুন্দর অলঙ্কার ও পোষাক পরিহিতা। তাঁর কানে বৃহৎ কুন্ডল যার নীচের দিকে ঝুলন্ত মুক্তা বা দামী পাথরের গুটিকার সারি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। রমণীর বাহুতে কেয়ূর ও হাত নানা ধরনের নকশাপূর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত।[২]

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর পোড়ামাটির ফলকচিত্রে সম্ভবত অগ্নির সংগী বা স্ত্রী স্বাহাকে দেখা যাচ্ছে (চিত্র নং-৮ক)। রমণীর কেশদাম চূড়া আকৃতির খোঁপা ডানদিকে অত্যন্ত পরিপাটি করে বাঁধা। খোঁপার গোঁড়া অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। তাঁর বক্ষস্থল অনাবৃত। তাঁর দেহভঙ্গিমা এবং কেশবিন্যাসের গোঁড়ার বন্ধনীতে অলঙ্কৃত নকশা রমণীকে মোহনীয় করে তুলেছে।[৩]

অপর পোড়ামাটির ফলকে একজন রমণী তার শির বড় পাগড়ী দ্বারা আবৃত করেছে (চিত্র নং- ৮খ)। পাগড়ীর মাঝে চক্র আকৃতির গর্ত যা কুষাণীয় মৃৎফলক চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। রমণীর মুখমন্ডলে গোলাকার চিবুক, পুরু ঠোঁট, উন্নত নাসিকা, চোখ ভারতীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মৃৎফলকটি খ্রীস্টীয় আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর পোড়ামাটির ফলকে রমণীর মস্তকে অদ্ভুত পাখা সদৃশ শিরোভূষণের মধ্যস্থলে রয়েছে গোলাকার পিন্ড জাতীয় অলঙ্কার (চিত্র নং- ৮গ)। সম্ভবতঃ

---

১ S.S. Biswas, <u>op.cit.</u>, p. 172.

২ <u>Ibid.</u>, p. 165, Plate- XXIV.

৩ <u>Ibid.</u>, p. 160, Plate- XIVb.

ফ্যাশন হিসেবে রমণীটি এই শিরোভূষণ পরিধান করেছে। তার ললাটে তোলা ভঙ্গিতে দুটি ভুরু, আনত চোখ, চ্যাপ্টা নাসিকা, সহাস্য চেহারা বিশেষ ভাব প্রকাশ করে।[১] অপর প্রাপ্ত খন্ড পোড়ামাটি ফলকে একজন রমণীকে সিড়িতে দন্ডায়মান দেখা যায় (চিত্র নং-৯ক)। তার পাশে একটি অষ্টভুজ সুস্ত, নীচে অলঙ্কৃত নকশা। রমণীর কেশদাম পরিপাটি করে আঁচড়ানো এবং গলায় তিনসারি পাথরের গুটিকা অথবা মুক্তার হার, হাতে একাধিক বলয়, পরিধেয়ে সম্ভবতঃ ডোরাকাটা নকশাযুক্ত কাপড় এবং বক্ষ আবৃত।[২]

চন্দ্রকেতুগড়ের অপর মৃৎফলকে একটি কলসী বহনকারী রমণীকে দেখা যায় (চিত্র নং ৯খ)। তার কাঁখে বাম হাতে ধরা একটি কলসী যা রমণীর পরিধেয়ের ভাঁজযুক্ত কাপড়ের উপর দেখা যায়। রমণীর উন্নত বক্ষ সুন অত্যন্ত কোমল এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় উৎকীর্ণ। সে একটি শাড়ী পরিহিতা। সামনের দিকে তার ঝুলন্ত শাড়ীর অংশবিশেষ দেখা যায়। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর পোড়ামাটি ফলকে প্রসাধনে ব্যস্ত রমণীর আকর্ষণীয় চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে (চিত্র নং- ৯গ)। এই চিত্রটি খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের বাঙালী রমণীদের রূপচর্চার একটি উজ্জল নিদর্শন। রমণী বাম হাতে আয়না ধরে ডান হাত দিয়ে চুলের পরিচর্যায় ব্যস্ত। তার শির আবরণী মুকুট সদৃশ এবং তা মুক্তা খচিত বলে অনুমিত হয়। অপর একটি পোড়ামাটির ফলকে এক রমণী ডান হাত দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর অথবা লাল রং লাগাচ্ছে এবং বাম হাতে ধৃত আয়নায় রমণী তার খোঁপা অবলোকন করছে (চিত্র নং- ৯ঘ)।[৩] অত্যন্ত জীবন্ত এই চিত্র সৌন্দর্যরসে পরিপূর্ণ। প্রাচীন যুগেও বাঙালী রমণীরা বেশ ও ভূষণের শোভাবর্ধনে অত্যন্ত পটিয়সী এবং আগ্রহী ছিল সন্দেহ নাই। যদিও ফলকটি অস্পষ্ট, তবুও বাঙালী রমণীদ্বয়ের বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে সচেতনতা এই ফলক চিত্র হতে অনুমান করা যায়।

---

১ S.S. Biswas, <u>op.cit.</u>, p. 190, Plate- LVIa.

২ <u>Ibid.</u>, p. 181, Plate- XLVC.

৩ <u>Ibid.</u>, p. 175-76.

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে বিশেষতঃ নারীদের পাদুকা ব্যবহারের কথা আমাদের বিস্ময়ের বিষয়। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মৃৎফলকে অতি মুল্যবান ফুলের নকশা সম্পূর্ণ অলঙ্কৃত পাদুকা জোড়া পরিহিতা পায়ের চিত্র উৎকীর্ণ পোড়ামাটি ফলক দৃষ্টিগোচর হয় (চিত্র নং- ১০ক এবং চিত্র নং- ১০খ)। ফলকচিত্রের স্যান্ডেল জোড়ায় দেখা যায় চামড়া অথবা শক্ত কাপড়ের লম্বা ফিতা, যা বন্ধনী হতে পারে। পায়ে পরিহিতা পাদুকাগুলি ফুলের নকশা ও অলঙ্কারযুক্ত মনে হয়। যদিও পাদুকাগুলি পুরুষের না রমণীর সে বিষয়ে লিখিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তথাপি পাদুকার পরিমাপ ও ডিজাইন দেখে তা রমণীদের স্যান্ডেল বলে ধারণা করা যেতে পারে। অপর একটি নিম্নাংশের মৃৎফলকে দেখা যায় রমণীর অধোবাস ডুরিদার পায়জামা। এই নিম্নবাস ডোরালো নকশায় অলঙ্কৃত (চিত্র নং- ১০গ)। রমণী কটিতে মেখলা পরিহিতা। এই মৃৎফলকটি ভগ্ন। তবুও রমণীর উত্তরবাস হিসেবে ব্যবহৃত উত্তরীয় চোখে পড়ে। এ পোষাকে ধন ও বিত্তের ছাপ সুস্পষ্ট।[১] [illegible] ভগ্ন ফলকে [illegible] পায়ে মল পরিহিতা রমণীর চিত্র দেখা যায়।
পোড়ামাটি ফলকটির সময়কাল খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বলে অনুমান করা যায়। এ থেকে অতি প্রাচীন যুগে রমণীরা কতই না বিলাসী ছিল বোঝা যায়। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অপর একটি চিত্রে দেখা যায় দন্ডায়মানা নারীমূর্তি বাম কক্ষে জলকুম্ভধৃতা (চিত্র নং-১১ক)। রমণীর কর্ণে ভারী ঝুলানো পত্রাকৃতির কুন্ডল। কণ্ঠে স্থূল ভারী হার তা তিনসারি প্রস্তর বা স্বর্ণের গুটিকা দ্বারা তৈরী। তার পরিধানে ফ্রক জাতীয় গলবন্ধনী যুক্ত পোষাকটির হাতা লম্বা।[২]

উপরোক্ত পান্ডুরাজার ঢিবি এবং চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থানে আবিস্কৃত প্রত্নসাক্ষ্যের বিশ্লেষণে অনুমান করা যায় যে, মৌর্য যুগ থেকে কিংবা তারও পূর্বে এ সমস্ত অঞ্চলের রমণীরা বেশ ও ভূষণে সুসজ্জিতা থেকেছে। পান্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় স্তরে প্রাপ্ত ভগ্ন খন্ড

---

১ S.S. Biswas, op.cit., pp. 167,175.

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৯, চিত্র নং- ২০।

পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ মাতৃকা দেবী মূর্তির স্ফীত কোমরে দেখা যায় কটিবন্ধনী। এছাড়া দামী পাথরের গুটিকা বা কমদামী পাথর, চিত্রিত উজ্জ্বল চিনামাটির পাত্র ইত্যাদি প্রটো-ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকেতুগড়ের মৃৎফলকে উৎকীর্ণ রমণীর বেশভূষণে দেখা যায় বৃহৎ অলঙ্কৃত কেশবিন্যাস এবং দামী পাথরের গুটিকা, মুক্তা, মণি রত্নাদির গহনার প্রাচুর্যতা। সুপ্রচুর অলঙ্কারের মধ্যে কেশবিন্যাসে যুদ্ধাস্ত্র জাতীয় চুলের কাঁটার ব্যবহার (চিত্র নং- ১১খ) এবং বহুমূল্য গুটিকার তৈরী অলঙ্কার (চিত্র নং- ১২-১৫) উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টতা দান করে।

বাংলাদেশের বগুড়ার মহাস্থানগড় বা পুন্ড্রনগরে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যেকার খননকৃত কয়েকটি প্রত্নস্থানে বিভিন্ন সভ্যতার স্তরে কিছু পোড়ামাটির ফলক-চিত্র, রমণীদের ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি, স্বল্প মূল্যবান পাথরের গুটিকা ও বোতাম পাওয়া গেছে। আবিষ্কৃত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন শতাব্দীর পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেশীর ভাগ ফলক চিত্রেই বেশভূষা ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত রমণী মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। তবে রমণীর চিত্রে দেখা যায় অধিকাংশই দেবীমূর্তি। মহাস্থানে প্রাপ্ত একটি পোড়া মাটির ফলকে দম্পতি চিত্রে রমণীকে একটি কারুকার্য নকশা বিশিষ্ট সুরুচি সম্পন্ন মুকুট পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ১৬)। রমণীর মুকুটটি শিথিলভাবে মাথার চারিপাশ ব্যাপী ঘিরে টুপির মত দেখায়। তার পরিধেয়ে নাভির নিম্নভাগ হতে শাড়ী লক্ষ্য করা যায়।[১] শাড়ীটি কাছা দিয়ে পরা হয়েছে যা সামনের দিকে ঝোলানো কাপড়ের ভাঁজ দৃশ্যে অনুমিত হয়। একটি গুটিকার মেখলা দ্বারা শাড়ীটি তার কোমরের সাথে আবদ্ধ।[২] রমণী গলদেশে একটি হার এবং কর্ণে বড় গোলাকার কুন্ডল পরিধান করেছে। তার বাম হাতে একটি প্রসাধনী বাক্স দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং এ ফলকে উৎকীর্ণ দৃশ্য বিশ্লেষণে বাঙালী রমণীর বেশভূষণের চিত্র স্পষ্টই নজরে পড়ে।

---

১ S.S. Biswas, op.cit., p. 196.

২ S. Hussain, E.L.P.E., p. 98.

অপর একটি মৃন্ময় রমণী মূর্তির শিরে বৃহৎ মুকুট পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ১৭ক)।[১] মুকুটটি অলঙ্কৃত এবং নকশা খচিত। মুকুটের নীচে দুই সারি অলঙ্কার তার ললাটের উপরের দিকটি আবৃত করেছে। রমণীর কর্ণে কোন অলঙ্কার নাই। মুকুটটি রমণীকে ভূষণে অতি সুসজ্জিত রূপ দান করেছে। মুখে তার মৃদু হাস্যশীল ভাবটি মাধুর্য্যের সৃষ্টি করেছে। মনোরোম ছাঁচে গড়া এই মুকুট পরিহিতা রমণীর মস্তকদেশের মূর্তিটি বিশেষ আকর্ষণীয়।

মহাস্থানে খননের ফলে প্রত্ন নিদর্শনের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক শুঙ্গ যুগীয় পোড়া-মাটির চিত্র ফলক আবিস্কৃত হয়েছে। এরুপ একটি চিত্রে দেখা যায় দামী এবং জমকালো ভূষণ সামগ্রীতে সুসজ্জিতা এক রমণী (চিত্র নং- ১৭খ)। রমণীর কেশ বিন্যাসে গুটিকার অলঙ্কারের প্রাচুর্যতায় বৈদেশিক রীতি লক্ষণীয়। তার গলায় কয়েকটি গুটিকার মালা এবং হাতে পাথর খচিত চুড়ি। তার কেশদাম শিরে চূড়ায় মত করে খোঁপা বাঁধা। কেশবিন্যাসে মাথার দুপার্শ্বে পাঁচটি করে যুদ্ধাস্ত্র আকৃতির চুলের কাঁটা ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ কেশ-বিন্যাস আঁটসাঁট রাখার জন্য রমণী এ জাতীয় কাঁটার ব্যবহার করেছে। রমণীর কানে বৃহৎ আকৃতির অলঙ্কার তার কাঁধ পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। তার ডান বাহুর অলঙ্কার তিন সারি বিশিষ্ট অঙ্গদ। রমণীর কেশ সংলগ্ন অলঙ্কার দ্বারা ললাটের কিছু অংশ আবৃত হয়েছে। এ অলঙ্কার তার ডান ও বাম কাঁধ পর্যন্ত ঝুলানো। মাছের আঁশের মত নকশায় তৈরী এই অলঙ্কারটি অতি আকর্ষণীয়। রমণীর কেশবিন্যাস ও ব্যবহৃত অলঙ্কার অতি চিত্তাকর্ষক মনে হয়।[২]

মহাস্থান যাদুঘরে রক্ষিত একটি গজলক্ষী মূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। বেলে পাথরের রিলিফ পদ্মের উপর দন্ডায়মানা এই দেবী রমণীর নাক, ঠোঁট ও চিবুক নষ্ট হয়ে গেছে (চিত্র নং- ১৮)। রমণীর দুই পাশে দুই সখী বা রমণী প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। দেবীর

---

১ নাজিমুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

২ তদেব, পৃ. ১৫, চিত্র নং- ৮।

পরণে সূক্ষ্ম কাপড়। তাঁর দেহের উপরাংশে একখন্ড কাপড় বুকের উপর দিয়ে দুপাশে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। তাঁর গলায় গুটিকার মালা, কটিতে তিনসারি গুটিকার মেখলা, বাহুতে কেয়ুর, হাতের কব্জিতে বলয়, শিরে মুকুট। মুকুটের কেন্দ্রে গোলাকার খাঁজকাটা নকশার একটি অলঙ্কার দেখা যায় যা শিরোভূষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তার দেহের নিম্নার্ধের পোষাক পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে এবং তাঁর সখীদের কেশবিন্যাসে গুপ্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১] মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত অপর একটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে বৌদ্ধ নারী মূর্তি। রমণী মূর্তিটি পালঙ্কে শায়িত এবং স্বপ্নে আচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ এই রমণী মায়াদেবী (চিত্র নং- ১৯ক)।[২] দেবী একটি শাড়ী কাছাবিহীন রীতিতে পরেছেন। উত্তর-বাস বুকে রমণী একটি ওড়না পরিহিতা। তাঁর দেহে তেমন অলঙ্কার দেখা যায় না। কেবল একটি কটিবন্ধনীর সাহায্যে নীচের বসনটি শক্ত করে কোমরের সাথে সংযুক্ত মনে হয়। তাঁর উত্তরীয়ের একপ্রান্ত ডান কাঁধের উপর দিয়ে এলায়িত। দেবীকে অত্যন্ত ভাববিলাসী রমণী মনে হয়।[৩] অপর একটি ভাস্কর্যে হরগৌরী মূর্তি চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে। গৌরী দেবীকে উন্নত কারুকার্য বিশিষ্ট মুকুট পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ১৯খ)। দেবীর গলদেশে একটি হার, কর্ণে গোলাপ আকৃতির কুন্ডল। দেবীর বসন উপরের অর্ধকে আংশিক আবৃত করেছে। কিন্তু নীচের অর্ধ অস্পষ্ট বলে তার পরিধেয়ে শাড়ী কি ওড়না ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করা যায়না। গৌরী রমণী গলায় একটি গলবন্ধনীর ন্যায় হার পরেছেন।

অপর ভাস্কর্যে দেখা যায় শিব ও দুর্গার যুগল মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় দুর্গার বুকের কাপড় কটিদেশের ডান দিক থেকে উপরের দিকে উঠেছে (চিত্র নং-২০ক)। দুর্গার পরিহিতা পোষাকটি সমান্তরালভাবে নীচ থেকে উপরে উঠায় এটি শাড়ী বলে ধারণা

---

১ S.Alam, <u>Scuptural Art of Bangladesh,</u> (Dhaka,1985),P.83.

২ S.S. Biswas, <u>op.cit.</u>, p. 193.

৩ S. Hussain, <u>E.L.P.E.</u> p. 96.

করা যায়। শাড়ীটি তার নিম্ন দেহকে আবৃত করেছে। এই রমণী মূর্তিটির পোষাক সম্পর্কে কিছুটা তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ফলকটি খন্ডিত বলে অস্পষ্ট।[১] নাগিনী বৃহৎ ফাঁপা কুন্ডল পরেছে (চিত্র নং- ২০খ)। সে ঘাড় সংলগ্ন করে একটি বড় এলো খোঁপা বেঁধে কেশবিন্যাস করেছে। এ রীতিতে রমণীরা আদিকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত চুলের সৌন্দর্য বিন্যাস করে আসছে।[২] এছাড়া মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত ধাতব দ্রব্যের মধ্যে তাম্রের অষ্ট ধাতুর বলয় দেখা যায় (চিত্র নং- ২১)। এখানে আরো পাওয়া গেছে আংটি, সুরমা দন্ড, কানবালা, লম্বমান কুন্ডল, নাকফুল, পাথরের গুটিকা এবং ভূষণ সামগ্রী রাখার জন্য নীলাভ প্রস্তরের উৎকীর্ণ সুন্দর প্রসাধন থালা। খ্রীস্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় শতাব্দে নির্মিত এ থালাতে একজোড়া উপবিষ্ট হরিণ, একটি বাঘ, একটি হস্তী ও এদের মধ্যস্থলে কলসী হতে উদ্গত পুষ্পের মাল্য চিত্রিত আছে। রমণীদের ব্যবহৃত উল্লেখিত ভূষণ বা প্রসাধনী সামগ্রীর সাক্ষ্য প্রমাণে প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

আমরা জানি, বৃহত্তম বৌদ্ধ ধর্মীয় পীঠস্থান পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের মূল প্রাচীর বা দেওয়াল ৬৩টি প্রস্তর ভাস্কর্য দ্বারা সজ্জিত ছিল, কিন্তু ভাস্কর্যের এক বা দুইটি ছাড়া অবশিষ্টাংশগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে সম্পৃক্তযুক্ত বলা যায়। অনেকগুলি কৃষ্ণের এবং বেশ কয়েকটি শিবের মূর্তি। শিব ও কৃষ্ণ মূর্তির পাশাপাশি অনেকগুলি ইন্দ্র, অগ্নি, উমা, নর্তকী, প্রভৃতি মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সুকুমার ও বর্তুলাকৃতি, দেহ মাংশল ও পেলব, পরিহিত অলঙ্কার সূক্ষ্ম। কিছু রিলিফে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছে। এ মূর্তিগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিফলন। পাহাড়পুরের বৃহৎ মন্দির ভিত্তিগাত্রে সারিবদ্ধ প্রস্তর ভাস্কর্যের মধ্যে একটি প্রণয়শীল দম্পত্তির চিত্রে মূর্তি দুটিকে রাধা কৃষ্ণ বলে ধারণা করা হয় (চিত্র নং- ২২)। গঠন ভঙ্গির দিক থেকে উৎকীর্ণ মূর্তি দুটিতে সুনিপুন দক্ষতার ছাপ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন কোমল। রমণীর (রাধা) বক্ষস্তন ও কটি স্ফীত, উদর আকর্ষণীয়,

---

১ S. Hussain, E.L.P.E., pp. 96,112,115.

২ নাজিমুদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

পায়ের ভঙ্গিমা আড়াআড়িরূপে দৃঢ়ভাবে জড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা অপূর্ব ছন্দময় হলেও ডান পা ভগ্ন। সে নাভির নীচ থেকে পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত ঢিলা বসন বা শাড়ী পরেছে কাছাবিহীন ঢংয়ে। রমণীর উপরের অর্ধ অনাবৃত। নিম্নাঙ্গের পোষাকের ঘন সমানুরাল রেখা বিশিষ্ট ভাঁজ ঢেউয়ের মত মনে হয়।[১] দুই সারি মেখলা বা কটিবন্ধনীর দ্বারা তার শাড়ী কোমরের সাথে আবদ্ধ। রাধার অঙ্গে তেমন বেশী অলঙ্কার লক্ষ্য করা যায় না। সে দুপায়ে দুটি মল, কানে কুন্ডল, গলায় একটি গুটিকার হার, হাতে একটি চুড়ি পরিহিতা। তার বৃহৎ খোঁপাটি কুন্ডলী আকৃতির এবং তা ঘাড় পর্যন্ত নামানো। এই রমণীর দীর্ঘ কেশ কুন্ডলী পাকানো মনে হয়।[২] তাঁর মুখমন্ডলে হাসিভাব থাকলেও তাতে লজ্জার ছায়া স্পষ্ট। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অপর দেবী মূর্তি যমুনা বা নদী দেবী বলে পরিচিত (চিত্র নং- ২৩)। যমুনা মূর্তির দুই পাশে একজন পুরুষ ও একজন রমণী দন্ডায়মান। রমণী সংগীর বাম হাতে একটি ফুলের ঝুড়ি। ডান হাতেও রমণী কিছু বহন করছে, তার বহনকৃত বস্তু অনুমিত হয় একটি ফুল। পুরুষ সংগীর হাতে একটি ছাতা যা দেবীর মাথার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।[৩] কোমনীয় ভঙ্গিমায় ভাস্কর্য মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছে রমণীদ্বয়ের দেহ পোষাকে আচ্ছাদিত। কাপড়ে লম্বমান ঘন ভাঁজ নজরে পড়ে। দেবীর পরনে সূক্ষ্ম ভাঁজযুক্ত কাপড় শরীরের সাথে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন আছে। তার বাম পায়ের দিকে শাড়ীর ঝালর ঢেউকাটা ভাঁজের মত দেখা যায়। বাম দিকের সংগী রমণীর দেহের ঝুঁকে পড়া ভঙ্গিমা, নমনীয় কটি এবং উদরের গঠনে পেলবতা অপূর্ব ও মূল্যবান শৈল্পিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে।[৪] যমুনার পরিহিত বসন শাড়ী কাছাবিহীন রীতিতে পরিধান করা। আঁটসাঁট

---

১ S.K. Saraswati, E.S.B., pp. 39,40,51.

২ S. Hussain, E.L.P.E., p. 95.

৩ S.K. Saraswati, E.S.B., p. 53.

৪ Ibid., p. 54.

শাড়ীটির তরঙ্গায়িত ভাঁজ ডোরাকাটা দাগের মত দেখায়। তাঁর রমণী সংগীর পোষাকটিও শাড়ী এবং একই রীতিতে পরিহিত.। তবে তার বাম পায়ের দিকে কোন ঝালর দেখা যায় না। সে উপরের অংশে একটি উত্তরীয় পরিহিতা বলে মনে হয়। এ ভাস্কর্যে উভয় রমণীর পরিহিত বসন কটিবন্ধের দ্বারা আবদ্ধ। যা নিম্নবসনকে শক্ত করে কটিতে আঁটকিয়ে রেখেছে। সংগী রমণী একটি ছোট খোঁপা বেঁধে তা অলঙ্কার অথবা মুক্তার তৈরী ফিতার বন্ধনী দিয়ে শিরে শক্ত করে সংযুক্ত রেখেছে। যমুনা ও তাঁর সংগী রমণী কানে বৃহৎ কুন্ডল পরিহিতা। সংগী গলায় কেন্দ্রে ঝুলন্ত ডিম্বাকৃতি লকেট বিশিষ্ট দুই লহরের মুক্তার মালা পরেছে। যমুনার গলায় একগুচ্ছ ছোটছোট গুটিকা বা মুক্তার হার যার কেন্দ্রে একটি অলঙ্কার দেখা যায়। উভয় রমণীর পায়ে মল, হাতে গুটিকার আকৃতি বিশেষ দানা দানা নকশার চুড়ি বা বলয় এবং বাহুতে কেয়ুর লক্ষ করা যায়। যমুনার কোমরে শিকলের মত নকশা সম্পন্ন একটি কীলকযুক্ত ও একটি পাকানো সুতার মত মেখলা। একই ধাঁচের কীলক-বিহীন মেখলা সংগী রমণীকেও পরিহিত দেখা যায়।[১] পাহাড়পুরের প্রধান মন্দিরের নিম্ন দেয়ালে বেলে পাথরের একটি ত্রিকোনাকৃতি প্যানেলে একটি ভাস্কর্যে শিবের বিষপান দৃশ্য উৎকীর্ণ হয়েছে (চিত্র নং- ২৪)। শিবের পার্শ্বে একজন রমণী বাম হাতে পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই রমণীর বামপার্শ্বে অপর একজন রমণীকে দেখা যায়। প্যানেলের উৎকীর্ণ সকলের দেহ বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিত। রমণীরা অনন্ত, বালা, গলায় হার এবং পায়ে মল পরিহিতা। বিশেষতঃ বাম দিকের প্রথম রমণী একটি বক্ষবন্ধনী পরিধান করেছে। অন্যান্য মূর্তিগুলি হচ্ছে যম ও অগ্নি দেবতার। এই দলীয় ভাস্কর্যের মধ্যে দুজন রমণীই কাছাবিহীন রীতিতে শাড়ী পরিহিতা। দুই রমণীর বামপায়ের ধারে শাড়ীর ঝালর একটি বিশেষ রীতি মনে হয়। কিন্তু ডানদিকে প্রথম রমণীটির ঝালর সম্পূর্ণ আলাদা রকম। তার পরিহিত স্তনপট্ট বা বক্ষবন্ধনী শবর কন্যাদের পরিহিত বক্ষবন্ধনীর অনুরূপ।[২] রমণীদের সুচ্ছ

---

১ S. Hussain, E.L.P.E., pp. 106. 108,114.

২ Ibid., p. 94.

কাপড়ের ভাঁজ সমানুরাল এবং ঘন রেখা তীক্ষ্ণ (চিত্র নং- ২০)। এই রমণীদের পরিধেয় রাঁধার পোষাকের মতই (চিত্র নং- ২২)।[১] দুই রমণীই একজোড়া কুন্ডল, গলবন্ধের আকৃতি বিশেষ একটি করে মালা, একজোড়া অনন্ত এবং দুই পায়ে মল পরিহিতা।[২] পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দেয়ালে কৃষ্ণবর্ণ ভারী পাথরে তৈরী একজন নৃত্যশীল রমণীর মূর্তি পাওয়া গেছে (চিত্র নং-২৬)। রমণীর দক্ষিণ হস্ত শরীরের উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভঙ্গিমায় রয়েছে। আর বাম হস্ত উঁচু করে আছে। তার মাথার ভঙ্গিমা হেলানো। রমণী হাটুর দিকে ঝুঁকতে বেশ শক্তি প্রয়োগ করেছে মনে হয় এবং বাম হাতটি উপরে তুলে আলগাভাবে রেখেছে। তার উত্তরীয়ের শেষ প্রান্ত দুটি দুই কাঁধের উপর হতে দুইদিকে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। নৃত্যরত অবস্থায় তার উত্তরীয়ের প্রান্তদ্বয় যেন উড়ছে।[৩] সে নর্তকীর পরিধেয়ে অন্তর্বাস তার পা দুটিকে আবৃত করে। শোভাবর্ধনের জন্য একটি রেশমী ভাঁজযুক্ত কাপড় পায়ের মধ্যস্থলে সামনের দিকে আলতোভাবে রমণী ঝুলিয়ে রেখেছে এবং ঝুলন্ত পৃথক কাপড়ের গুচ্ছ বন্ধনী দ্বারা নিম্ন পোষাকের সাথে সংযুক্ত করা আছে। নিম্নার্ধের আঁটসাঁট এই পোষাকটি শাড়ী বলেই মনে করা যেতে পারে। পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত নামিয়ে রমণী এই শাড়ী কাছা দিয়ে পরেছে মনে হয় কারণ সামনে ঝুলন্ত ভাঁজযুক্ত কাপড়টি কাছা মেরে কোমরে বাঁধা কাপড়ের মতই। উপরের অর্ধে ব্যবহৃত ওড়না রমণীর বক্ষ আবৃত করেনি। সে হাতের কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত চুড়ি, ললাটে গুটিকা অথবা মুক্তার ফিতার ন্যায় বন্ধনী পরিহিতা।[৫] বৃহৎ দুটি গোলাকার মল তার পায়ে। গলায় ছোট ছোট লজেন্স আকৃতির অলঙ্কার যুক্ত নূপুরের মত মালা। তার বাম ঘাড় সংলগ্ন ছোট খোঁপা এবং কুন্ডলীকৃত মাথার কেশ লক্ষ্য করা যায়। রমণীর নিম্নবসনে কয়েকটি ডোরাকাটা দাগের নকশা দেখা

---

১ S.K. Saraswati, E.S.B., p. 40.

২ Ibid., p. 60.

৩ Ibid., pp. 86-87.

৪ S. Hussain, E.L.P.E., p. 93-94.

৫ Ibid., p. 106.

যায়। তার ভ্রু গাঢ়ো করে টানা। অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় নর্তকীটিকে গতিশীল প্রতীয়মান হয়।[১] অপর একটি নৃত্যরতা রমণী উলম্বভাবে দাগটানা নকশার কাপড়ের আঁটসাঁট পায়জামা পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র নং- ২৭ক)। গুটিকার গাঁথা দুই সারি মালার মত কটিবন্ধনী দ্বারা তার পায়জামা আবদ্ধ এবং পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত দীর্ঘায়িত। সে গলায় গুটিকার মালা ও বাহুতে এবং মনিবন্ধে বলয়ের মত অলঙ্কার পরিহিতা। কর্ণে ছোট আকারের কুন্ডলীও দেখা যায়। দন্ডায়মানা এই রমণী নৃত্যের ভঙ্গিমা অতি সুকুমার। তার উত্তোলিত দুই হাতে একটি গোলাকার বস্তু। সে মাথায়ও একটি গোলাকার টুপি পরিধান করেছে। এই টুপিটি রমণী শিরোভূষণ হিসেবে ব্যবহার করেছে বলা যায়। অপর একটি প্রণয়রত যুগল ভাস্কর্যের রমণীর অলঙ্করণ বিহীন নিম্নবসন পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত বিন্যস্ত এবং তা একটি অলঙ্কৃত কটিবন্ধনী দিয়ে কোমরের সাথে আঁটসাঁট করে সংযুক্ত করা (চিত্র নং- ২৭খ)। রমণীর এ পোষাকটিকে পায়জামা বলে অনুমিত হয়।[২] রমণী গলায় লতাগুল্মের আকৃতি বিশেষ মালা, হাতের বাহুতে কেয়ুর এবং দুই পায়ে দুটি মল দ্বারা ভূষিত হয়েছে। তার চুলের একটি খোঁপা নীচু করে ঝোলানো এবং একখন্ড পাতলা কাপড় দিয়ে খোঁপাসহ শির আবৃত করে রমণী কেশবিন্যাস করেছে।

পাহাড়পুরের একটি যুগল ভাস্কর্যে প্রণয়ী রমণীর মূর্তিটি অত্যন্ত সজীব বৈশিষ্টপূর্ণ। (চিত্র নং- ২৮)। সুরুচি সম্পন্ন ভাস্কর্যটিতে পুরুষ তার ডান হাত দিয়ে রমণীর ঘাড়ের উপর দিয়ে রমণীর ডান হাত ধরে আছে। রমণীটি ত্রিভঙ্গ রীতিতে দন্ডায়মান। সেও তার বাম হাত দিয়ে প্রেমিকের ঘাড়ের উপর হাত রেখেছে। রমণী বৃহৎ কীলক আকার বিশিষ্ট কানের অলঙ্কার পরিহিতা।[৩] তার পরিধেয় শাড়ীটি পা পর্যন্ত ঝুলন্ত। অলঙ্কৃত কয়েক সারি গুটিকার কটিবন্ধনী দ্বারা বসনটি কোমরের সাথে সংযুক্ত। কটিবন্ধনী বা মেখলার

---

১ S.K. Saraswati, <u>E.S.B.</u> , p. 87.

২ S. Hussain, <u>E.L.P.E</u>; p. 94.

৩ <u>Ibid.</u>, pp. 108,114,117.

মাঝে একটি নকশাকৃত কীলক রয়েছে। রমণীর শাড়ী নিম্নাঙ্গের চর্তুদিকে জড়ানো এবং বাম পায়ের বামদিকে শাড়ীর ঝালর বিশেষ খাড়াভাবে দেখা যায়। কিন্তু রমণীর দেহের উর্ধাংশ অনাবৃত। একটি ফিতা দিয়ে তার কেশ বিন্যস্ত। মনে হয় তার মাথা একটি পাখা আকৃতির মুকুট দিয়ে পরিপাটি করা। রমণীর ললাটের অংশে একটি গুটিকার মালা লক্ষণীয়। তার ডান কানের ঝুলন্ত অলঙ্কারের প্রান্তভাগ গোলাপ ফুল আকৃতির। সে বাহুতে অনন্ত, গলায় গুটিকা এবং মুক্তার গাঁথা দুটি মালা পরিহিতা।[১] পদ্মপানির সংগী রমণীর পরিধেয়ে একটি শাড়ী কাছাবিহীন রীতিতে পরা এই পরিধেয়টি কটিবন্ধনী দ্বারা কোমরের সাথে আঁটকানো (চিত্র নং- ২৯খ)। কটিবন্ধনীটি মনে হয় অলঙ্কৃত। রমণীর উত্তরীয়ের দুটি প্রান্ত লক্ষণীয়। একই রীতিতে যম এর সংগী রমণী শাড়ী পরিহিতা (চিত্র নং- ২৯ক)। তার শাড়ীর কিছু ভাঁজযুক্ত অংশ সামনের দিকে দোলায়িত থাকতে দেখা যায়। একটি কীলক যুক্ত কটিবন্ধনী দ্বারা রমণী তার শাড়ী কোমরের সাথে আঁটসাঁট করে রেখেছে। কিন্তু অপর একটি ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ মনসা দেবীর বসনে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (চিত্র নং- ৩০)। তার বাম পায়ের উপর দিয়ে উলম্ব রেখাটানা দীর্ঘ কাপড় মোহিতকর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। তার পরিধেয় শাড়ী এবং তা বেশ লম্বমান দীর্ঘ মনে হয়, যা দেহের পশ্চাৎদিক হতে কাঁধের উপর ন্যস্ত। মনসা দেবী অঙ্গে অলঙ্কার পরিহিতা।[২] তাঁর গ্রীবায় দুটি হার, কানে কুন্ডল এবং হাতে বলয়। মনসা দেবীর শির মুকুট দ্বারা সজ্জিত। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ধাতব হরগৌরী মূর্তিতে রমণী গৌরী একটি পায়জামা পরিহিতা, যা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত দীর্ঘ (চিত্র নং- ৩১ক)। পায়জামাটি কোমরের সংগে অলঙ্করণ বিহীন কটিবন্ধনী দ্বারা আঁটসাঁট করা।[৩] অপর একটি পোড়ামাটির ভগ্ন ফলক চিত্রে মস্তকবিহীন রমণীকে শাড়ী পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৩১খ)। তার শাড়ী ফুলের নকশা খচিত। রমণী বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কার

---

১ S.K. Saraswati, E.S.B., p. 88.

২ S. Hussain, E.L.P.E., pp. 94,109,117.

৩ Ibid., p. 94.

পরেছে যেমন গলায় একাধিক গুটিকার ঝুলন্ত হার, কটিতে অলঙ্কৃত মেখলা এবং রমণীর শাড়ী তার বুকের উপর দিয়ে বামস্কন্ধে উঠানো আছে। খন্ডিত বলে ভাস্কর্যটির বৈশিষ্ট-সমূহ নিশ্চিত করে বলা যায় না।[১] তবে একটি 'তারা' মূর্তিকে একই ঢংয়ে শাড়ী পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৩২)। একটি অলঙ্কৃত কটিবন্ধনী দিয়ে 'তারার' শাড়ী কোমরের সংগে সংযুক্ত। এই রমণীর বক্ষদেশের উপর দিয়ে শাড়ীর আঁচল তরঙ্গায়িত ভাঁজে কটির ডান দিক হতে বাম কাঁধের উপর উঠিয়ে পশ্চাতে ফেলা হয়েছে। মনে হয় এ রীতি আধুনিক বাঙ্গালী রমণীর শাড়ী পরার রীতির মতই ছিল।[২] গলায় গুটিকার ছোট মালা ছাড়াও রমণীর শাড়ীতে ডোরাকাটা নকশার দাগ লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপ নকশাযুক্ত শাড়ী পরিহিতা অপর একজন রমণীর অধোবাসের কিছু অংশ বুকের উপর দিয়ে বাম কাঁধের উপর পতিত হয়েছে (চিত্র নং- ৩৩ক)। রমণীর মাথায় একটি চুড়াখোঁপা বাঁধা। অপর চিত্রে রমণীর অধোবাস পায়জামার মত (চিত্র নং- ৩৩খ)। সে একটি ওড়না ব্যবহার করেছে বলে মনে হয়। কাঁধের উপর দিয়ে তার উত্তরীয় ঝুলে আছে। কিন্তু তার বক্ষ অনাবৃত।[৩] অপর রমণী কাছা-বিহীন রীতিতে শাড়ী পরিহিতা (চিত্র নং- ৩৪ক) তার দুই কাঁধে জড়ানো উত্তরীয় বাতাসে উড়ছে মনে হয়। নকশী কটিবন্ধনী দিয়ে নিম্নবসন কোমরে আঁটকানো। দুপ নিম্নবসন পরি-হিতা এই রমণীর কটির সাথে একখন্ড কাপড় সামনে ভাঁজযুক্ত অবস্থায় দুপায়ের মাঝখানে ঝুলন্ত (চিত্র নং- ৩৪খ)। রমণী একটি বক্ষবন্ধনী পরিহিতা। পোড়ামাটির অপর ফলক চিত্রে রমণীর নিম্নবসন পায়জামা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত লম্বা এবং কোমরে কটিবন্ধনী দ্বারা তা সংযুক্ত (চিত্র নং- ৩৪গ)। এই রমণীও বক্ষবন্ধনী পরিহিতা।[৪] তার পরিহিত অলঙ্কারের মধ্যে লক্ষণীয় বাহুর অঙ্গদ এবং কটির মেখলা।

---

১ S. Hussain, <u>E.L.P.E.</u>, p. 95, M.A.S.I., No. 55, pl. LVIIa

২ <u>Ibid.</u>, p. 95.

৩ S. Hussain, <u>S.L.W.E.M.B.</u>, pp. 52-53.

৪ <u>Ibid.</u>, Pl. VI, Fig- 2, Pl. II, Fig- 1,2.

অপর চিত্রে দেখা যায় বালি (vali) ও সুগ্রীব (Sugriva) যুদ্ধরত। তারা সম্ভবতঃ এক রমণীকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে (চিত্র নং- ৩৫ক)। এই রমণীর পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত ন্যাস্ত নিম্নবসন আঁটসাঁট। রমণী কোমরে কটিবন্ধনী পরিহিতা। তার কেশ একটি খোঁপায় বাঁধা।[১] পায়জামা পরিহিতা অপর একটি রমণীকে কটিহস্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো দেখা যায় (চিত্র নং- ৩৫খ)। তার নিম্নবসনে সমান্তরাল রেখার নকশা খচিত। অপর রমণীও উলম্ব টানটান নকশা করা পায়জামা পরিহিতা (চিত্র নং- ৩৫গ)। রমণী একটি বক্ষবন্ধনী পরিধান করেছে। সে কাঁধ সংলগ্ন খোঁপা বেঁধেছে।[২] তার কটিবন্ধনীর মধ্যাংশে অলঙ্কৃত কাপড় ঝুলে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অনুমিত হয় প্রাচীন বাঙালী রমণী অধোবাস নাভির নিম্নে থেকে পরত। তারা বক্ষবন্ধনী ছাড়াও আধুনিক বাঙালী রমণীদের মত ব্লাউজ ব্যবহার করত। এছাড়া প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলি এবং ভাস্কর্য থেকে রমণীদের বসন বা পরিধেয়ে বিভিন্ন প্রকার উলম্ব, সমান্তরাল, বিন্দু ও গোলাপফুল নকশা স্পষ্টই নজরে পড়ে। উজ্জ্বল নকশাযুক্ত নিম্নবসন ব্লাউজ, বক্ষবন্ধনী এবং নানান ধরণের অলঙ্কারে ভূষিত রমণীদের চিত্র সমকালীন চিত্রিত পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত হয়েছে।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মৃৎফলকে খোদিত একজন রমণীকে নৃত্যরত ভঙ্গিমায় দেখা যায় এবং একটি শিশু তার বামপাশে দাঁড়ানো (চিত্র নং- ৩৬ক)। সে সংকীর্ণ খাটো কাপড় পরিধান করেছে যা নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শেষ হয়েছে। একটি অলঙ্কৃত কটিবন্ধনী দ্বারা তার পরিধেয় কোমরে সংযুক্ত। তার স্তন একটি কাঁচুলী (বক্ষবন্ধনী) দ্বারা আবৃত এবং পেছন পিঠে গিঁট দিয়ে তা বাঁধা। তার উর্ধ্বাংশে একটি ওড়না কাঁধের উপর দিয়ে বুককে অনাবৃত করে ব্যবহার করতে দেখা যায়। তার ডান পার্শ্বে দাঁড়ান শিশুটিও খাটো বা ছোট পোষাক পরিহিত। পাহাড়পুরের আরেকটি মৃৎফলকে উৎকীর্ণ একটি চিত্রে একজন রমণীকে কূপ হতে পানি উত্তোলন ভঙ্গিমায় দেখা যায় (চিত্র নং- ৩৬খ)। তাঁর পায়ের নিকট পড়ে আছে

---

১ M.A.S.I., No. 55, Pl. XXXIII,a.

২ S. Hussain, S.L.W.E.M.B., Pl. IX, Fig. 2,3.

একটি কলসী এবং ডান পার্শ্বে একটি শিশু দাঁড়ানো। রমণীটি একটি শাড়ী পরিহিতা, যা গোঁড়ালীর সামান্য উপরে শেষ হয়েছে। তার নিম্নবাসের ভাঁজ দেখে মনে হয় সে শাড়ী কাছা দিয়ে পরিহিতা। শাড়ী দিয়েই রমণী তার উপরের অংশ আবৃত করেছে কিনা তা সুস্পষ্ট চিত্রিত না থাকায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা দুরূহ। অপর একটি মৃৎফলকে একজন রমণীকে পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত বিস্তৃত আঁটসাঁট ডোরাকাটা পায়জামা পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র নং- ৩৭ক)। তার শরীরের উপর অংশ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত। তার কেশ খোঁপায় বাঁধা। অন্য আরও একটি মৃৎফলকে এক রমণীকে পায়জামা পরতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৩৭খ)। তবে সম্ভবতঃ তার পায়জামাটি খাটো বলে তা গোঁড়ালী পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। কাপড়ের একটি কটিবন্ধনী দ্বারা কোমরের সাথে পায়জামাটি আঁটকানো যার একটি অংশ পায়ের মাঝখানে ঝুলে আছে। তার চুল পিছনে বৃহৎ খোঁপায় এলায়িত। আর একজন রমণীকে দেখা যায় গোঁড়ালীর সামান্য উপর পর্যন্ত নিম্নবসন পরিহিতা (চিত্র নং- ৩৭গ)। তার কোমরে নকশাপূর্ণ কটিবন্ধনী, মাথায় টুপির মত শিরোভূষণ। পাহাড়পুরের একটি মৃৎফলকে যুগল মানবমূর্তি চিত্রিত আছে (চিত্র নং- ৩৮ক)। চিত্রে রমণীকে খাড়াভাবে ডোরাকাটা পায়জামা পরিহিতা দেখা যায়। পায়জামাটি গোঁড়ালীর সামান্য উপরে শেষ হয়েছে। এই রমণীর কটিবন্ধনী কোমরের সামান্য উপরে অবস্থিত। এই রমণীর কটিবন্ধনী চিত্র নং- ৩৭খ এর রমণীর মত। তার কেশদাম চূড়ার আকারে বড় খোঁপায় বাঁধা। একই প্রকার পোষাক পরিহিত শবর দম্পত্তি মৃৎফলকে লক্ষ্য করা যায়। শবর রমণী নিম্নবসন পরিধান করেছে, যা গোঁড়ালী পর্যন্ত এসেছে (চিত্র নং- ৩৮খ)। একটি কটিবন্ধনী দ্বারা নিম্নবসনটি কটিতে সংযুক্ত। তার অধোবাসকে দেখে মনে হয় কাছা দিয়ে পরিহিত শাড়ী। শবরীর দেহের উপরাংশে একটি ওড়না কাঁধের উপর ঝোলান, কিন্তু তাতে বক্ষ আবৃত হয়নি। অপর একটি মৃৎফলকে শবর দম্পত্তি চিত্রে পর্ণমাত্র পরিহিতা শবরীকে প্রেমালাপে মত্ত দেখা যায় (চিত্র নং- ৩৯ক)। একটি ফলকে বীরদর্পে পদক্ষেপ কারিণী শবরী রমণী মৃত প্রাণী হাতে নিয়ে যাচ্ছে (চিত্র নং- ৩৯খ)। তার পরিধেয় পত্রের কটিবন্ধনী এবং সে পত্রেরই উর্ধ্ববসন উপবীত ঢংয়ে পরিহিতা। তার কেশ বৃহৎ খোঁপায় বাঁধা। অপর একটি মৃৎফলকে

উৎকীর্ণ শবর দম্পত্তি চিত্রে শবরীকে কুচ বন্ধনী পরিধান করতে দেখা যায়। মনে হয় সে একটি ওড়না ব্যবহার করেছে (চিত্র নং-৪০)। তার নিম্নবসন হিসেবে পত্রের কটি-বন্ধনী দেখা যায়। শবরী রমণী গলায় গুটিকার ন্যায় হার পরেছে। অপর ফলকচিত্রে শবরী রমণীর খোঁপা একটি ফিতা দিয়ে উঁচু করে বাঁধা (চিত্র নং- ৪১ক)। সেও পাতার কটিবন্ধনী পরিহিতা। অপর যুগল চিত্রের শবরী তার কেশগুচ্ছকে জালিকা অথবা নকসী ফিত দিয়ে মাথার চূড়ায় বেঁধেছে (চিত্র নং- ৪১খ)। তার খোঁপাটি অলঙ্কৃত মনে হয়। পোড়া-মাটির অপর ফলক দৃশ্যে একটি রমণী দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে (চিত্র নং- ৪২ক)। সে ছোট খোঁপা বেঁধে তার ঘাড়ের উপর বিন্যস্ত করেছে। অপর রমণী একটু ঝুঁকে দন্ডায়মানা (চিত্র নং- ৪২খ)। তার খোঁপাও ছোট এবং ঘাড় সংলগ্ন। এই দুই রমণীর খোঁপাবাঁধা প্রক্রিয়া একই রকম প্রতীয়মান হয়।[১]

পাহাড়পুরের দুইটি মৃৎফলকে বৌদ্ধ দেবী 'তারা' মূর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। একটি ফলকে 'তারা' শাড়ী পরিহিতা (চিত্র নং- ৪২গ)। সে পদ্মাসনে উপবিষ্টা। শাড়ীর এক অংশ কোমরের ডান পাশ দিয়ে তাঁর বুককে অতিক্রম করে কোনাকুনিভাবে ঘাড়ের উপর দিয়ে পেছনে পড়েছে। তাঁর শাড়ী পরার রীতি বর্তমান কালের রমণীদের শাড়ী পরার রীতির অনুরূপ। একই ভঙ্গিমায় শাড়ী পরিহিতা অপর একটি ফলকে 'তারা'কে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র নং- ৩২)। এখানে 'তারা' কাছাবিহীন ঢংয়ে শাড়ী পরেছেন। শাড়ীর একটি অংশ কোমরের সামনে ভাঁজ দিয়ে কোমরকে আবৃত করেছে। এক অংশ বক্ষস্থলের উপর দিয়ে পেছনে পতিত। দুটি চিত্রেই দেখা যায় রমণীরা শাড়ী নাভির নীচ দিয়ে পরেছেন এবং তাঁদের কটিবন্ধনী কটিদেশে গোলাকার কীলক বিশেষ দ্বারা সংযুক্ত। কিন্তু 'তারা' শাড়ী পরিধান করলেও তার ডান স্তনের আংশিক অনাবৃত রয়েছে। অপর একটি ফলকে এক নাগিনীকে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪২গ) এর 'তারা'র মত ভঙ্গিমায় উপবিষ্টা (চিত্র নং- ৪৩ক)। আঁটসাঁট কটিবন্ধনী দ্বারা কোমরের সংগে সংযুক্ত তার নিম্নবাস

---

১ S. Hussain, E.L.P.E., p. 108.

যা পায়জামা বলে অনুমিত হয়। তাঁর নিম্ন পরিধেয়ের ভাঁজ নির্দিষ্ট দূরত্বের রেখা তীক্ষ্ণ মনে হয়। তাঁর বাহুতে কেয়ূর, কানে কুন্ডল, গলার হারের অংশ রূপে কয়েকটি গুঁটিকার মালা দেখা যায়। একটি মৃৎফলক চিত্রে গর্ন্ধব রমণীকে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৩খ)। তার নিম্নবসন কোমরের সাথে মেখলা দ্বারা সংযুক্ত। তার পোশাকে বিন্দু বিন্দু নকশা খচিত হয়েছে।

পাহাড়পুর মৃৎফলকে উৎকীর্ণ রমণী মূর্তি সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন-কালের রমণীদের পরিধেয় ছিল সাধারণতঃ শাড়ী, পায়জামা, বক্ষবন্ধনী এবং বসন পরিধানের রীতিও প্রায় একই রূপ। আমরা ফলক চিত্রের মস্তক বিহীন রমণীর (চিত্র নং- ৩১খ) পরিধেয়ের সাথে (চিত্র নং- ৩২) -এর দাঁড়ান 'তারা' দেহের শাড়ীর মিল দেখতে পাই। তবে উপরোক্ত রমণীর শাড়ী উচ্চমানের নকশাকৃত এবং কটিবন্ধনী অত্যন্ত মূল্যবান অলঙ্কারে শোভিত। আবার যমুনা দেবীর (চিত্র নং- ২৩) শাড়ী পরার রীতির সাথে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় 'রাধা'র (চিত্র নং- ২২) শাড়ী পরার ঢংয়ে। অনেক ভাঁজ 'রাধা' শাড়ীতে ডোরাকাটা দাগে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তার শাড়ী আঁটসাঁট এবং বাম পায়ের দিকে ঝালর বিশেষ। একটি পোড়ামাটির ফলক চিত্রে বলরাম (Balarama) এর রক্ষী বা সহচরী রমণীর পরনে কাছাবিহীন ঢংয়ে শাড়ী দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৪ক)। তার সামনের কাপড়ের ভাঁজ ঝুলে আছে। শাড়ী পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত ঝোলানো এবং তা কোমরের সংগে গোলাকার কীলক বিশেষ কোমর বন্ধনী দ্বারা যুক্ত। যদিও অস্পষ্ট তথাপি মনে হয় সে একটি ওড়না তার দেহের উপরের অংশে পরিধান করেছে। অনুরূপ ভঙ্গিমায় ও ঢংয়ে কৃষ্ণের সহচরী সংগীকে শাড়ী পরতে দেখা যায়। কেবলমাত্র সামনে ঝুলন্ত ভাঁজ অনুপস্থিত (চিত্র নং- ৪৪খ)। তদ্রুপ উল্লেখিত (চিত্র নং- ২৩)-এ যমুনা দেবীর রমণী সংগী একই ধাঁচের শাড়ী পরিহিতা। (চিত্র নং- ২৭ক)-এর নৃত্যরত রমণীর নিম্নবসনের সাথে (চিত্র নং- ৩৭ক) চিত্রের রমণীর এবং ৩৮ক যুগল চিত্রের রমণীর পোষাকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রত্যেকেই পায়জামা উলম্বভাবে এবং আঁটসাঁট দুইটি গুটিকার তৈরী কটিবন্ধনী দ্বারা তা কোমরের সাথে সংযুক্ত। আবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিবের দলীয়

চিত্রে প্রথম রমণীটি (চিত্র নং- ২৫), শবর রমণীর (চিত্র নং- ৪০)-এর মত সুনপট্ট ব্যবহার করেছে।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক এবং চিত্রে রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি তাদের শির-ভূষণ ও কেশবিন্যাস ছিল বৈচিত্রময়। শিরোভূষণ হিসেবে তারা টুপি ও মুকুট পরেছে। নানা রীতিতে নানা ভঙ্গিতে তারা চুল বেঁধে সাজসজ্জা করতে অভ্যস্ত ছিল। পাহাড়পুরে একটি মৃৎফলকে টুপি পরিহিতা একজন রমণীকে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৫ক)। অন্য একটি রমণীকে নরম কাপড়ের টুপি পরিহিতা গতিশীল ভঙ্গিতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৩৭গ)। অপর চিত্রে রমণীর টুপির সামনের অংশে গোলাকার অলঙ্কার এবং সামনের দিকে কৌণিক আকৃতি স্বরূপ (চিত্র নং- ৩৮ক)। নৃত্যরতা রমণীর মাথায় এরূপ গোলাকার টুপি দেখা যায় (চিত্র নং- ২৭ক)। হরগৌরী চিত্রেও রমণীকে মুকুট পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৩১ক)।[১]

পাহাড়পুরের মৃৎফলক এবং ভাস্কর্যে রমণীদের দেখা যায়, চুলকে ঠিক স্হানে পরিপাটি করে রাখার জন্য ললাটে ফিতা ব্যবহার করেছে। তারা বৃহৎ কেশগুচ্ছ মসৃণ ফিতা এবং কীলক দিয়ে খোঁপা করে আঁটকিয়ে রাখত (চিত্র নং- ৪৫গ)। একজন পুরুষের পার্শ্বে আসীনা একটি রমণীকে দেখা যাচ্ছে সে কেশগুচ্ছকে চূড়ায় গোলাকারভাবে ফিতা দিয়ে বেঁধে খোঁপা শিরে আঁটকিয়ে রেখেছে, (চিত্র নং- ৪৫খ)। একটি ফলক চিত্রে 'যক্ষিণী' তার চুলে পাতলা ফিতা দিয়ে সংযুক্ত করে দুটি ধনুর মত মস্তকদেশের পেছনে দুদিকে বেঁধেছে (চিত্র নং- ৪৩ক)। অপর চিত্রে যমুনা দেবীর সহচরীর খোঁপায়ও গুটিকা অথবা মুক্তার বন্ধনী বা ফিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ২৩)। বলরামের সহচরী রমণীকে তার ললাটিস্হ ফিতার মধ্যবর্তী স্হানে কীলকের মত অলঙ্কার পরতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৪ক)। কৃষ্ণের জীবনের ভাস্কর্যে রমণী চিত্রে দেখা যায় সে তার চুল ওড়না দিয়ে

---

১ Shahanara Hussain, E.L.P.E., pp. 105-106.

পেছনের দিকে বড় খোঁপার আকারে বেঁধেছে এবং ফিতা দিয়ে খোঁপাটিকে বেঁধে যথাস্থানে রেখেছে (চিত্র নং- ৪৪খ)। অপর ফলকে রমণীর কপালের উপর নকশা যুক্ত কীলক সদৃশ্য ফিতা বাঁধা (চিত্র নং- ৪১খ)। একটি গোলাকার কারুকার্য বিশিষ্ট অলঙ্কার তার খোঁপার সাথে সংযুক্ত। দম্পত্তি যুগল ভাস্কর্যে রমণী একটি গুটিকার ফিতা তার কপালে পরিধান করেছে এবং মসৃণ ফিতা দিয়ে শিরে বৃহৎ কেশবিন্যাস করেছে (চিত্র নং-২৮)। নৃত্যরতা রমণী মনে হয় তার কপালে বন্ধনী বা ফিতা পরিধান করেছে (চিত্র নং-২৬)। হালকা অথবা পাতলা কাপড় দিয়ে কেশবিন্যাস এর রীতি দেখা যায় অপর রমণী মূর্তিতে, (চিত্র নং- ২৭ক)-এর রমণী তার পুরো কেশগুচ্ছকে কাপড় দিয়ে খোঁপার মত বেঁধেছে।

মহাস্থানে প্রাপ্ত প্রণয়-প্রণয়ীর যুগল ভাস্কর্যে রমণীকে দেখা যায়, একটি কারুকার্য করা নকশা বিশিষ্ট সুরুচি সম্পন্ন রাজমুকুট পরিধান করেছে (চিত্র নং- ১৬)। হর-গৌরী ভাস্কর্যেও গৌরী দেবীকে কারুকার্য বিশিষ্ট মুকুট পরিহিতা দেখা যায় ৩১ক চিত্রে। তদ্রুপ ময়নামতীতে প্রাপ্ত মৃৎফলকে উৎকীর্ণ বিদ্যাধরী কে একটি টুপি পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৬খ), সে তার খোঁপায় একটি গোলাকার অলঙ্কার পরিধান করেছে।[1] সূর্য দেবতার মূর্তিতে দেখা যায় তার সহচরী রমণী একটি মুকুট পরিহিতা (চিত্র নং- ৪৭)। এছাড়া পাহাড়পুরের মৃৎফলকে উৎকীর্ণ রমণী মূর্তিগুলিতে এবং ভাস্কর্যে চুল বাঁধার বিভিন্ন রীতি বা ধাঁচ লক্ষ্য করা যায়। যেমন রমণীরা চূড়াখোঁপা ভঙ্গিতে চুল বেঁধেছে। তারা উঁচু খোঁপায় বড় জালিকার ব্যবহার করেছে। পেছন দিকে ফিতা দিয়ে চুল আঁচড়ানো, চুলকে সরাসরি-ভাবে পিঠে বিন্যস্ত রাখা, ফিতাখন্ড ঝোলানো ছিল রমণীদের রূপচর্চার অঙ্গ। কৃষ্ণের ডান পার্শ্বে রমণী সংগীর চুল উপরোক্ত রীতিতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৪খ) এবং (চিত্র নং- ২৩)-এ পাখাসদৃশ রীতিতে যমুনা দেবীর কেশবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এটিকে মস্তকাবরণ বা শিরভূষণও বলা যায়। এছাড়া খোঁপা বাঁধার বিভিন্ন রীতি প্রায়শঃই রমণীদের কেশবিন্যাসে দেখা যায়। একটি রমণীর বৃহৎ খোঁপায় ফিতার গিঁট দিয়ে ফুলের মত কীলক দেখা যায়

---

১ Shahanara Hussain, E.L.P.E., pp. 106-107. 106-107,

(চিত্র নং- ৪৫গ)। দরজায় দাঁড়ানো রমণীর খোঁপা (চিত্র নং- ৪২ক) এবং ঝুঁকে থাকা রমণীর ছোট খোঁপা একই রীতিতে বাঁধা (চিত্র নং- ৪২খ)। তদ্রূপ শবরী রমণী তার চুলকে একটি সরু ফিতা দিয়ে বেঁধে নির্দিষ্ট স্হানে খোঁপা করে রেখেছে (চিত্র নং- ৪১ক)।অপর শবর রমণীর দেখা যায় খোঁপা তুলনামূলকভাবে ছোট (চিত্র নং- ৪১খ)। চিত্র নং- ৪৬ক এবং চিত্র নং- ২৭খ এ রমণীদের প্রত্যেকেই তাদের চুলকে খোঁপায় বিন্যাসিত করেছে একই রীতিতে। ৪৬খ নং চিত্রে যুদ্ধে অপহৃত রমণীর খোঁপাও তাদের ঢংয়ে বাঁধা তবে ২৭খ চিত্রের রমণী তার বৃহৎ খোঁপাকে মসৃণ কাপড় খন্ড দিয়ে আবৃত করে রেখেছে।

চিত্র নং- ৪১খ তে উৎকীর্ণ যুগল চিত্রের মধ্যে ডান পার্শ্বের রমণী তাঁর খোঁপায় গহনা অথবা নকশাখচিত চুলের কাঁটা আঁটকিয়ে রেখেছে। ফলক চিত্রে 'রাধা' তাঁর বড় খোঁপা ঘাড়ের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে (চিত্র নং- ২২)। অনুমান করা যায় তার অনেক বড় কেশ গুটিয়ে এই খোঁপা তৈরী করা হয়েছে। পাহাড়পুর পোড়ামাটির ফলকে কিছু রমণী চিত্রে মাংসের কাবাবের মত গোলাকার কুন্ডলী পাকিয়ে চুলকে মাথার উপর বিন্যস্ত করতে দেখা যায়। (চিত্র নং- ২৪ ও ২৫) শিবের বাম দিকে দাঁড়ানো দ্বিতীয় রমণীটির চুল কুন্ডলী পাকিয়ে পুরো ললাটে আবৃত বলে মনে হয়।

অপর রমণী(চিত্র নং- ২৬)এ দেখা যায় এক নৃত্যরতা রমণীর চুল কুন্ডলী পাকানো অথবা জড়ানো অবস্হায় বাম ঘাড়ের উপর ন্যাস্ত। দুই অথবা ততোধিক উঁচু খোঁপা বাঁধা অথবা গিঁটের মত খোঁপা বাঁধা প্রাচীন বাঙালী রমণীদের সব সময়ের রেওয়াজ ছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ শবর দম্পত্তি চিত্রে রমণী দুজন ছোট উঁচু খোঁপা অথবা গিঁটা খোঁপা বেঁধেছে একটি রমণীর মাথার উপরে এবং অপরটি ডান দিকে (চিত্র নং- ৩৯ ক ও খ)। এছাড়া ছোট কুন্ডলী আকৃতির খোঁপা ঘাড়ের উপর ফেলে চুলের শোভা বর্ধন করত সেকালের রমণীরা। লম্বা চুল ভাঁজ করে মাথার চর্তুদিক দিয়ে ঘুরিয়ে কেশ-বিন্যাসের রীতি ছিল সে যুগে। সংগে মসৃণ ফিতা দিয়ে বেঁধে বৃহৎ মস্তকাবরণের ব্যবহারও সেকালে দেখা যেত। কেশবিন্যাস অলঙ্কৃত করা হত রেশমী ফিতা দিয়ে, যা একজন

উপবিষ্টা রমণীর কেশবিন্যাসে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৩ক)। মহাস্হানগড়ে প্রাপ্ত মৃৎ-ফলক চিত্রে রমণীকে মুকুট পরিহিতা দেখা যায়। শিথিলভাবে পরা এই মুকুটটি মাথার চারিপাশ ব্যাপী ঘিরে আছে (চিত্র নং- ১৬)। ময়নামতীতে প্রাপ্ত বিদ্যাধরীর খোঁপা বাম কাঁধের উপর ন্যাস্ত এবং সম্ভবতঃ তার কাপড় খন্ড দিয়ে ঢাকা (চিত্র নং- ৪৮খ)। খোঁপার মধ্যস্হিত অলঙ্কার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যা খোঁপার চতুর্দিকে ঘোরান ফিতার মত। অপর একটি রমণীকে ময়নামতীর প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলকে দেখা যায়, সে তার কেশগুচ্ছকে খোঁপায় বেঁধেছে (চিত্র নং- ৪৯ক)। চিত্র নং- ৪৮খ তে দেখা যায় এক রমণীর কেশবিন্যাস পাখার মত ছড়ানো নকশা বিশেষ যা পুরো মাথার উপর বিন্যস্ত।

প্রত্নস্হান ময়নামতী থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্র, ভাস্কর্য, নানা ধরণের পাথরের গুটিকার গহনা, রঙিন গুটিকার মালা পরিহিতা রমণীর ভাস্কর্য নিদর্শন বাঙালী রমণীর ভূষণ ও পরিধেয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় দান করে। একটি পোড়ামাটির ফলকে রমণীকে চিন্তাশীল ভঙ্গিতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৯ক)। রমণীর নিম্নবসন অস্পষ্ট নয়। তবে উর্ধবসন হিসেবে একটি ওড়নার ব্যবহার দেখা যায়। রমণীর কেশগুচ্ছ একটি খোঁপায় বাঁধা। তাঁর গলায় হার এবং হাতে বলয় লক্ষ্য করা যায়। অপর রমণীর উর্ধাঙ্গে ওড়না ব্যবহৃত হয়েছে (চিত্র নং- ৪৯খ)। যার একপ্রান্ত ডান কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলন্ত। তার বাম হাত উর্ধ্ব ভঙ্গিতে শিরের উপরে রাখা। হাতের মণিবন্ধে চুড়ি এবং বাহুতে বেশ ভারী দুইটি কেয়ূর। কেয়ূর দুটি একটি নীচে এবং অপরটি উপরে অবস্হিত। সে অপূর্ব ধাঁচে কেশবিন্যাস করেছে। ললাটের উপরে খাঁজকাটা নকশায় তার কেশগুচ্ছ রমণীকে অপরূপ করে তুলেছে। এক দন্ডায়মানা রমণীকে শাড়ী পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৯গ)। ফলকটি ভগ্ন বিধায় তার নিম্নবসন অস্পষ্ট। অনুমিত হয় নাভির নিম্নে থেকে রমণীর বসন কোমরে পেঁচিয়ে বক্ষের বাম পার্শ্ব দিয়ে কাঁধে তোলা। রমণীর কেশ সিঁথি বিহীন দেখা যায়। সে কর্ণে কুন্ডল ও হাতে বলয় পরিধান করেছে। অপর রমণী একটি বিন্দু এবং ডোরাকাটা নকশার পায়জামা পরিহিতা যা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত নামানো (চিত্র নং- ৪৮ক)। সে

একটি বৈজয়ন্তী পতাকা কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে বুকের উপর বাম হাত দিয়ে ধরে রেখেছে। তার কানে অলঙ্কার এবং গলায় হার। ময়নামতীতে প্রাপ্ত সূর্য দেবতার ভাস্কর্যে তার সহচরীকে বামপার্শ্বে একটি খাটো শাড়ী পরিহিতা অবস্থায় দেখা যায় যা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলান (চিত্র নং- ৪৭)। সে কাছা ভঙ্গিতে নিম্নবসনটি পরিধান করেছে যা মেখলা দ্বারা কোমরে আবদ্ধ। ময়নামতীতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে রমণীদের বৃহৎ বৃত্তাকার কুন্ডল এবং গোলাপ ফুল আকৃতির কানদুল পরিধান করতে দেখা যায়। রমণীদের গলায় পরিহিত গুটিকার মালা বিভিন্ন নকশার নিদর্শন আমরা পেয়েছি। অপর রমণী গলায় একটি হার এবং খোঁপায় অলঙ্কার পরিহিতা। বিদ্যাধরী এই রমণীর হাতের মণিবন্ধে বলয় দেখা যায় (চিত্র নং- ৪৮খ)। ময়নামতীতে প্রাপ্ত অপর ভাস্কর্যটিতে রমণী রঙিণ দামী পাথরের একটি লকেটসহ গুটিকার মালা পরিহিতা (চিত্র নং- ৫০)। এই রমণীকে অভিজাত পরিবারের বলে মনে হয়। সে আরো দুটি বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে বড় গুটিকার মালা তার ডান এবং বাম হাত দিয়ে বুকের উপর ধরে আছে। তার হাতে কোন গহনা নাই। শিরে একটি খোঁপা বাঁধা দেখা যায়। ময়নামতীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন আকৃতির ছোট বড় গুটিকার তৈরী মালা কেন্দ্রে ঝুলন্ত লকেটসহ গুটিকার মালা বা হার, তামার তৈরী কানের ঝাঁপা কুন্ডল, আংটি, তাংশা চুড়ি ময়নামতী যাদুঘরে রক্ষিত আছে (চিত্র নং- ৫১ ও চিত্র নং- ৫২)।

পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় এবং ময়নামতীতে প্রাপ্ত মৃৎফলকে উৎকীর্ণ চিত্র এবং ভাস্কর্যের বিশ্লেষণ করে রমণীদের পোষাক ও কেশবিন্যাসের রীতি, নকশা, ঢং তৎসহ এই তিনটি স্থানের প্রাপ্ত সাক্ষের পর্যালোচনায় রমণীদের পোষাক, কেশচর্চার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। উল্লেখিত সাক্ষ্যে আরও জানা যায় যে সে সময় রমণীরা অঙ্গে বিভিন্ন ধরণের অলঙ্কার পরিধান করেছে। নিম্নে তাদের গহনার বিশ্লেষণ করা হল।

নৃত্যশীল রমণীর ললাটে গুটিকার অথবা মুক্তার বন্ধনী বা ফিতা এবং যমুনা দেবীর সংগী রমণীর খোঁপায় একই প্রকার মুক্তার ফিতা বা বন্ধনী দেখা যায় (চিত্র নং- ২৩ ও ২৬)। মহাস্থানে প্রাপ্ত মৃৎফলকে যুগল চিত্রে রমণীও একটি কারুকার্যখচিত রাজমুকুট পরিধান করেছে (চিত্র নং- ১৬)। হরগৌরী চিত্রে রমণী ভারী ও নকশা বিশিষ্ট মুকুট

পরিহিতা তা চিত্র নং- ৩১ক এ পরিদৃষ্ট। তাছাড়া রমণীদের গোলাকার বড় কুন্ডল বা কানবালা লক্ষ্য করা যায় পাহাড়পুর মৃৎফলক চিত্রে এবং ভাস্কর্যে। যেমন 'তারা' মূর্তিতে এ ধরণের কুন্ডল পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৪২গ)। 'যমুনা' দেবী ও তার সহচরী বৃহৎ গোলাকার কুন্ডল পরিহিতা (চিত্র নং- ২৩)। এছাড়া দম্পত্তি যুগল চিত্রে রমণী এবং নৃত্যরতা রমণী কানে কুন্ডল পরিহিতা (চিত্র নং- ২৮ ও ২৭ক)। কৃষ্ণের সহচরী রমণী কানে ফুল আকৃতি কানবালা পরিহিতা (চিত্র নং- ৪৪খ)। যুগল দম্পত্তি চিত্রে রমণীর ডান কানে লম্বা ঝুলনু অলঙ্কার লক্ষ্য করা যায়। ঝুলনু এেবং গোলাপ ফুলের মত তার কুন্ডলের শেষ প্রান্তের আকৃতি (চিত্র নং- ২৮)। তদ্রুপ ময়নামতীতে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রমণী ফুলের নকশাওয়ালা কুন্ডল পরিহিতা (চিত্র নং- ৪৮ক)। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত দম্পত্তি যুগল চিত্রে রমণী কর্ণে বৃহৎ গোলাকৃতি কুন্ডল পরিহিতা (চিত্র নং- ১৬)। সে একটি সোনার পেঁচানো হার ও পরিধান করেছে। অপর একটি মৃৎফলকে গৌরীর কানে রয়েছে গোলাপ আকৃতি বিশেষ কানদুল এবং তার গলায় একাধিক হার দেখা যায় (চিত্র নং- ৩১ক)। অপর একটি ফলকে নাগিনী বড় আকৃতির ফাঁপা গোলাকার মোটা কুন্ডল কানে পরেছে, সম্ভবতঃ তা ধাতব বস্তুর তৈরী (চিত্র নং- ২০খ)। ময়নামতীর প্রাপ্ত মৃৎফলকেও রমণীদের বৃহৎ গোলাকৃতি কুন্ডল এবং গোলাপ ফুল আকৃতির কানদুল ব্যবহার করতে দেখা যায়। সুতরাং বৃহৎ কুন্ডল এবং গোলাপ আকৃতির নকশা বিশিষ্ট কানদুল প্রাচীন বাঙাঁলী রমণীরা প্রায় অনেকেই ব্যবহার করেছে বলতে হয়। ময়নামতীর মৃৎফলক থেকে রমণীদের গলায় ব্যবহৃত হারের নিদর্শনও আছে। সে সময় অধিকাংশ রমণীরাই শিকল বা দড়ির মত গোলাকৃতি ঝুলনু হার পরত।

পাহাড়পুরের প্রাপ্ত নৃত্যরত রমণীদের গলার পরিহিত নেকলেস বা হার একই প্রকার গুটিকা বা মুক্তা দিয়ে গাঁথা (চিত্র নং- ২৬ ও ২৭ক)। দাঁড়ানো রমণী(চিত্র নং-২৮, এবং (চিত্র নং- ৩১খ) এ চিত্রিত মস্তকবিহীন রমণী শুধু মুক্তা দিয়ে গাঁথা মালা পরেছে। চিত্র নং- ২৫ এবং চিত্র নং- ২৪ এ শিবের দলীয় চিত্রের রমণী এবং চিত্র নং- ২৩ এ যমুনার সংগী রমণীর গ্রীবায় দেখা যায় দুই সারি মুক্তার গাঁথা মালা। যমুনাকেও

একগুচ্ছ ছোট মুক্তা অথবা গুটিকার গাঁথা কেন্দ্রে অলঙ্কার বিশিষ্ট হার পরতে দেখা যায়। তবে ৩২নং চিত্রে দাঁড়ান রমণীর হার ফুল আকৃতির। (চিত্র নং- ৪৩খ) এর গন্ধর্বের সংগী রমণীর পরিহিতা হার এবং (চিত্র নং- ২৭খ) এর রমণীর গলার হার সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। বলরামের রমণী সংগীর গলায় যে হারটি লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং- ৪৪ক) তা চরকা আকারের। পাহাড়পুর মৃৎফলকে উৎকীর্ণ রমণীদের বাহুতে কেয়ূর পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ২৭খ) এবং (চিত্র নং- ৪৩ক)। প্রথম চিত্রে রমণীর কেয়ূর ফুল আকৃতি, তবে নকশাটি অস্পষ্ট, দ্বিতীয়টির পরিহিত কেয়ূরের কেন্দ্রে চক্র আকৃতির অলঙ্কার লক্ষণীয়। যুগল ভাস্কর্যের রমণীর বাহুতেও অনন্ত বা কেয়ূর দেখা যায় (চিত্র নং- ২৮)।[১] মহাস্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রে রমণী বৃহৎ পাখির পালক সদৃশ কেয়ূর বাহুতে পরিহিতা (চিত্র নং- ১৯খ)। পাহাড়পুর মৃৎফলকে 'তারা'র চিত্রে দেখা যায় দেবী হাতে চুড়ি পরিহিতা। তদ্রুপ যমুনা দেবীর সহচরীর হাতে চুড়ি বা বলয় এবং মহাস্থানের যুগল চিত্রে রমণীর হাতে চুড়ি বা পুরু বালা লক্ষ্য করা যায়। পাহাড়পুরের চিত্রিত রমণীর অঙ্গে কটিবন্ধ বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। উচ্চমানের অলঙ্কৃত কটিবন্ধ দ্বারা পাহাড়পুর ফলকে উৎকীর্ণ রমণীরা ভূষিত থাকত। যমুনার পরিহিত দুটি মেখলা অলঙ্কৃত কীলকযুক্ত তবে তার সংগী রমণীর কটিবন্ধ কীলক বিহীন। অপর একজন রমণীর কটিবন্ধ বা মেখলা দুসারি বিশিষ্ট গুটিকা দিয়ে তৈরী উপরের সারিতে গোলাকৃতি গুটিকা এবং নীচের সারিতে ডিম্বাকৃতি গুটিকা (চিত্র নং- ২৮)। নৃত্যরতা ভঙ্গিমায় রমণী শিকলের নকশা বিশেষ কটিবন্ধ পরিধান করেছে, যা (চিত্র নং- ২৭ক) তে পরিদৃষ্ট হয়েছে। প্রাচীন বাংলার প্রত্নবিদর্শন মৃৎফলক, ভাস্কর্য, চিত্রকলাগুলি তৎকালীন বঙ্গ রমণীদের পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার এর ব্যবহার ও সৌন্দর্য চর্চার সাক্ষ্য বহন করেছে।[২] মহাস্থান প্রত্নভূমি হতে যে কয়েকটি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় নারী মূর্তিগুলির সর্বাঙ্গে স্থূল অথচ বিচিত্র আয়তন ও আকৃতির অলঙ্কার,

---

১ Shahanara Hussain, E.L.P.E., pp. 113-114.

২ N. Ahmed, Mahasthangarh, (Karachi: 1964), p. 43.

কেশভার সুপ্রচুর এবং নানা আকারে ও ভংগীতে সেই কেশের বিন্যাস। বসন স্হূল অথচ সমৃদ্ধ এবং সমসাময়িক রুচি অনুযায়ী সুবিন্যস্ত। মনে হয় রুচি সংস্কৃতি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে আদিম কৌম মানুষের স্হূলত্ব তাদের মাঝে ছিল অথচ আলঙ্কারিক ঐশ্বর্যে, সৌকর্যে তাদের সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। সমাজ বিবর্তনের প্রতিটি স্তরের ছবিই ধরা পড়েছে পোড়ামাটির ফলকগুলিতে, বিশেষতঃ নারী মূর্তিগুলিতে।[১]

খ্রীস্টীয় যুগের সূচনাকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং গ্রেকোরোমান বিশ্বের সাথে সমুদ্র পথের বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে একটি জাতিগত অন্তঃপ্রবাহ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সকল স্তরে প্রযুক্তিগত ও সংস্কৃতিগত অগ্রগতি সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে বেশ ও ভূষণে নতুন রীতি ও ধারার সূচনা হয়। এ সময়ের মৃৎফলকে উৎকীর্ণ বাঙালী রমণীরা শাড়ী পরত। কখনো তাদের নাভির গভীর ছিদ্র অনাবৃত থাকত। তাদের শাড়ীর কিয়দংশ সামনের দিকে ভাঁজ দিয়ে রাখা হত যা দোদুল্যমান মনে হত। তারা কখনো হাঁটুর উপর পর্যন্ত শাড়ী পরিহিতা থাকত এবং তা একটি কটিদেশে বিস্তৃত বন্ধনী দ্বারা আঁটসাঁটো হত। কোমড় বন্ধের রেশমী কাপড়গুচ্ছ কখনো ফুল দ্বারা নকশা করা থাকত। অনেক সময় সূক্ষ্ম সূচীকর্ম বা গুটিকা দ্বারা তৈরী কটিবন্ধ কটিতে সংযুক্ত করে দুপায়ের মধ্যস্থানে ঝুলিয়ে দিত।

গুপ্ত আমলের পোড়ামাটির ফলক বাংলায় খুব সামান্য ভগ্নাবস্হায় পাওয়া যায়। এ কারণে এই আমলের পোষাক পরিচ্ছদের কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা সমকালীন ফলকগুলিতে পাওয়া দুস্কর। যে ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে তাতে রমণীর বেশ ও ভূষণের মান, প্রকার ও পরিধেয়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট এ স্বর্ণ যুগের পরিচয় দেয়। রমণীরা স্বচ্ছ শাড়ী পরত। যা দেহের সাথে লেগে থাকত। ভেজা কাপড়ের মত বসনের সুন্দর ভাঁজ রমণীর রূপ লাবন্যকে প্রকট করত।[২]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ ৪০৫-৪০৬।

২ N.K. Battasali, <u>Monograph of the Buddist and Brahmanical Sculptures in Dacca Museum</u>. (Dacca, 1929), pp. 10-15.

পাল প্রারম্ভিক কালে রমণীদের দেহ সূক্ষ্ম বসন তাদের শরীরের উপর অংশ প্রায়ই অনাবৃত থাকত। তবে তাদের অলঙ্কার সাজসজ্জা চোখে পড়ে। রমণীদের নিম্নাঙ্গের পরিধেয় সাধারণতঃ শাড়ী। তবে বহু ভাস্কর্যে পেটিকোট সদৃশ পোষাক দেখা যায়। পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে সেগুলি পেটিকোট নয়। বর্তমান যুগের তুলনায় ভিন্ন ধাঁচে শাড়ী পরত তারা। আধুনিক বাঙ্গালী রমণীরা দীর্ঘ শাড়ী পরিধান করে এর একটি অংশ পেটিকোটের মত জড়িয়ে কিছু অংশ ভাঁজ তৈরী করে কোনাকুনি উপরে উঠে বাম কাঁধকে আবৃত করে, শেষাংশ মস্তক ঢাকার জন্য অথবা পেছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। কিন্তু প্রাচীন রমণীরা শাড়ী কোমরেই জড়িয়ে শেষ করত। তা দিয়ে বক্ষদেশ আবৃত করত না।[১] তাই হয়তো তাদের পরিহিত শাড়ী আমাদের কাছে পেটিকোট বলে মনে হয়।

মহাস্থানগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘরে রক্ষিত মা ও শিশু উৎকীর্ণ রমণীটির চিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য (চিত্র নং- ৫৩ক)। রমণী শাড়ী পেছনের দিকে ভাঁজ বা জোড়া এবং তলপেটের চতুর্দিকে পেঁচিয়ে মনোরমভাবে পরিহিতা। চিত্রে রমণীর নাভি এবং পেট সামনের দিকে স্ফীতভাবে উন্মুক্ত।[২] রমণীদের কোমরের উপর অংশ অনাবৃত থাকলেও রমণীরা দেহে সংকীর্ণ কাপড় দ্বারা কখনো স্তন সম্পূর্ণরূপে আবৃত এবং স্তন আংশিক আবৃত করত। কিছু সংখ্যক রমণীকে দেহে একখন্ড কাপড় গীট দ্বারা স্তন বাঁধতে বা আবৃত করতে দেখা যায়। এরূপ কাপড় খন্ড দ্বারা বক্ষবন্ধনী পাহাড়পুর মৃৎফলকে বেশী গোচরীভূত হয়। যেমন শিবের বিষপান দৃশ্যে শিবের বামপার্শ্বে দাঁড়ানো প্রথম রমণীর উপরের অংশে একখন্ড কাপড় বক্ষবন্ধনী রূপে দেখা যায় (চিত্র নং- ২৫)। কিন্তু 'তারা' দেহের উপরের অংশে শাল ব্যবহার করেছেন (চিত্র নং- ৪২গ)। এ সময়কালের রমণী দেহ অলঙ্কার দ্বারা শোভিত থাকত। প্রকৃতপক্ষে অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি ও ক্রমোন্নতি লক্ষ্যে দেহ মূর্তিগুলি পাল আমলের বলে নির্ণয় করা যায়। পাহাড়পুরের প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্যগুলির রমণী দেহে পরবর্তীকালের রমণীদের

---

১ S. Alam, <u>op.cit.</u>, p. 138.

২ Stella Kramrsch, <u>The Art of India</u>, 1965, p. 21.

অপেক্ষা স্থূল অলঙ্কৃত। তবে হাতে অনন্ত, মল, বলয়, ব্রেসলেট প্রভৃতি রমণীদের সাধারণ ভূষণ হিসেবে দেখা যায়। সাধারণত গলার হার রমণীদের ব্যবহৃত ব্রেসলেটগুলি অত্যন্ত ভারী ও পুরু হত। একটি সংযুক্ত সমতল বন্ধনীযুক্ত এবং দীর্ঘায়িত ঝুলন্ত হার স্তনের উপর বা নীচ পর্যন্ত রমণীরা পরত। রাজমুকুট পাল ও সেন পর্বে ভাস্কর্য চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোন কোন রমণী মাথায় রাজমুকুট পরত। তবে সাধারণ মুকুট দিয়ে কেবলমাত্র মাথা আবৃত করার রীতি রমণীদের মাঝে প্রচলিত ছিল।

মহাস্থানগড়ের যাদুঘরে রক্ষিত কাল পাথরের খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকের দম্পত্তি ভাস্কর্যে পুরুষ ও রমণী পাশাপাশি দুটি পৃথক পদ্ম আসনের উপর দন্ডায়মান। রমণী মূর্তিটির বাম হাতে একটি মনিমুক্তার আধার দেখা যায় কিন্তু ডান হাত সম্ভবতঃ উদ্ধার করা যায়নি। যুগল মূর্তির উভয়েই প্রচুর অলঙ্কার পরিহিতা[১] (চিত্র নং- ৫৩খ)।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতক হতে আরম্ভ করে খৃঃ একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-দেশে এবং বাংলার বাইরে বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত লিপি লেখন, পট্টোলী, প্রশস্তি পাওয়া গেছে তার সংখ্যা অন্যূন একশত চৌত্রিশ। প্রায় সহস্র বৎসর ধরে বাঙ্গালী কবি পন্ডিত, রাজকবি, বা রাজানুগ্রহভাজন পন্ডিত কবিগণ সংস্কৃতে যে সমস্ত লিপি প্রশস্তি রচনা করেছেন। গুপ্ত পাল সেন যুগে সর্বত্রই সংস্কৃত লিপি প্রশস্তি রচিত হয়েছে। লিপি লেখনের ভাষায় বিশুদ্ধ গৌড়ীয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। উমাপতিধর লক্ষণ সেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন। তিনি রাজশাহী জেলার দেওপাড়া গ্রামের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির গাত্রে ৩৫টি শ্লোকযুক্ত একটি প্রশস্তি রচনা করেছেন। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' ও কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে (সুভাষিতরত্নকোষ) বাঙ্গালী কবির যে সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতা বা শ্লোক পাওয়া গেছে, তার সূচনা এই সমস্ত শিলা-লিপিতেই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকের আকারে কোথাও শিলালিপি বা তাম্র পট্টোলীতে বা সুস্ত গাত্র ও মন্দির চত্বরে, কোথাও বা কোষ কাব্যে বাঙ্গালী কবির সংস্কৃত

---

১ S. Alam, <u>op.cit.</u>, p. 160.

ভাষায় কাব্য চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল।[১] এভাবেই বাঙ্গালীর সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার প্রকৃষ্ট নিদর্শন শিলালিপি ও তাম্র পট্টোলীতে নানা স্হানে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। বাংলাদেশে লিপি লেখনে যে জাতীয় ভাষা চাতুরী ব্যবহৃত হত, দেওপাড়া লিপিতে তার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ মেলে। শ্লোকগুলিতে ভাষা চর্চার বাহুল্যতার পাশাপাশি রমণীদের বেশ ও ভূষণের অপূর্ব বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

বিভিন্ন শাসন আমলের সাহিত্য চর্চার আলোচনায় দেখা যায়, মৌর্য যুগে বাঙ্গালীর সাহিত্য সাধনার তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। এমনকি অশোকের শিলালিপির একটিও বাংলাদেশে আবিস্কৃত হয়নি। বাংলাদেশে আর্য ভাষায় রচিত প্রাচীনতম লেখনী পাওয়া গেছে মহাস্হানগড়ে। লিপিটি খন্ডিত ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ। অনুমিত হয় লেখাটি মৌর্য যুগের। আনুমানিক খ্রীঃপূর্ব তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় শতকে তা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু অপূর্ণ এবং লুপ্তপ্রায় এই লেখার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অপর একটি লিপি শুশুনিয়া পর্বতে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ হয়েছে। রাজা চন্দ্রবর্মা লিপিটির উৎকর্তা। প্রত্ন বিশারদদের মতে এটির লিপি-কাল খ্রীঃ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী। এছাড়া গুপ্তযুগের এমন অনুতঃ আটটি তাম্রলিপি পাওয়া গেছে, যাদের লিপিকাল ৪৪৩ থেকে ৫৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।[২]

লিপিমালার বিশ্লেষণে দেখা যায়, একটি উল্লেখযোগ্য লিপি ৩য় বিগ্রহপালের আমগাছি তাম্রলিপি। এর ৮নং শ্লোকে সেকালের বিভিন্ন প্রকার পোষাকের উল্লেখ আছে, যা উজ্জ্বল পাথর দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং সূর্যের আলোতে অত্যন্ত দ্যুতিময় বলে মনে হয়।[৩] বিজয়সেনের দেও-পাড়া প্রশস্তিতে আরো বর্ণিত হয়েছে, লজ্জাশীলা দেবী মস্তক হতে ফুলের মালা টেনে নেয়

---

১ শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৯।

২ শ্রী ভূদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৩ Tapo Nath Chakravarty, "Women in the Early Inscriptions of Bengal", B.C. Law Vol. Part. II, p. 258.

তার বক্ষসুনের নগ্নতাকে ঢাকবার জন্য। একই প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে, স্বর্গ লোকের অপ্সরাদের বক্ষাদেশে গাঢ় পীতবর্ণের রেখা অংকন (শ্লোক -১২) এবং সাধারণ গৃহবধুরা তাদের স্তন কস্তুরী দ্বারা রেখা অংকন করতো (শ্লোক-২৭)।[১] ৩১ নং শ্লোকে রমণীদের চন্দন গুঁড়া ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।[২] ভাগলপুর তাম্রলিপির ১৬নং শ্লোকে নারীদের গলায় অলঙ্কার হিসেবে ফুলের মালা এবং ফুল দ্বারা আচ্ছাদিত করার কথা।[৩] কেশব সেনের ইদিলপুর লিপি, বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপি এবং সমসাময়িক অন্যান্য লিপির সাক্ষ্য একত্র করলে মনে হয়, অভিজাত নারীরা বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীরা প্রতি সন্ধ্যায় নদী বা দীঘিতে যাওয়ার সময় প্রসাধন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে শোভিত রূপে বিরাজ করতো। তদ্রুপ বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে বিভিন্ন বর্ণের রমণীদের পোষাকের উল্লেখ আছে (শ্লোক নং-৩০)।[৪] আবার একই লিপিতে আমরা নানান ধরণের রেশমের কাপড়ের টুকরোর কথা জানতে পারি (শ্লোক নং- ৩১)।[৫] বক্ষসুনের কর্পুর ও মৃগনাভি লাগানোর কথা জানা যায় বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে। এ প্রশস্তিতে নানা প্রকার ক্ষৌম বস্ত্রের উল্লেখ সে কালের রমণীদের বেশ-ভূষনের ধারণা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে।[৬] কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রলিপি এবং বিজয় সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে বারবণিতাদের পায়ের মল ব্যবহারের কথা বলা

---

১ Tapo Nath Chakravarty, <u>op.cit.</u>, pp. 52-55.

২ <u>Ibid.</u>, p. 56.

৩ Ibid., pp. 255-56., নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২৮৬।

৪ N.G. Majumdar, <u>Inscriptions of Bengal</u>, Vol.III,(Rajshahi, 1929), p.55.

৫ <u>Ibid.</u>, p. 56.

৬ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২৮৭।

হয়েছে। এতে উল্লেখ আছে, নর্তকীদের পায়ের মল বা পাইজর থেকে সুমিষ্ট আওয়াজ হত।[১] দেওপাড়া প্রশস্তিতে বিজয়সেন উল্লেখ করেছেন, রমণীদের মূল্যবান পাথরের গুটিকার তৈরী হার, কানবালা, কুন্ডল, মল, পাইজর, এবং পুষ্পখচিত স্বর্ণালী ব্রেসলেট ব্যবহারের কথা। একই প্রশস্তির ৩১নং শ্লোকে নীলকান্তমণি খচিত ফিতার কথা উল্লেখ আছে।[২] কেশব-সেনের ইদিলপুর লিপির ৯নং শ্লোকে ও বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য পরিষদ লিপিতে উল্লেখ আছে যে সন্ধ্যায় সভা নন্দিনীদের নুপুর ঝংকারে সভা ও আমোদ গৃহগুলি মুখরিত হতো। নারীরা চোখে যে কাজল লাগাতো তার ইঙ্গিত আছে দামোদরদেবের চট্টগ্রাম লিপিতে এবং অঙ্গে রং ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে মদনপালের মনহলি লিপিতে। সমসাময়িক লিপি ও সাহিত্যে যেমন রমণীদের খোঁপায় ফুল গুঁজে বিলাস প্রসাধনে অঙ্গ সজ্জার কথা বলা হয়েছে তেমন বিধবা হলে নারীদের সীমান্তের সিঁদুর ব্যবহার না করার কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায় দেব-পালের নালন্দা লিপিতে, মদনপালের মনহলি লিপিতে, বল্লাল সেনের অদ্ভুত সাগর গ্রন্থে, গোবর্ধনাচার্যের শ্লোকে।[৩] কেশব সেনের কলিকাতা সাহিত্য পরিষদ লিপির ১০নং শ্লোকে সংগীত শিল্পীদের সভায় নুপুরের ছন্দের ধ্বনির কথা উল্লেখ আছে। যার বর্ণনা লক্ষণ সেনও দিয়েছেন।[৪] দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে শতাধিক কুমারীর গহনায় ভূষিত দৈহিক সৌন্দর্যে শোভনীয়তার কথা জানা যায়।[৫] লক্ষণ সেনের মাধাইনগর তাম্রলিপি সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, রাজ পরিবারের অন্তপুরবাসিনী নারীদের মুকুট ও অন্যান্য রত্নাদি ব্যবহারের কথা।[৬]

---

১ N.G. Majumdar, op.cit., p. 127.

২ Ibid., p. 56.

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

৪ S.Hussain. E.L.P.E., p. 170.

৫ N.G. Majumdar. op.cit., p.55.

৬ Ibid., p. 114.

ভোজবর্মণ তার বেলাভ তাম্রলিপির ১২নং শ্লোকে রাজকীয় হারেমের কথা বলেছেন।[১] অপর একজন কবি লক্ষিধর বাংলার কুলবধুদের বর্ণনা দিয়েছেন তার শ্লোকে। রমণীদের আচ্ছাদিত মস্তক সবসময় লজ্জায় নীচের দিকে নুইয়ে থাকতো। রমণীরা চলার গতি মন্থর এবং চোখ পায়ের পাতার দিকে স্থিরভাবে অবনত করত। তাদের কথাবার্তা সুমধুর এবং নমনীয় হত, জোরে কথা বলা সে যুগের পরিবারের মান মর্যাদা হানীর বিষয় ছিল।[২] এ থেকে তখনকার রমণীদের শান্ত-সুন্দর এবং সুশোভন চরিত্রের প্রকাশ পায়।

প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের বহু তথ্য সম্বলিত চিত্রিত পান্ডুলিপি অষ্ট-সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এই পুঁথিতে অঙ্কিত বজ্রযান-তন্ত্রযান মতোক্ত দেবদেবীর ছবি ব্যতীত আর কোন প্রকার চিত্রের সমাবেশ হয়নি। এগুলির মধ্যে রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে ও হরিবর্মার ১৯শ বর্ষে লিখিত দুইখানি অষ্টসাহস্রিকা এবং হরিবর্মার ৮ম বর্ষে লিখিত একখানি পঞ্চবিংশতি। সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি উল্লেখ করা যেতে পারে। রামপালের সময়ে লিখিত, অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথিখানিতে যে কয়েকটি ছবি আছে, তাতে সাধারণ কয়েকটি বর্ণ এবং সূক্ষ্ম রেখা পাতের সাহায্যে শিল্পী এই সমুদয় চিত্রের মধ্যে একটি লীলায়িত মাধুর্য ও অনবদ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছেন।[৩]

মহাযান ও বজ্রযানে উপাস্য দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা, মারীচী, পর্ণশবরী, চুন্ডা ও জ্ঞারীতি, 'তারা' উল্লেখযোগ্য। প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর ছবি পুঁথির আচ্ছাদনের উপর উজ্জল ও নানা রঙে চিত্রিত আছে। পদ্মাসনে আসীনা দেবীর মুখমন্ডলে জ্ঞানের দীপ্তি। তাঁর

---

১ M.G. Majumdar, op.cit., p. 23.

২ S. Hussain, E.L.P.E., p. 171.

৩ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

এক হস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রা অপর হস্তে মজনমুদ্রা দেখা পাওয়া যায়।[১] একজন দেবী বজ্র-পর্যঙ্কে উপবিষ্টা, উর্দ্ধাংশে সহজ ভঙ্গিমা। গায়ের রং ধূসর (চিত্র নং- ৫৪)। তাঁর ডান হাত বুকের কাছে লগ্ন বামহাত কোলের উপর ন্যাস্ত। ডান হাতের মাঝ দিয়ে উঠেছে একটি সনাল প্রস্ফুটিত পদ্ম। দেবীর শির ঘিরে আছে প্রভা। পুষ্পখচিত কেশদাম, ফুলওয়ারী কুঞ্চক আর ডুরে শাড়ী। নীল রঙের পশ্চাৎপট অঙ্কিত চিত্রটি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যালারীতে রক্ষিত।[২] অপর একটি চিত্রে মৃত্যুরঞ্জন 'তারা' দেবীকে দেখা যায়। বজ্রপর্যাঙ্ক আসীনা দেবীর এইরূপ উর্দ্ধাংশে সহজ ভঙ্গিমা। তার গায়ের রঙ ধূসর। ডান হাত বরদ মুদ্রা বাঁ হাতে নীলোৎপল (চিত্র নং- ৫৫)। চাঁচর কেশদামে রত্নময় বেষ্টনী। পরনে ফুলওয়ারী সাদা শাড়ী। রেখাবর্তনা আর বর্ণ-বর্তনার সৌকর্য লক্ষণীয়।[৩] অনুচিত্রে অপর দেবী মারীচীকে হলুদ রংয়ের পায়জামা পরিহিতা দেখা যায়, তার এই বসন পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত দীর্ঘায়িত। লাল এবং সবুজ রংয়ের বিন্দু বিন্দু নক্সা পায়-জামায় খচিত (চিত্র নং- ৫৬গ)। রমণীর পায়জামা কটিতে অলঙ্কৃত কটিবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ। দুইটি ফিতা তার জানুদেশে ঝোলানো এবং একটি সামনের দিকে ঝুলন্ত। অপর চিত্রটি মহাসাহস্রপ্রমর্দনী দেবীর, দেবী দাঁড়িয়ে আছেন, প্রত্যালীর পদে (চিত্র নং- ৫৬খ)। গায়ের রঙ ধূসর। দেবীর পরনে নীল রংয়ের উপর হালকা লাল ফুলওয়ারী শাড়ী এবং সাদা দেবী কটিতে কটিবন্ধনী নাভির নিম্নে থেকে পরেছেন। উল্লেখিত দেবীদের অঙ্গে অলঙ্কারের বাহুল্যতা বর্তমান, তাঁর কর্ণে বৃহৎ ঝুলন্ত গোলাকার কুন্ডল। গলায় হার, বাহুতে কেয়ূর, রাজমুকুট ছাড়াও নানা ধরণের রঞ্জিণ পাথর খচিত চুড়ি, ব্রেসলেট পরেছেন। 'তারা' দেবীর হাত লাক্ষা দ্বারা রঞ্জিত। দেবী বক্ষবন্ধনী পরিহিতা। মলও তাঁদের পায়ে লক্ষ্য করা যায়। কেশবিন্যাসের রীতি আকর্ষণীয়। বৃহৎ খোঁপা শিরে বেঁধে, এলো খোঁপা

---

১ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

২ সরসী কুমার সরস্বতী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

৩ তদেব, পৃ. ১৪-১৫।

বেঁধে অলঙ্কার দ্বারা তাঁরা সজ্জিত ও কোমনীয় হতেন। ১ দেবীদের উপর বসন হিসেবে সুন্দর হাতওয়ালা ব্লাউজের ব্যবহার তাঁদের অঙ্গে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (চিত্র নং- ৫৪)।

পাল ও সেন আমলের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রগুলি এবং লিপিমালা হতে রমণীদের বেশ ও ভূষণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া ছাড়াও প্রাচীন বাঙালী নারীর চিত্তাদর্শের পরিচয় লাভের জন্য এগুলি আমাদের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎস।[১] পাল পর্বের চিত্রিত পান্ডুলিপিতে নারী ও পুরুষের পরিহিত বসনে বর্ণ ও নকশার সমাহার প্রাচীন যুগের মানুষের শিল্পগুণেরই বহিঃপ্রকাশ। নানান আকৃতিতে মুদ্রিত ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাপড়ের ব্যবহারের কথা আমরা জেনেছি। তার কিছু নমুনা ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সেকালের মানুষের রুচির ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিকাশ তাদের পরিহিত এই বৈচিত্রমুখী পোষাক পরিধানের মধ্যে দিয়ে (চিত্র নং- ৫৭ক ও খ), (চিত্র নং- ৫৮ক ও খ), (চিত্র নং- ৫৯ক, ও খ) এবং (চিত্র নং- ৬০ক ও খ)। প্রাপ্ত পান্ডুলিপি চিত্রের উল্লেখিত কাপড়ের দৃষ্টান্ত প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর এবং সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে দুর্লভ উপকরণ। মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত স্বর্ণালঙ্কারের ছাঁচ (চিত্র নং- ২১খ), তাম্রবিহারে চিত্রিত রাজহংসের ঠোঁটে পাথরের গুটিকার মালা (চিত্র নং- ৬১ক), চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত হংসের ঠোকরানো পায়ের মল (চিত্র নং- ৬১খ) রমণীদের ব্যবহৃত অলঙ্কারের তথ্য প্রদান করে। এছাড়া নানান রীতিতে কেশবিন্যাস, অলঙ্করণের চিত্র, হার, কুন্ডল, কেয়ূর ও মুকুটের চিত্রিত নিদর্শনগুলি (চিত্র নং- ৬২) বাঙালী রমণীর ভূষণ প্রসাধনের তথ্যের সন্ধান দেয় যার ব্যবহার আদিকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত রমণীদের চিরাচরিত প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করতে হয়।

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২।

চতুর্থ অধ্যায়

সাহিত্যিক সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণ ঃ

ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি, অভিযোজন ক্ষমতা এবং সবাক্ ভাষা এই তিনের সমন্বয়ে মানব জীবনের বিকাশ শুধু প্রয়োজনের মধ্যেই সীমিত থাকেনি, তা মানুষের সামগ্রিক ঐতিহ্যে, সামাজিক সংগঠনে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্প নৈপুণ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে। বিশেষতঃ সমাজের বস্তুধর্মী গঠন তাৎপর্যকে তথা জীবনচর্যাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করে সাহিত্যিক সর্বাঙ্গীণ মানব সমাজকে অনুধাবন করতে চেয়েছেন এবং আপন চেতনার মধ্য দিয়ে সার্বজনীনতাকে রূপ দিয়েছেন প্রাচীনকাল থেকেই।[১] মানব সমাজের সাথে সাহিত্যের পারস্পারিক যোগসূত্রের কথা স্পষ্ট হয় এই উক্তিটি থেকে, "Society bas been compared by Cowell to the oyster and literature to the pearl within it. Society is the soil from which the flower of literature springs". অর্থাৎ Cowell সমাজকে ঝিনুকের এবং সাহিত্যকে তার ভিতরের মুক্তার সাথে তুলনা করেছেন। সমাজ হচ্ছে মাটি যেখানে সাহিত্যের ফুল প্রস্ফুটিত হয়। মূলতঃ সামাজিক ও লৌকিক প্রত্যক্ষ জীবনের অনিবার্য ছায়াপাত সাহিত্যের মাঝে। একজন সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক মানুষের চলমান জীবনযাত্রার বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে তাঁর শিল্পের বিষয় করে তোলেন, যা ভিন্ন সাহিত্যের ধারা হয় ক্ষীণ।[২] সুতরাং সমাজ জীবনের বস্তু ও ভাবসামগ্রীর বৈচিত্র সাহিত্যের উপাদানিক অবলম্বন। আবার বলতে হয় সাহিত্য শুধু উপাদানেই প্রতিষ্ঠা পায়না, সাহিত্যে যেমন আছে ভাববস্তু তেমন আছে রূপরীতি, রয়েছে শিল্পসৌকর্য ও সৌন্দর্য চেতনা। যাই হোক সমাজের অবস্থিতিতে সাহিত্যের অস্তিত্ব অবশ্যাম্ভাবী, সমাজ সম্পর্ক শূন্য সাহিত্য কল্পনাতীত।

---

১ প্রদ্যোত সেন গুপ্ত, <u>বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য</u>, (কলিকাতাঃ সাহিত্য শ্রী, ১৯৭৬), পৃ. ৩-৪।

২ Q.P. Bhatnagar, <u>Studies in Social History</u>, p. 311; উদ্ধৃতি, প্রদ্যোত সেন গুপ্ত, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৯।

প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের সাহিত্যিক সাক্ষ্য বাংলার শিল্প সংস্কৃতি, জীবন ও ভাবধারা, রুচি ও সৌন্দর্য জ্ঞানের পরিচয় দেয়, যার সুবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় সেকালের কাব্য সাহিত্যে। প্রাচ্য প্রাকৃত ও উত্তর এবং মধ্য ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন সাহিত্য কাব্যগ্রন্থগুলি সে যুগের সমাজ জীবনের অপূর্ব আলেখ্য। তবে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থের বিশ্লেষণের পূর্বে প্রথমে আমাদের সাহিত্যের আদি উৎসগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। জানা যায় খ্রীস্টীয় শতকের কিছু আগে হতেই মৌর্য আমল হতে গোড়ার দিকে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে ক্রমশঃ পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসার হয়। পরবর্তীতে প্রাচীন সংস্কৃত থেকে পালি ও প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার প্রচলন ঘটে, কিন্তু এ ভাষার বিশেষ কোন সাহিত্যিক নিদর্শন বর্তমানে নাই।[১] কেবলমাত্র উত্তরবঙ্গের মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বাংলার সর্ব প্রাচীন ব্রাহ্মী ভাষায় লিখিত শিলালিপি খণ্ডটিকে মৌর্য যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে ধরা হয়।[২] এর কয়েক শতাব্দী পরে চতুর্থ শতকের শুশুনিয়া পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্মার লিপি এবং গুপ্তযুগের পঞ্চম ষষ্ঠ শতকের কয়েকটি গুপ্তবংশীয় রাজকীয় পট্টোলী পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে এই প্রত্যেকটি লিপিই গদ্যে রচিত হলেও সাহিত্যরসের কোন আভাস রচনাগুলিতে নাই।[৩] যুগ অনুযায়ী বিচার করলে গুপ্তযুগের পূর্বে প্রাচ্য অঞ্চলে অর্থাৎ গৌড়, অঙ্গ, বঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশেষ কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না।[৪] বস্তুতঃ সপ্তম শতকীয় লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী বা কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার নিধনপুর পট্টোলীর আগে সমসাময়িক মধ্য ভারতীয় অলংকার বহুল কাব্যরীতির কোন পরিচয়ই বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ এ সময়ের আগে বাঙালী পণ্ডিত সমাজ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণধারার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি। তবে আরও কয়েক শতাব্দী আগে হতেই বৌদ্ধ সংঘারাম

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

২ Epigraphia Indica, XXI, PP. 81-91.
নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

৩ তদেব, পৃ. ৩৫৬।

৪ শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২।

এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম কেন্দ্রগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ শিক্ষায়তন হয়ে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল।[১] পাল রাজগণের বহুসংখ্যক তাম্রশাসনের সংস্কৃত শ্লোক থেকে প্রমানিত হয় যে, এ সময়ে সংস্কৃত চর্চা প্রসার লাভ করে। রাজ্যশাসন ব্যবস্থা, ধর্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির কথা বিক্ষিপ্ত-ভাবে অসংখ্য লিপিমালায় উৎকীর্ণ হয়েছে। পাশাপাশি কাব্য সাহিত্যে সমাজচিত্রের বহিঃ-প্রকাশ ঘটেছে। সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যে নারী চরিত্রগুলিতে সমাজের সংস্কৃতিগত ও আদর্শগত রূপ ফুটে উঠেছে।[২] সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হর্ষচরিত গ্রন্থের মুখবন্ধে বাণভট্ট সমসাময়িক ভারতবর্ষে প্রচলিত সাহিত্য রচনা রীতি সম্বন্ধে বলেছেন। সপ্তম অষ্টম শতকে গৌড় বঙ্গে যে একটি বিশেষ কাব্যরীতির প্রবর্তন হয়েছিল এবং সমস্ত ভারতে সেই রীতি সুপরিচিত ও স্বীকৃতি লাভ করেছিল তার প্রমাণ ভামহ ও দণ্ডীর সাক্ষ্য। অতএব এ তথ্য পরিস্কার যে, গৌড়জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত একটি কাব্য রীতি গড়ে তুলেছিল।[৩] সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কালের মধ্যে প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত অপভ্রংশ সাহিত্যে বাঙালী রমণীর বেশ ভূষণ ও সামাজিক ঘটনাবলীর সবচেয়ে বেশী তথ্য পাওয়া যায়। সুবিস্তৃত স্মৃতিসাহিত্য, বৃহদ্ধর্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, চর্যাগীতিমালা, দোহাকোষ, সুভাষিতরত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত ধৃত কাব্যের কিছু শ্লোকে, প্রাকৃত পৈঙ্গলের কিছু শ্লোকে, রামচরিত, পবনদূতের মত কাব্যগ্রন্থে সমসাময়িক বাঙালী জীবনের নানা তথ্য নানা উপলক্ষ্যে ধরা পড়েছে। গ্রন্থগুলির অধিকাংশ এদেশে এবং দশম হতে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে রচিত।[৪]

শ্রী হর্ষের নৈষধচরিতে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু তা সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য কিনা বিবেচনার বিষয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

২ শ্রী তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৮), পৃ. ভূমিকা।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

৪ তদেব, পৃ. ২৭৬।

বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থেও কিছু কিছু তথ্য লাভ করা যায়। এই গ্রন্থ দুইটিতে গুপ্তপর্বের বাংলার সামাজিক জীবনের কথা রচিত হয়েছে।[১] পাল আমলের ও তৎপরবর্তী কিছু কালের মধ্যে লিখিত চর্যাপদ, আর্যসপ্তশতী, গীতগোবিন্দ এবং সুভাষিতরত্নকোষ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে রমণীর পোষাক পরিচ্ছদ কেশবিন্যাস ও প্রসাধনী সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।[২]

সাহিত্যিক সাক্ষ্যের বিশ্লেষণে প্রথমেই পালযুগের কাব্যগ্রন্থ কবি সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত 'রামচরিত' এর কথা উল্লেখ করতে হয়, এটি একাদশ শতকের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। এই দুরূহ কাব্যের শ্লোক এমন সুকৌশলে লিখিত হয়েছে যে, পৃথক পৃথকভাবে বর্ণবিন্যাস ও শব্দযোজনা করলে একদিকে রামায়নের রামচন্দ্রের, অপরদিকে পাল সম্রাট রামপালের ও তদীয় পুত্র মদনপাল দেবের রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার লক্ষ্য করা যায়।[৩] গৌড়েশ্বর রামপাল যে ভীমরূপী রাবণকে বধ করে জনকভু বা জন্মভূমি বরেন্দ্রী রূপী সীতা উদ্ধার করেছিলেন, এই ঘটনাবলী নিয়ে রচিত ২২০টি শ্লোকে সমৃদ্ধ, রামচরিত একটি ঐতিহাসিক কাব্য।[৪] মোটকথা আর্যাছন্দে লেখা কাব্যটিতে এক অর্থে রামায়ণ কাহিনী বিবৃত অপর অর্থে রামপালের কীর্তিত্ব ও তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় গোপালের ও মদনপালের ইতিহাস।[৫]

শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই কাব্যের তালপত্রে লিখিত পুঁথি এবং ৩৫টি শ্লোকের টীকা নেপালে আবিস্কার করেছিলেন।[৬] প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের এক উজ্জ্বল চিত্র এই

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫-৭৬।

২ S. Hussain, Dress, Coiffure and Cosmetics of the Women of Pala Bengal, J.V.R.M., Vol. 5, ed., Mukhlesur Rahman, (University of Rajshahi, 1976-77), P. 63.

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-৩৮।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬।

৫ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৬ শ্রী সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্, শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদন সম্পাদিত, (কলিকাতাঃ দিব্যস্মৃতি সমিতি, ১৩৪৪ বং), ভূমিকা।

রামচরিত কাব্যে যেভাবে ফুটে উঠেছে তা কৌতূহলের বিষয়। গ্রন্থটি দ্বাদশ শতাব্দীর গৌড়-বঙ্গের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। বরেন্দ্র ও রামাবতী নগরীর বর্ণনা ও ভীমের সাথে যুদ্ধের বিবরণ সাহিত্যিক রস সমৃদ্ধ। উচ্চাঙ্গের কবিতা না থাকলেও রামচরিত বাঙালীর সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করে। নগর ও গ্রামবাসীর জীবন যাত্রা ও আনন্দ বেদনার কথা এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১]

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মতে "সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যটি সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সেই হিসেবে তাঁর কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য।"[২] রমেশচন্দ্রের মতে, "'রামচরিতে' বঙ্গভূমির এবং পাল রাজধানী রামাবতীর মনোরম বর্ণনা আছে।" রামাবতী বর্ণনায় কবি লিখেছেন, "এখানে নানাস্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান ও নানাবিধ পুষ্পলতায় নগরের শোভা বৃদ্ধি করত।"[৩] হীরক, মুক্তা, মরকত, মাণিক্য ও নীলমণি খচিত আভরণ, মহামূল্য বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন, কস্তুরী, চন্দন, কুমকুম ও কর্পূরাদি, গন্ধদ্রব্য নগর-বাসীর ঐশ্বর্য্য, রুচি ও ভাববিলাসিতার পরিচয় প্রদান করে।[৪] সন্ধ্যাকরনন্দী তাঁর কাব্যে পোষাক পরিচ্ছদের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন নর্তকী ও দেবদাসীদের নৃত্যগীতবাদ্যের আলো-চনার মধ্যে দিয়ে। যেমন, নর্তকীদের পোষাক হত অত্যন্ত মনোরম, তারা আভরণে অঙ্গ সুসজ্জিত করত। পায়ের অলংকার মল পরিধান করত যা নক্টার মত নূপুর বিশেষ।[৫] যে নূপুরে টুনটুন শব্দের সৃষ্টি হত নর্তকীর নৃত্যচলাকালে। এ ধরণের নূপুরকে বলা মণিকিঙ্কিণী (Manikinkini)। নর্তকীদের অনন্ত বা অঙ্গদ এবং হাতের বলয় বা বালাগুলি উজ্জ্বল নীল রত্ন বসানো যা উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত করতো।[৬] ভাষ্যকারগণ এগুলির সমার্থক শব্দ

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

২ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬।

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

৪ Rāmacaritam, III, VV. 35-36, Text and Transl, p. 104.

৫ Ibid., III,V. 37, text and tranl., 105.

৬ Ibid., II,V. 2, text. P. 40, transl. 41.

দিয়েছেন, কেয়ূর এবং কঙ্কণ। সন্ধ্যাকরনন্দী 'রামচরিতে' আরো উল্লেখ করেছেন নানা রকমের দামী নকশা বিশিষ্ট রমণীদের পোষাকের ও অলংকারের কথা যেগুলি পাথর, মুক্তা, চুনি বা পদ্মরাগমণি, পান্না, নীলকান্তমণি খচিত এবং তাদের চমৎকার হার কেন্দ্রে বৃহৎ মুল্যবান রত্ন বা গোলাকার মুক্তা বসানো থাকত।[১]

বাংলাদেশে অষ্টম শতকের দিকে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল। রামচরিত কাব্যে তাদের স্পষ্টত দেববারবনিতা বলা হয়েছে।[২] হীরা খচিত নানান সুন্দর অলংকার এবং রত্নখচিত ঘুঙুর ব্যবহারের কথা জানা যায় এ গ্রন্থে। মুক্তা, মরকত ছাড়া সোনা রুপার গহনা তারা ব্যবহার করত। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত মূল্যবান অলংকার ও বিলাসিতা সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থ রমণীদের নাগালের বাইরে ছিল।[৩] 'রামচরিতে' উল্লেখ আছে রামাবতীর সুউচ্চ মন্দির এবং বরেন্দ্রীতে অবস্থিত বিরাট জগদ্দল বিহারের কথা।[৪] একাদশ দ্বাদশ শতকের মধ্যে রামপালের পৃষ্ঠপোষকতায় বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিহারের অধিষ্ঠাতা দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন যথাক্রমে অবলোকিতেশ্বর ও মহত্তারা। বলতে হয় এখানকার বিরাট ধর্মীয় আশ্রম এবং তারা মূর্তিটিই বরেন্দ্রকে মহিমান্বিত করেছিল।[৫]

একাদশ দ্বাদশ শতকের সঙ্কলিত শ্লোক সঙ্কলন গ্রন্থের প্রাচীনতর একটি খণ্ডিত পুঁথি নেপালে পাওয়া গেছে। পুঁথিটির প্রাপ্ত অংশে কোন নাম পাওয়া যায়নি। এফ, ডবলু, টমাস সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করে বইটির 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়' নাম দিয়েছেন।[৬] এই সঙ্কলন গ্রন্থে বাঙালী রমণীর বেশ ভূষার এবং সাধারণ মানুষের গ্রামীণ জীবনের তথ্য প্রদান করে।

---

১ Rāmacaritam, III, V.37, text and trans., P. 105.

২ Ibid., text. 103, transl. 104.

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৪ Rāmacaritam, III, V.30, Text and transl. p. 101.

৫ Ibid., III, V. 7, text., P. 81, trans. P. 82.

৬ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৯৫৭ সালে ডি,ডি, কোসাম্বী এবং ভি,ভি, গোখলের সম্পাদনায় সঙ্কলিত পুঁথিটি সুভাষিতরত্নকোষ নামে প্রকাশিত হয়। বরেন্দ্রীর জগদ্দল বিহারের বৌদ্ধপাসক বিদ্যাকর এই গ্রন্থের সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং পরিবর্ধিতরূপে প্রকাশিত হয় ১১৩০ এর মধ্যেই। কোসাম্বীর মতানুসারে দেখা যায়, বিদ্যাকরের সুভাষিতরত্নকোষের খণ্ডিত অংশবিশেষ কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় নামে সঙ্কলন গ্রন্থটি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছু জানা যায় না। সুভাষিতরত্নকোষে বিদ্যাকর প্রণীত কিছু শ্লোক পাওয়া গেছে। সম্পূর্ণ সঙ্কলনটি ৫০টি ভাগে বিভক্ত এবং শ্লোকগুলি সর্বভারত প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস, রাজশেখর, ভবভূতির রচনা।[১] অনেক বাঙালী কবি যেমন, মধুশীল, বীর্যমিত্র, শ্রীধর্মকর, রতিপাল, বৈদ্যধন্য, বজ্রাতথাগত, বিনয়দেব, ভুমণ দেব, শ্রীহর্ষদেব, শ্রীরাজ্যপাল, ধরণীধর, লক্ষীধর, সুবর্ণরেখ, জয়ীক, বিত্তোক, বিদ্যোক, লালতোক, সিদ্ধোক, সঙ্কোক, হিঙ্গোক ইত্যাদি রচিত। এছাড়া উদ্ধৃত শ্লোকে অনেক বৌদ্ধ কবিও ছিলেন। যেমন, অপরাজিত রক্ষিত, কুমুদাকর মতি, জিতারি নন্দী, বুদ্ধাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি, শ্রীধরনন্দী, শ্রীপালবর্মা, সংঘশ্রী ইত্যাদি।[২] এই কাব্যে দুই-এক জন মহিলা কবির পরিচয়ও পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন ভাবাক বা ভাবদেবী ও নারায়ন লক্ষী।[৩]

তাঁদের রচনা ছাড়াও এ গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা বিষয়ক কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোক দৃষ্টিগোচর হয়। বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর উপর কবিতাগুলিতে নিঁখুত বর্ণনা ও বাস্তবধর্মী গীতি কবিতার উচ্ছাস বর্তমান। এ ধরণের বাঙালী জীবনের চিত্র বিষয়ক রচনা

---

১ Subhasitaratnakosa, Preface, S. Hussain, S.L.W.E.M.B. P. 8.

২ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭।

আগে আর দেখা যায় না।[১] রমণীর পরিধেয়ে শাড়ীর বর্ণনায় সুভাষিতরত্নকোষে উল্লেখ থেকে জানা যায়, "A woman sobbing and drying her eyes, with the border of her robe "[২] অর্থাৎ একটি রমণী ফুঁপিয়ে কাঁদছে এবং তার কাপড়ের পাড় দিয়ে চোখ মুছে শুষ্ক করছে। রমণীদের নীল রংয়ের শাড়ি পরিধানের উল্লেখ এ কাব্যে রয়েছে।[৩] ওড়না বা উত্তরীয় এবং বক্ষবন্ধনী ব্যবহারের তথ্যও সুভাষিতরত্নকোষে পাওয়া যায়। কখনো রমণীরা কাঁধের উপর বোতাম দ্বারা আঁটকিয়ে বক্ষস্তনের আবরণ বা স্তনভূষণ ব্যবহার করত।[৪] দরিদ্র গৃহস্থ রমণীরা স্তনপট্ট ব্যবহার করত না, তারা দেহের উর্ধাংশ আবৃত করত কোমরের কাপড়ের এক অংশ দিয়ে।[৫] সুভাষিতরত্নকোষে রমণীদের পরিহিত গহনার বিবরণে গ্রাম্য রমণীর ধানের খোসা ছাড়ানোর এক কাব্যিক চিত্র ফুটে উঠেছে।[৬] যেমন, প্রতিবার তার (রমণীর) বাহু উত্তোলনের সময় বলয়ের ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে, ঢিলা বসন প্রান্ত পেছনের দিকে পতিত, বাস্ক ফুলের উজ্জল ছটা রমণীর স্তনের অগ্রভাগে উঁকি দিচ্ছে। কোমল হাতে বার বার নিড়ানোর সময় গলার হার থেকে আলো ঝলমল করছে। কি সুন্দর সেই রমণী যে ধানের খোসা ছাড়াতে ব্যস্ত।[৭] এ গ্রন্থের একটি শ্লোকে রমণীদের প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে কস্তুরী এবং কুঙ্কুমাদি বা জাফরান এর উল্লেখ আছে। তারা এগুলি দিয়ে অঙ্গ অলংকৃত করত। চন্দনের গুঁড়া এ সময়ের রমণীদের জনপ্রিয় প্রসাধনী ছিল।[৮] একটি শ্লোকে রমণীদের বিভিন্ন ধরনের

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭।

২ An Anthology Sanskrit Court Poetry, V. 787, P. 248.

৩ Ibid., V. 261, P. 135, V. 472, P. 180.

৪ Ibid., V. 545, P. 195, V. 348, P. 136.

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫।

৬ An Anthology of Sanskrit Court Poetry, V. 1182, P. 334.

৭ Ibid., VV. 302, 1152, PP. 144, 329.

৮ Ibid., V. 472, P. 180, V. 3450, P. 247, V. 192, P. 121.

ব্যবহৃত প্রসাধনী যেমন অধররঞ্জক, পায়ে আলতা ও চোখে কাজল ব্যবহারের তথ্য পাওয়া যায়। শ্লোকটি নিম্নরূপঃ

> Who spoiled the painting on your breast
> and the collyrium of your eye?
> Who took the lipstick from your lip.[1]

একটি শ্লোকে সাধারণ গ্রাম্য বালিকাদের চুড়ি হিসেবে শঙ্খবলয় পরিধানের কথা জানা যায়।[২] সুভাষিতরত্নকোষে উল্লেখ আছে, রমণীদের ফুল এবং পাতা দিয়ে তৈরী গহনা ব্যবহারের কথা। কবি মধুশীল একজন সাধারণ বালিকার অঙ্গ গ্রীষ্মকালে নানা রকমের ফুল দ্বারা শোভিত হওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর শ্লোকে। মধুশীল লিখেছেনঃ

> A crest of double jasmine nestles in her braid,
> fresh after bathing;
> a necklace made of trumpet flowers pours coolness
> on her breast
> an acacia blossom, delicate of lip, adorns each ear
> The summer afters its insignia
> to a women's every limp.[3]

অর্থাৎ শ্লোকটিতে একটি সদ্যস্নাতা রমণীর জুঁই, চামেলি দিয়ে সজ্জিত বেণীর কথা বলা হয়েছে। বক্ষস্থলের উপর ফুলের মালার স্পর্শ তাকে শীতল করে। বাবলা জাতীয় ফোটা ফুলগুলি তার দুকানের ভূষণ বা আভরণ স্বরূপ। গ্রীষ্ম ঋতু যেন রমণীরটির প্রত্যেক অঙ্গে ইহার পরিচয় চিহ্ন প্রদান করেছে। এইসব সংস্কৃত শ্লোকে ও পদের মধ্যে সমসাময়িক

---

১ An Anthology Sanskrit Court Poetry, V.819, p. 255.

২ Ibid., V. 1152, p. 329.

৩ Ibid., V. 209, p. 124.

সংস্কৃত কাব্যরীতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ এবং সামসাময়িক বাঙালীর কল্পনা এবং মানস প্রকৃতি সুস্পষ্ট ধরা পড়েছে।

এই জাতীয় সংকলন গ্রন্থের পরে সদুক্তিকর্ণামৃত সংকলিত হয়েছে বাংলাদেশে ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে । সংকলয়িতার নাম শ্রীধরদাস। সদুক্তিকর্ণামৃতে বিবৃতি থেকে জানা যায়, তাঁর পিতা শ্রী বটুদাস ছিলেন বঙ্গেশ্বর লক্ষণসেনের প্রতিরাজ বা লেখক। শ্রীধর দাস নিজেও ছিলেন রাজা লক্ষণসেনের একজন মহামাণ্ডলিক।[১] গ্রন্থটি পাঁচটি প্রবাহ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি প্রবাহ আবার একাধিক বীচিতে এবং প্রতিটি বীচিতে পাঁচটি করে শ্লোক রয়েছে। এতে প্রকীর্ণ শ্লোকের সংখ্যা হচ্ছে ২৩৭০টি। এর মধ্যে নানা দেবতার লীলা ও দোষগুণ বিষয়ক শ্লোক রয়েছে, আরো রয়েছে প্রেম, নায়ক-নায়িকা, প্রেমের বিবিধ ভাব ও অবস্থার চিত্র, বিভিন্ন ঋতু ও প্রকৃতির বর্ণনা, রাজার স্তুতি, যুদ্ধ, সৈনিক ইত্যাদির বিবরণ। এর মধ্যে প্রথম প্রবাহে ৯৫টি বীচিতে দেবতার লীলা বিষয়ক ৪৭৫টি শ্লোক, দ্বিতীয় শৃঙ্গার প্রবাহে ১৭৯টি বীচির ৮৯৫টি শ্লোকে প্রেম, নায়ক নায়িকা বিষয়ক বর্ণনা, তৃতীয় চাটু প্রবাহে ৫৪টি বীচির ২৭০টি শ্লোক রাজার স্তুতি, যুদ্ধ কীর্তি ইত্যাদি, চতুর্থ প্রবাহে ৭২টি বীচির ৩৬টি শ্লোকে দেবতাদের গুণাগুণ, পঞ্চম প্রবাহে ৭৪টি বীচির ৩৭০টি শ্লোকে মানুষ, জীব, জন্তু, দেশ, কাল, নানা বিষয়ে নানা বর্ণনা রয়েছে। ৪৮৫ জন কবির কবিতা এই কাব্যে উদ্ধৃত হয়েছে। কবি লক্ষণ সেন, কেশব সেন, যুবরাজ দিবাকর, উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, আচার্য গোবর্ধন এবং কবিরাজ ধোয়ী ছাড়াও বহু বাঙালী কবির রচনা এই গ্রন্থে রয়েছে।[২] সদুক্তিকর্ণামৃতের বহু কবিতায় গ্রাম বাংলার সমাজ জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। একটি শ্লোকের বর্ণনায় আছে, প্রথম কলম ধান্যের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং নতুন চালের রন্ধন সুবাসে আমোদিত কৃষকদের গৃহগুলি যেন তরুণীদের বাহুলতার বলয়ের ঝনঝন শব্দে মুখরিত।[৩]

---

১ Saduktikarnāmrta, ed. by Sures Chandra Banerzi, (Calcutta: 1965), V. 1, P. 651.
শাহানারা হোসেন, সদুক্তিকর্ণামৃতে বাংলার গ্রাম, ইতিহাস, (ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা: ১৩৮০), পৃ. ৩৪।

২ শ্রী সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৩ Saduktikarnāmrta, V. 1731, V. 1337, P. 358.

গ্রাম্য মেয়েদের ব্যস্ত জীবনের এমন একাধিক বাস্তব চিত্র ছড়ানো রয়েছে সদুক্তিকর্ণামৃতে। চাঁদের আলোতে দীর্ঘ গীতধ্বনি জড়িত আনন্দ উপভোগ করে মেয়েরা মুষল দিয়ে চাল ঝাড়ছে। মুষলোত্তলনের ফলে তাদের উৎক্ষিপ্ত বাহুলতায় বলয়গুলি আন্দোলিত হচ্ছে।[১] দিকপানে গৌরাঙ্গীরা ছুটে চলেছে। তাদের নয়ন অনুমান তাৎকর্যের মত অরুন। স্কন্ধ হতে স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল তুলে দিতে তারা ব্যস্ত।[২] কূপ হতে রজ্জু দিয়ে পানি তুলে বারংবার পানি সিঞ্চন করছে পামরী। সুরচ্ছেদহেতু তার শঙ্খবলয়গুলি ঝনঝন করছে।[৩] সুমধুর গান গেয়ে গ্রাম্য রমণীরা শীতের চাল ঝাড়ছে, তাদের গানের সুরের সাথে মিলিত হচ্ছে তাদের হাতের আন্দোলিত চুড়ির ধ্বনি।[৪] সদুক্তিকর্ণামৃতের কিছু শ্লোকে রমণীদের পোষাক ও কেশ-বিন্যাসের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একজন অজানা কবি বঙ্গবারাঙ্গনাদের মসৃন কাপড়ের পোষাক পরিধানের এবং তাদের হাতে স্বর্ণের বলয় ব্যবহারের কথা লিখেছেন।[৫] তারা নরম চুল তৈল দ্বারা সুগন্ধযুক্ত করত, তাদের খোঁপাবদ্ধ চুলে ফুলের মালা জড়ানো থাকত।[৬] অন্য একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে গ্রাম্য রমণীরা কপালে কাজলের বিন্দু বা টিপ দিত এবং সাদা পদ্মের ডাটার বলয় বা চুড়ি হাতে দিত।[৭] নগরবাসিনী বর্ষবিলাসিনীদের বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতভুক্ত কাব্যের এক কবি শরণের শ্লোকে। বর্ণিত শ্লোকের অর্থ হচ্ছে, দেহে সূক্ষ্ম বসন, ভুজবন্ধে সুবর্ণ অঙ্গদ (তাগা), গন্ধ তৈলসিক্ত মসৃণ

---

১ <u>Saduktikarnāmrta</u>, 5.1.3., V. 1003, PP. 544-545; শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, <u>সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান</u>, (কলিকাতাঃ ১৩৬১ বং), পৃ. ৫১৭-৫১৮।

২ <u>Suduktikarnāmrta</u>, 5.1.5., V. 2005, P. 545; নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫৫৬।

৩ <u>Saduktikarnāmrta</u>, 5.1.4. V. 2004, P. 545; সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫২০।

৪ <u>Suduktikarnamrta,</u> 2.118.3., V. 1063, P. 284.

৫ <u>Ibid.,</u> P. 147, S. Hussain, <u>E.L.P.E.</u>, P. 162.

৬ <u>Ibid.</u>

৭ <u>Ibid.</u>, P. 148.

কেশদাম মাথার উপরে শিখণ্ড বা চূড়ার মত করে বাঁধা, তাতে আবার ফুলের মালা জড়ানো, কানে নব শশিকলার মত নির্মল তালপত্রের কর্ণাভরণ বর্ঙঁবারাঙ্গঁনাদের এই কেশ কাহার না মন হরণ করে।[১] সদুক্তিকর্ণামৃতে রমণীদের কানে কচি রিঠা ফুলের কর্ণাভরণ ব্যবহারের কথা এবং তিলের তৈল দিয়ে চুলকে চতুর্দিক দিয়ে শক্ত করে বেঁধে বেণুনী গেঁথে সাজসজ্জার রীতির কথা উল্লেখ আছে।[২]অপর পক্তিতে জানা যায়, রমণীরা কানে সরিষা ফুল পড়তো এবং মল্লিকা ফুলের হার বুকের উপর ঝুলিয়ে রাখত।[৩] সম্ভবতঃ বিভিন্ন প্রকারের পত্র পুষ্পের অলংকার দিয়ে সাজসজ্জা গ্রীষ্মকালেই রমণীরা অধিক করতো এবং তাদের এই সাজসজ্জা সকলকে আনন্দ দিত। বিশেষতঃ দরিদ্র ঘরের রমণীরা ফুল, পাতার অলংকার এবং শঙ্খ-বলয় অথবা পোড়ামাটির পুঁতির গহনা ব্যবহার করত।[৪] তদ্রুপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ রমণীদের পাতার কর্ণাভরণ পরার ইঙ্গিত আছে সদুক্তিকর্ণামৃতে।[৫] কখনও রমণীরা তাদের লম্বা চুল দিয়ে মাথার চূড়ায় গিঁটা বিশেষ রীতিতে কেশবিন্যাস করত।[৬] অথবা ফিতা দিয়ে খোঁপা বেঁধে ঘাড়ের পেছনে ফেলে রাখত।[৭] কখনো চুলের বেণী গেঁথে চতুর্দিক দিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে মাথায় আঁটকিয়ে রাখত। এ রীতিকে ধম্মিল্ল বলা হত।[৮] ভদ্র পরিবারের রমণীরা তাদের শির আবৃত রাখত তাদের শাড়ী অথবা ওড়নার শেষাংশ দিয়ে এমন তথ্যও পাওয়া যায়

---

১ <u>Saduktikarnāmrta</u>, V. 577, P. 154, উদ্ধৃতি, নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৫৮৫।

২ <u>Ibid.</u>, V. 1453, P. 148.

৩ <u>Ibid.</u>, V. 1263, P. 338.

৪ S. Hussain, <u>J.V.R.M.</u>, P. 67.

৫ <u>Saduktikarnāmrta</u>, V. 1453, P. 393.

৬ <u>Ibid.</u>, V. 575, P. 154.

৭ <u>Ibid.</u>, V. 1158, P. 310.

৮ <u>Ibid.</u>, V. 577, P. 154.

একটি শ্লোকে।[১] সাহিত্যিক সাক্ষ্য হতে আমরা সে সময়ের রমণীদের মুক্তশর হার ব্যবহারের কথা জানতে পারি, যাকে মুক্তশহাররলতা বলা হত।[২] কানে কুণ্ডল,[৩] বড় ইয়ারিং যা স্বর্ণ অথবা গজদন্তের তৈরী,[৪] অনন্ত বা অঙ্গদ,[৫] মল বা নূপুর,[৬] চুড়ি বা কঙ্কণ, ব্রেসলেট বা বলয়,[৭] কটিবন্ধ বা মেখলা,[৮] দামী রত্ন দ্বারা সজ্জিত কটিবন্ধ মণিমেখলা[৯] প্রভৃতি অলঙ্কার সদুক্তিকর্ণামৃতে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া কখনও কটিবন্ধ হত ছোট বেল্টের মত অথবা ভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহার করত কোমরে যাকে কাঞ্চী বলা হত।[১০] দশম একাদশ শতকের বাঙালীর নানা টুকরো শ্লোকগুলিতে বাঙালীর যে চিত্র সদুক্তিকর্ণামৃতে ফুটে উঠেছে, তা সুন্দর, বস্তুময় এবং কাব্যময় যা অন্যান্য উপাদান ও সাক্ষ্য প্রমাণে দুর্লভ।[১১]

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে গ্রাম্য ও নগর সভ্যতা সংস্কৃতির প্রকৃতি-গত পার্থক্য খুব সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। যেমন, পল্লীগ্রামের লোকের নগর বাসিনীদের চালচলন পছন্দ করত না।[১২] কবি শুভাঙ্ক বলেছেন 'নগরে রাজ সৌধাবলীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে যুবতীদের ক্রীড়া যুদ্ধে ছিন্ন হারের মুক্তা সমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। রাজ প্রাসাদে

---

১ Saduktikarṇāmṛta, V. 529, P. 143.

২ Ibid., V. 552, P. 149.

৩ Ibid., V. 1157, P. 309.

৪ Ibid., V. 798, P. 214.

৫ Ibid., V. 575, P. 154.

৬ Ibid., V. 791, P. 212.

৭ Ibid., V. 1016, P. 272, V. 801, P. 215.

৮ Ibid., V. 801, P. 214.

৯ Ibid., V. 861, P. 228.

১০ Ibid., V. 784, P. 221.

১১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০।

১২ তদেব, পৃ. ১৯৭।

মূল্যবান প্রস্তরখচিত ফুল, কণ্ঠহার, কর্ণাঙ্গুরী, স্বর্ণখচিত বলয় এবং নূপুর পরিধান করে ভৃত্যাঙ্গনারা ঘুরে বেড়ায় এবং নগর প্রাসাদ শিখরে দাঁড়িয়ে নিম্নে রাজপথে চলমান সুদর্শন যুবকের উপর কামকটাক্ষ নিক্ষেপ করে। অথচ অন্যদিকে গ্রাম্য জীবনের একাংশে নিষ্করুণ দারিদ্র। তাদের নিরানন্দ দেহ শীর্ণ, গৃহিনীর পরিধানে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র,[১] একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে, গৃহিনী করুণ হাসি হেসে ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করবার জন্য কুপিত প্রতিবেশিনীর নিকট হতে সুঁচ ধার করে বা চেয়ে আনার কথা।[২]

অবশ্য গ্রাম্য সমৃদ্ধির ছবিও আছে, 'বর্ষার প্রচুর জল পেয়ে ধান চমৎকার গজিয়ে উঠেছে, ইক্ষুর সমৃদ্ধি চারিদিকে। হেমন্তে কাটা শালিধানে চাষীর গৃহাঙ্গণ স্তূপীকৃত। গ্রাম্য যুবক সুখে নিদ্রা যায় আর গৃহিনী সারাদিনের শেষে প্রসাধনরতা।[৩] পল্লী সুন্দরীদের প্রসাধন অলংকরণের কথা বলেছেন কবি চন্দ্রচন্দ্র কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী সাদা পদ্মমৃণালের বালা, কানে কচি রীঠা ফুলের কর্ণাভরণ, স্নিগ্ধকেশ কবরীতে তিল পল্লব। পল্লী বধূদের এই বেশ স্বভাবতই পথিকদের গতি মন্থর করে আনে।[৪] কবি শরণের শ্লোকে জানা যায়, একবস্ত্র পরিহিতা মেয়েদের কথা। পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ মেয়েরা গৃহকর্মাদি তো করতই মাঠে ঘাটে তাদের খাটতে হত, হাটেও তাদের বেচাকেনা করতে হত।[৫] কর্মব্যস্ত এই সমস্ত মেয়েদের কাব্যময় ছবি এঁকেছেন কবি শরণ।[৬] সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র শুধু মেয়েরাই পরতো।

---

১ সদুক্তিকর্ণামৃত , উদ্ধৃতি, নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

২ তদেব, প্রথম শ্লোক, উদ্ধৃতি, নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

৪ Saduktikarṇāmṛta, V. 577, P. 154.

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬-৮৭।

৬ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

অনেকে নিজেরাই সে কাপড়ের সুতা কেটে পাকিয়ে নিত বিশেষভাবে নির্ধন ব্রাহ্মণ গৃহের নারীরা তার প্রমাণ পাওয়া যায় সদুক্তিকর্ণামৃতের শ্লোকে।[১] কবিরাজ 'ধোয়ী'র পবনদূত'[২] কাব্য বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের এক অপূর্ব আলেখ্য। 'পবনদূতে' সুহ্ম দেশের যেরূপ বর্ণনা আছে তাতে রচয়িতাকে রাঢ়ের অধিবাসী বলে মনে হয়। এই কাব্যের ঘটনা, পরিকল্পনা ও রচনারীতি কালিদাসের মেঘদূতের অনুরূপ। মোট ১০৪টি শ্লোকে মন্দাক্রান্তাছন্দে রচিত এই কাব্যটি নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক নৃপতি লক্ষণসেনকে নায়ক করে এই দূত কাব্যে ধোয়ী অভিনবত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। কাব্যিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এই গ্রন্থে পবনের যাত্রাপথ পাণ্ড্যদেশের রাজধানী 'ভুজ নগরী' হতে রামেশ্বর, কাঞ্চী, কাবেরী নদী অতিক্রম করে অন্ধ্রদেশ কলিঙ্গ, কেরল পার হয়ে সুহ্ম দেশ তারপরে গৌড়নগরীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সুহ্ম দেশের বর্ণনাটি স্নিগ্ধমধুর। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে কবি রমণীর অঙ্গ শোভাবর্ধনের তুলনা করেছেন।[৩] রামাবতী ও বিজয়পুরের বর্ণনায় এ সময়ের নগরবাসীর জীবনচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে—

> সেই সুহ্ম দেশ, উহার পরিসর ভাগ গঙ্গাতরঙ্গে বিধৌত।
> সুধাধবলিত প্রাসাদরাজি তার কর্ণভূষণ স্বরূপ।সেই রসময়
> দেশে উপস্থিত হইলে তুমি বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবে,
> সেখানে নব শশিকলার ন্যায় কোমল তালপত্র ব্রাহ্মণ
> মহিলাদের কর্ণভূষণ হইয়া থাকে।[৪]

অর্থাৎ চন্দ্রকলার মত কোমল কচি তালপাতার কর্ণভূষণের কথা পবনদূত রচয়িতা ধোয়ীও বলেছেন। সুহ্মের ব্রাহ্মণ রমণীদের এমনই ভূষণ হত।[৫]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

২ Dhoyī, Pavana-dūta, ed., Chintaharam Chakravarty (Calcutta: 1926).

৩ শ্রী অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৪ Pavana-dūta, V.27, S. Hussain, J.V.R.M., Vol.5, P.67.

৫ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৫।

পবণদূতে নারীদের জলক্রীড়া এবং উদ্যান রচনার উল্লেখ আছে। এছাড়া নৃত্যগীত-বাদ্যের প্রচলন ও প্রসার সম্বন্ধে তথ্য এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। উচ্চ কোটি ও নিম্নশ্রেণী উভয় সুরেই এই দুই বিদ্যা ও ব্যসনের সমাদর ছিল যথেষ্ট। বাররামাদের নুপুর ঝংকারে সভা আমোদ গৃহগুলি পরিপূরিত থাকার কথা লিপিমালা ছাড়াও পবণদূত কাব্যে উল্লেখ আছে। দেবদাসীদের এ কাব্যে বাররামা বলা হয়েছে।[১] সেন-বর্মন আমলে এই দেবদাসীরা উচ্চ-সুরের মানুষের মনোরঞ্জন করত, যা সমসাময়িক লিপিমালা থেকে জানা যায়।[২] সেকালে নাগর সমাজে উচ্চকোটি সুরের নারীরা লেখাপড়া শিখতো। পবণদূত কাব্যে রমণীদের প্রেমপত্র রচনার ইংগিত আছে। নৃত্যগীতের বর্ণনা থেকে তাদের নানা কলা বিদ্যায় নিপুনতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সে যুগের কবিরা রাজ প্রশস্তিতে উল্লেখ করেছেন যে রাজপ্রাসাদে প্রতি সন্ধ্যায় বেশ বিলাসিনীদের নুপুরের শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়।[৩] পবণদূতের অন্য কিছু শ্লোক থেকে জানা যায়, বিবাহিত রমণীরা তাদের কপালে সিঁদুর দিয়ে টিপ দিত, যে প্রথা আজও বহুলভাবে প্রচলিত আছে। তারা তাদের নীচের ঠোঁট সিঁদুর দিয়ে রাঙাত। কাজল ছিল তাদের প্রসাধন এবং তারা লাক্ষা দিয়ে তাদের পা রঞ্জিত করত।[৪] প্রাচীন বাঙালী রমণীর পরিধেয় ছিল শাড়ী এবং তারা অনেক সময় দেহের উপর অংশ শাড়ী দ্বারা আবৃত করত না। একখণ্ড কাপড় যাকে ওড়না বা উত্তরীয় বলা হত, তা দিয়ে আংশিকভাবে নারীদের উপরার্ধ আবৃত করার কথা পবণদূত হতে জানা যায়।[৫]

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

২ তদেব।

৩ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

৪ Dhoyi, Pavana-duta, V . 42, P. 14, V. 43, p. 15.

৫ Ibid., V. 35, R.C., Majumder (ed), H.B., Vol.I, p. 613.

সেন পর্বের আরো কিছু সাহিত্যিক সাক্ষ্য জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং গোর্বধন আচার্য্যের আর্যাশপ্তশতীতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। গোর্বধনআচার্য্যের সংস্কৃত ভাষায় লেখা আদি রসাত্মক কবিতা গুচ্ছ। এতে রয়েছে সাত শতেরও বেশী বিচ্ছিন্ন শ্লোক। গীতগোবিন্দ রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক কাহিনী সম্বলিত গীতিকাব্য। এ দুটিই সেন যুগে লিখিত হলেও অনুমান করা যায় এ কাব্য গুলিতে প্রাপ্ত সাহিত্যিক সাক্ষ্যে বাংলার সমগ্র প্রাচীন যুগের মানুষেরই জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।[১] গোর্বধন আচার্য' উপাধি দৃষ্টে মনে হয় তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ব্যাপক ছিল। তিনি আর্যাসপ্তশতী কাব্যে সেন কুলতিলক ভূপতির কথা উল্লেখ করেছেন, সুতরাং তাঁকে লক্ষণসেনের সভাকবি বলে ধারণা করা যায়। কাব্যটি প্রাকৃত কবি 'হালের' 'গাঁথা সপ্তশতী'র আদর্শে আর্যাছন্দে রচিত।[২] আর্যাসপ্তশতী কাব্যে বাঙালী রমণীর পোষাক ও কেশবিন্যাস এর বেশ কিছু তথ্য লাভ করা যায়। বিভিন্ন শ্লোকে রমণীর পরিধেয় ও অলংকারের উল্লেখ সুস্পষ্ট। একটি শ্লোকে জঘনাংশুক বা অধোবাসের কথা বলা হয়েছে,[৩] অন্য একটি শ্লোকে রমণীদের শিথিলা অংশুকম বা ঢিলে পোষাকের উল্লেখ রয়েছে।[৪] অপর শ্লোকে বলা হয়েছে রমণীরা হালকা, নরম ছোট পোষাক কোমরের বা 'কটি'র সামনে পেছনে ঘুরিয়ে পরিধান করত।[৫] মসৃণ কাপড় কোমর থেকে ঘাড় পর্যন্ত এক প্রকার পোষাক বা বীত বসনের ব্যবহারের কথা জানা যায় অন্য একটি শ্লোকে।[৬] একটি শ্লোকে নর্তকীদের আঁটসাঁট উপরার্ধের পোষাক কঞ্চুক ব্যবহারের কথা জানা যায়। রমণীদের বক্ষবন্ধনী চোলম, চোল বা চোলীর উল্লেখ আছে এই কাব্যে।[৭]

---

১ S.Hussain, E.L.P.E., p. 16.

২ শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৩ Govardhanācayā, Ārysaptaśatī, ed. by Pandit Durgāprasād Kāśināth Pandurang Paral and Vasudev Laksman Sastri Pansikar, Kavyamala 1, 3rd edi. (Bombay: 1934), V.88 P. 57.

৪ Ibid., V. 93, P. 59.

৫ Ibid., V. 64, P. 49.

৬ Ibid., V. 64, p. 23.

৭ Ibid. V. 64, p. 144.

কয়েকটি পঙক্তিতে রমণীদের লাল এবং হলুদ পোষাকের উল্লেখ আছে।[১] উর্ধ্ববসন হিসেবে ওড়না বা উত্তরীয় ব্যবহারের উল্লেখ আছে যা দ্বারা কখনো তারা উপর অংশ আংশিকভাবে আবৃত করত।[২] নিলাঞ্চল এর কথা জানা যায় অপর একটি শ্লোকে।[৩] মনে হয় নীল বস্ত্রের অঞ্চল দ্বারাও বক্ষ আবৃত করা হতো। আর্যাসপ্তশতীতে আরো উল্লেখ আছে রমণীদের নীল শাড়ী এবং হালকা নীল পোষাকের কথা।[৪] রমণীরা নিজেদের আড়াল করে রাখার জন্য কখনও কান্ডপট্ট ব্যবহার করত।[৫] আবার নিস্করুণ গরীব গৃহবধুদের ছিন্নবস্ত্র পরিধানের কথা, আর হালকা আগুনের উষ্ণতায় শীতের রাতে তাদের শীত নিবারণের কথাও জানা যায়।[৬] সে সময় গরীব সাধারণ রমণীদের ক্ষৌম, দুকুল অথবা পত্রোন জাতীয় কাপড় পরিধানের সঙ্গতি ছিলনা।[৭] শুধুমাত্র সুতী এক বস্ত্র পরার আর্থিক সামর্থ তাদের ছিল। মুক্তসর অথবা মণিমুক্তসর অথবা ফুল, পাতা দিয়ে গাঁথা নানা ধরণের গহনা ব্যবহারের উল্লেখ আছে এ গ্রন্থে। রমণীরা হার স্রজ নামক অলংকার মাথায় ব্যবহার করত।[৮] কপালে ললাটিকা নামক অলংকার, কানে কুণ্ডল, হাতে ব্রেসলেট বা

---

১ Āryasaptaśatī, V. 476, P. 194.

২ Ibid., V. 11.5.1.

৩ Ibid., V. 456, P. 187.

৪ Srijanhavi Chakravarti, Āryasaptaśatī, O Gauda Vanga, V. 476, P. 253.

৫ Ibid., V. 413, P. 239.

৬ Ibid., V. 304, P. 359.

৭ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৭।

৮ Āryasaptaśatī, V. 275., P. 125.

কঙ্কণ পরত তারা। তাদের সারি সারি চুড়ি শঙ্খ বলয় দিয়ে তৈরী হত। কটিবন্ধ বা কাঞ্চী, মল বা নূপুর এবং বলয় পরিধানের ইঙ্গিতও আছে আর্যাসপ্তশতীতে।[১]

এ কাব্যের কিছু পঙক্তিতে রমণীদের কপালে টিপ বা বিন্দু দেয়ার জন্য কাজল ব্যবহারের উল্লেখ আছে।[২] রমণীরা কাজল চোখে ব্যবহার করত।[৩] কস্তুরী বা মৃগনাভী এবং জাফরান লাগাত তারা বক্ষস্তনে।[৪] পা আলতা বা লাক্ষা দিয়ে রঞ্জিত করত।[৫] বিবাহিত রমণীদের সিঁদুর ব্যবহারের সাক্ষ্য পাওয়া যায় আর্যাসপ্তশতী গ্রন্থে।[৬] অন্যান্য সাহিত্যিক উৎস থেকেও রমণীদের চোখে কাজল এবং কপালে তা দ্বারা তিলক চিহ্ন দেয়ার কথা জানা যায়।[৭] আলোচিত কাব্যগ্রন্থ সুভাষিতরত্নকোষ, সদুক্তিকর্ণামৃত, রামচরিতে আমরা রমণীদের উপরের এবং নিম্নাঙ্গের রেশমবস্ত্র, রেশম বস্ত্রের তৈরী ঘাঘরা, রেশম বস্ত্রের আজানুলম্বিত পোষাক পরিধানের কথা জানতে পারি।[৮] চীনা সিল্ক বা চীনাংশুক এবং বিভিন্ন প্রকার দামী ও নিখুঁত নকশা খচিত পোষাকের কথা জানা যায়।[৯]

---

১ Āryasaptaśatī., V. 529, p. 211, V. 413, p. 172, V. 226, p. 108, V. 6, p. 4, V. 146, p. 115, V. 8, p. 6. and S. Hussain, E.L.P.B., P. 165.

২ Ibid., V. 172, P. 90.

৩ Ibid., V. 185, P. 94.

৪ Ibid., V. 456, P. 248.

৫ Ibid., V. 8, P. 5.

৬ Ibid., V. 404, P. 237. S. Hussain, J.V.R.M., Vol. 5, P. 67.

৭ Āryasaptaśatī, VV. 172, 185, PP. 185, 188.

৮ S. Hussain, J.V.R.M., Vol. 5, P. 65.

৯ An Anthology of Sanskrit Court Poetry, VV. 570, 758, 531, PP. 203, 190, 244; Saduktikarnāmṛta, V. 1014. P. 272, Rāmacaritam, V. 35, P. 104.

সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র ও রেশম বস্ত্রের কথা নানা সূত্রেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশ যে নানা প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে সুবিখ্যাত ছিল একথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও গ্রীক পেরিপ্লাস গ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে আরব বণিক সুলেমান (নবম শতক) ও ভিনিসীয় মার্কপোলো (ত্রয়োদশ শতক) উল্লেখ করেছেন। চর্তুদশ শতকের কবি শেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর নানা প্রকারের পট্টাম্বরের মধ্যে বাংলার মেঘ উদুম্বর, গঙ্গা-সাগর, গাঙ্গোর, লক্ষীবিলাস, দ্বারবাসিনী এবং শিলহট্টী পট্টাম্বরের উল্লেখ করেছেন। এগুলি সমস্তই অলংকৃত পট্টবস্ত্র। সাধারণ দরিদ্র রমণীদের এসব বস্ত্র পরিধানের সুযোগ ও সংগতি কিছুই ছিলনা, তাদের ভাগ্যে মোটা নির্ভূষণ কার্পাস বস্ত্রই থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ছিন্ন ও জীর্ণ হত।[১] সাহিত্যিক সাক্ষ্যে রমণীদের এই কার্পাস বস্ত্র পরিধানের উল্লেখ পাওয়া যায় বার বার।

খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের পেরিপ্লাস অথবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ছাড়াও দশম একাদশ শতকের চর্যাগীতিতে প্রাচীন বাংলার রেশম ও কার্পাস বস্ত্রের খবর পাওয়া যায়।[২] কৌটিল্য বলেছেন, "পুণ্ড্রদেশে শুধু দুকুল ও পত্রোর্ণবস্ত্র উৎপন্ন হত তাই নয় মোটা ক্ষৌম বস্ত্র উৎপন্ন হত। বঙ্গে শ্বেতস্নিগ্ধ দুকুল যেমন উৎপন্ন হত তেমনিই শ্রেষ্ঠ কার্পাস বস্ত্রের অন্যতম উৎপত্তিস্থল এই দেশ।[৩] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মণিরত্নের, হীরামণির উল্লেখ আছে। গৌড়িক নামক এক প্রকার খনিজ রৌপ্যের নাম কৌটিল্য বলেছেন। গৌড় দেশে উৎপন্ন এই রৌপ্যের রং অগুরু ফুলের মত। পেরিপ্লাস গ্রন্থে গাঙ্গেয় মুক্তার উল্লেখ আছে।[৪] সমসাময়িককালেই

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

২ তদেব, পৃ. ৭৫।

৩ Arthasastra of Kautila, ed., R. Shama Sastri, (Mysore, 1909); transl. by R. Shama Sastri, 3rd ed. (Mysore: 1929).

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৬।

একজন অজ্ঞাতনামা কবি বঙ্গ বারাঙ্গনাদের সূক্ষ্ম বসনের উল্লেখ করেছেন। পট্টবস্ত্র এ সময় নানা উপলক্ষ্যে বিবাহানুষ্ঠান ইত্যাদিতে ব্যবহারের খুব প্রচলন ছিল।[১] কার্পাস সম্বন্ধে চর্যাগীতিতে শবরপাদের একটি পদের বর্ণনায় আছে, 'বাড়ির বাগানে কার্পাস ফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়াই আনন্দ। যেন ঘরের চারপাশে উজ্জ্বল হইল, আকাশের অন্ধকার টুটিল'।[২] এ থেকে বোঝা যায়, তদানীন্তন বাংলায় কার্পাস বস্ত্রেরই প্রচলন ছিল সর্বাধিক।

চর্যাগীতির মত জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যটিতে প্রাচীন বাঙালী রমণীদের পোষাক, ভূষণ ও কেশবিন্যাস চর্চার নানা তথ্য প্রদান করে।[৩] শব্দ ও ব্যাকরণের দিক থেকে জয়-দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা হলে তার ছন্দ, রীতি, ভঙ্গি সে যুগের লোকায়ত স্থানীয় ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৪] ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কাব্য বিশারদ শ্রীধর দাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক কাব্য সংকলন করেন। এ সংকলনে অন্যান্য প্রাচীন কবি ছাড়াও জয়দেবের শ্লোক সংকলিত হয় মোট পাঁচটি। এ থেকে অনুমান করা যায় গীতগোবিন্দ ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই রচিত হয়েছিল।[৫] গ্রন্থটি দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত রাধা ও কৃষ্ণের নাটকীয় উক্তি প্রত্যুক্তি ও সঙ্গীতময় রাধাকৃষ্ণের মিলন লীলা নিয়ে রচিত। চব্বিশটি গানের মধ্যে দিয়ে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের সাথে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের শ্রী কৃষ্ণ জন্মখণ্ডের পনর শত অধ্যায়ের প্রথম আটটি শ্লোকের সাথে মিল লক্ষণীয়। তবে রাধা নামটি অনেক প্রাচীন গ্রন্থ যেমন ঋগ্বেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, প্রাকৃত অপভ্রংশে,

---

১ Sridhara Dasa, Sad uktikarnamrta.
উদ্ধৃত, নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

২ মনীন্দ্রমোহন বসু, চর্যাগীতি, (কলিকাতাঃ ১৯৪৩), পৃ.২৭

৩ S. Hussain, E.L.P.E., P. 162.

৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।

৫ সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

পঞ্চতন্ত্রে, ভট্টনারায়নের বেণীসংহার নাটকে, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ও সদুক্তিকর্ণামৃতের অনেক শ্লোকে এবং গাঁথা সপ্তশতীতে কৃষ্ণের সাথে প্রণয়লীলার চিত্র বর্ণিত হয়েছে।[১] জয়দেব সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত শ্লোক হতে লৌকিক কাহিনীর আদর্শের অনুসরণে তাঁর কাব্যে রাধা চরিত্রের পরিকল্পনা করেন। তথাপিও বলতে হয় জয়দেবের পুর্বে আর কোন কবি রাধাকে নায়িকা রূপে চিত্রিত করে এ ধরণের পূর্ণকাব্য রচনা করেন নি।[২] গীতগোবিন্দের গীতগুলির বর্ণনায় আমরা রমণীর পোষাক, অলঙ্কার ও সাজসজ্জা বিষয়ে একটা ধারণা পেয়ে থাকি।[৩] দ্বিতীয় সর্গে নায়িকার বর্ণনায় তার চরণে মণিময় নূপুর, 'কটি'তে মেখলা পরিধানের উল্লেখ আছে।[৪] নায়িকার আঁখিতে অঞ্জন, কর্ণে তমাল স্তবক, মস্তকে নীলোৎপল মালা, স্তনে মৃগমদচিত্র এবং পরিধানে নীলাম্বর শাড়ী।[৫] গলায় মণিহার, কটিতে স্বর্ণ মেখলা, পদ যুগলে মণিমঞ্জীর ও মণিকঙ্কণ গহনার প্রভায় আলোকিত কুঞ্জ গৃহ দ্বারে শ্রীকৃষ্ণের সাথে রাধার দর্শনের কথা উল্লেখ হয়েছে।[৬] গীতগোবিন্দের গীতগুলি থেকে রমণীদের পরিধেয়, প্রসাধনী সম্পর্কে আমরা অনেক তথ্য পেয়ে থাকি: একটি গীতে বলা হয়েছে রাধার কুসুমান্বিত কেশদাম সুন্দর প্রতীয়মান হয় এবং ললাটিস্থ নির্মল চন্দন তিলক অন্ধকার মধ্যস্থ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পায়।[৭] এ শ্লোক থেকে রমণীর প্রসাধন ও

---

১ শ্রী অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৮১।

২ তদেব, পৃ. ৮২।

৩ শ্রী শ্রী গীতগোবিন্দম, অনু: শ্রী হরেকৃষ্ণ, প্রথম সর্গ, গীত "৪", অনু, পৃ. ৪০।

৪ তদেব, দ্বিতীয় সর্গ, গীত "১৬", অনু. পৃ. ৪১।

৫ তদেব, গীত "১১", পৃ. ১৩২।

৬ তদেব, গীত "১৩", পৃ. ১৩৩।

৭ তদেব, গীত "২৯", পৃ. ১৩৮।

কেশবিন্যাসের রূপ সৌন্দর্যই ধরা পড়েছে। একটি গীতে রাধা কৃষ্ণকে বলছে তাকে পোষাক পরিয়ে দিতে।[১] অপর একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে রাধা কৃষ্ণকে তার বক্ষস্তনে কস্তুরীর প্রলেপ দিতে বলছে।[২] অন্য একটি শ্লোকে রাধার চোখের মৌমাছির মত কালো অঞ্জন কৃষ্ণের চুম্বন দ্বারা মুছে দেয়ার কথা উল্লেখ আছে।[৩] রাধা আরো বলছে তার কানে কুন্ডল পরিয়ে দিতে।[৪] একটি গীতে তার কপালে সুন্দর কস্তুরীর তিলক চিহ্ন দেয়ার কথা,[৫] অপর একটি গীতে, রাধার অবিন্যস্ত চুলগুলিকে চমৎকার ফুল দ্বারা সজ্জিত করে দেয়ার কথা উল্লেখ আছে।[৬] তার মোহনীয় কোমরে স্বর্ণের কোমরবন্ধনী এবং কাপড় পরিয়ে দিতে বলছে রাধা কৃষ্ণকে অপর একটি গীতে।[৭] একই গীতে রাধার স্তনে ফুলের পাঁপড়ি দ্বারা সজ্জিত করার কথার উল্লেখ আছে। তার কোমরে কাঞ্চী এবং কবরীতে ফুলের মালা ফিতার মত জড়ানো। রাধার হাতে বলয় শ্রেণী এবং পায়ে নূপুর পরিহিত। এ গীতিকাব্যের থেকে আরও জানা যায় রমণীদের বক্ষবন্ধনী পরিধানের কথা।[৯] রমণীদের নিম্নাঙ্গের পোষাক যেমন জঘনদুকুলম[১০] এবং অধোবসন নীল নিচোলের কথা উল্লেখিত আছে গীতগোবিন্দে।[১১]

---

১ <u>Gita-Govinda</u>, XII,XXIV

২ <u>Ibid.</u>, V. 17, text. P. 152, transl. P.153.

৩ <u>Ibid.</u>, V. 18, text., and transl. P.153.

৪ <u>Ibid.</u>, V. 19.

৫ <u>Ibid.</u>, V. 21., text and transl. P. 154.

৬ <u>Ibid.</u>, V. 22., text., 154, transl. P. 155.

৭ <u>Ibid.</u>, V. 23., text., and transl. P. 156.

৮ <u>Ibid.</u>, XII. XXIV, V. 4., text. P. 144, transl. P. 145.

৯ <u>Ibid.</u>, XII, XXIII, V. 4., text., P. 144, transl.P.145.

১০ <u>Ibid.</u>, II, VI, V, 12, transl. P. 145.

১১ <u>Ibid.</u>, V. XI. V. II, text and transl. P. 71.

অন্য একটি শ্লোকে রাধার বক্ষস্তনের উপর স্বর্ণের মণিখচিত হার বা মণিমঞ্জরীর কথা জানা যায়।[১] মুক্তার হার[২] রাধার স্তনের উপর ন্যাস্ত, তার কোমরবন্ধনী যেন ঢোলের মত মৃদু বাদ্যের ন্যায় বাজে।[৩] তার পরিহিত মেখলা, মল, বলয় এবং কঙ্কণ মণিমরকত খচিত।[৪] এ ধরনের বলয়কে মরকত বলয় বলা হত।[৫] যুবতী নারীদের ফুল দিয়ে কেশ-বিন্যাস করার কথা এবং অলক্তক দিয়ে পা রাঙানোর কথা গীতগোবিন্দে একাধিক গীতেই বর্ণিত হয়েছে।[৬]

গীতগোবিন্দ, আর্যাসপ্তশতী, পবনদূত সমস্তই প্রাচীনকালের রাজসভার বিলাস লালসা-ময় সংস্কৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত। তদ্রূপ শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিতে শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য বেশী। সাহিত্যের বর্ণিত এই চিত্র সাধারণভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন তো বটেই তবে এই সমাজ রাজসভা পুষ্ট অভিজাত সমাজ বলা যায়।[৭] দশম শতকে কবি রাজশেখর তাঁর কাব্য মীমাংসা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্য জনপদ বাসীদের প্রসাধনের বর্ণনা দিতে গিয়ে শুধু গৌড় রমণীর বেশ প্রসাধনের বর্ণনাই দিয়েছেন, মনে হয় পোষাক অলংকারের মাঝে তাদের মানদণ্ড বিচার করা হত।[৮]

---

১ <u>Gita-Govindha</u>, X,XIX, V. 7, text and transl. P. 71.

২ <u>Ibid.</u>, VII, XIV, V. 14, text and transl. P. 90.

৩ <u>Ibid.</u>, XI, XX, V. 7, text and transl. P. 129.

৪ <u>Ibid.</u>, V. 8.13, text. P. 129, transl. P. 130-132.

৫ <u>Ibid.</u>, VII, XV, V. 25, text and transl. P. 95.

৬ <u>Ibid.</u>, VII, XIV, V. 13, text and transl. P. 89, and <u>Ibid.</u>, VIII, XVII, V. 5, text and transl, P. 106, <u>V. 10</u>, P. 108.

৭ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫।

৮ <u>তদেব</u>, পৃ. ২৮৬।

রাজশেখর বঙ্গললনা সম্বন্ধে বলেছেন, তারা মাথার কেশকে আবৃত করে শাড়ী পরত।[১] গৌড় দেশের মেয়েদের বেশবাসের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "বুকে তাদের আদ্র চন্দন, গলায় সূত্রহার, সিঁথি পর্যন্ত টানা ঘোমটা, অনাবৃত বাহুমূল, গায়ে অগুরুর প্রসাধন, অঙ্গবর্ণ যেন দুর্বাদলের মত শ্যামল সুন্দর"।[২] বাৎস্যায়নের সাক্ষ্যে তৃতীয় চতুর্থ শতকের প্রাচীন বাংলায় সমাজের উচ্চস্তরের মেয়েদের অবগুণ্ঠনময়ী জীবনের কথা জানা যায়। এটাই ছিল তাদের সাধারণ নিয়ম। পর্দার আড়াল থেকে তারা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। সম্ভ্রান্ত গৃহের মেয়েরা যখন রাস্তায় বেরোতো, তখন রাস্তার লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখতো।[৩] অন্দর মহলের রমণীরা বাড়ির ছাদে উঠে কিছুটা সুখ ভোগ করত তারও ইঙ্গিত আছে।[৪]

সম্ভ্রান্ত পরিবারে ঘোমটার এমন ব্যবস্থা থাকলেও সমাজের যে স্তরের নারীদের হাটে মাঠে খেটে জীবিকা নির্বাহ করতে হত, তাদের মধ্যে এ অবগুণ্ঠিত জীবন যাপনের কোন বালাই বা সুযোগ কোনটাই ছিল না। তবে প্রাচীন বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের বধূদের ঘোমটা দেয়া ছিল কুল মর্যাদার অন্যতম অভিজ্ঞান।[৫] বাৎস্যায়ন বলেছেন, নারীরা নখে রং লাগাত। এ বিষয়ে কোন সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বাঙালী রমণীরা যে চোখে কাজল দিতেন, তার সাক্ষ্য প্রাচীন লিপিমালায় ও সাহিত্যে প্রচুর। সধবা নারীরা কপালে পরতো কাজলের টিপ এবং সীমান্তে সিঁদুরের রেখা, কিন্তু বিধবা হওয়ার সাথে সাথে সীমান্তের সিঁদুর যেত মুছে। একথার ইঙ্গিত আছে বিভিন্ন লিপিতে ও গোবর্ধন-আচার্য্যের শ্লোকে।[৬]

---

১ A.S. Altekar, <u>The Position of Women in Hindue Civilization</u>, (Delhi, Varanasi, Patna: Motilal Banarasidass, 1933), P. 350.

২ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১০৩-১০৪।

৩ <u>তদেব</u>, পৃ. ১২১।

৪ <u>তদেব</u>।

৫ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২৯১-২৯৩।

৬ <u>তদেব</u>, পৃ. ২৮৬।

উচ্চকোটি স্তরে বিবাহোপলক্ষে কন্যার সাজসজ্জা ও বেশভূষণের বর্ণনায় শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতে যে সাক্ষ্য মেলে, তাতে চোখে কাজল ও রমণীর কপালে তিলক দেয়ার কথা জানা যায়। প্রসঙ্গত উৎসব সজ্জার কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, কুলাচার অনুসারে সধবা ও পুত্রবতী গৃহিনীরা মঙ্গল গীত গাইতে গাইতে কন্যাকে স্নান করাতো এবং পরে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরানো হতো। সখীরা দময়ন্তীকে কপালে পরাতো মনঃশিলার তিলক, সোনার টিপ, কাজল এঁকে দিত চোখে, কর্ণযুগলে পরাতো দুটি মণিকুন্ডল, ঠোঁটে আলতা, কণ্ঠে সাতনহর মুক্তার মালা দুইহাতে শঙ্খ ও স্বর্ণবলয় চরণে আলতা। বিবাহের মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে অত্যাসু অনুঃপুরি-কারা স্ত্রী আচারগুলি পালন করতেন। শিল্পীরা নানা প্রকার রঞ্জিত কাপড় দিয়ে তৈরী ফুলে নগরের পথঘাট সাজাত। নানা প্রকার বাদ্যও হত।[২] শঙ্খবলয় ও রমণীদের সীমন্তে সিঁদুর ব্যবহার এবং মঙ্গলানুষ্ঠানে আলপনা আঁকা বিবাহউপলক্ষে মঙ্গলগীত গাওয়া, বিবাহ সংএশনু নানা স্ত্রী আচার, বাসর ঘর প্রভৃতি সম্পর্কে যে তথ্য নৈষধচরিতে আছে।[৩] এ সমস্ত তথ্যগুলি থেকে টীকাকারগণ শ্রীহর্ষকে বাঙালী বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

শ্রী হর্ষের নৈষধচরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য বেশি অর্থাৎ এই শৃঙ্গার রস সমৃদ্ধ শ্লোকগুলিতে রাজ সভার বিলাস — লাস্যময় সংস্কৃতি, কামলালসময় ভাবনা কল্পনার দিকে আকর্ষণ প্রবল। সাহিত্যের মাঝে এমন চিত্রে সাধারণভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন ঘটেছে। তবে এই সমাজ রাজসভা পুষ্ট অভিজাত সমাজ। অবশ্য এই সমাজের বাইরে বৃহত্তর যে সমাজ তার প্রতিফলন সমসাময়িক সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তার দৃষ্টান্ত

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২৮৬।

২ <u>তদেব</u>, পৃ. ৪৬৪।

৩ <u>তদেব</u>, পৃ. ২৮৮।

৪ শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১০১।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু এ কাব্যে ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতির শ্লোক নাই, তা নয়। এছাড়া সেন রাজবংশের লিপিমালায় এবং সমসাময়িক সভাসাহিত্যে এ সময়ের উচ্চ কোটিস্তরের যে চিত্র দৃষ্টিগোচর হয় তার সাথে গীতগোবিন্দের নৃত-গীতলাস্যবিলাসময়, কামভাবনাময় রসের সদৃশ বর্তমান। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছাড়া প্রায় সমসাময়িককাল বা কিছু পরবর্তী কালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে রাধাকৃষ্ণ লীলাকে আশ্রয় করে কামনাবাসনা, প্রেমভক্তির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এক্ষেত্রেও সামাজিক আবহাওয়ার প্রতিফলন অনস্বীকার্য। সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে জয়দেবের ৩১টি শ্লোক উদ্ধার করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৫টি মাত্র গীতগোবিন্দ হতে। এ থেকে অনুমিত হয়েছে যে, তিনি অন্য এক বা একাধিক কাব্য রচনা করেছেন।

এইসব সুবিস্তৃত কাব্য সাহিত্য এবং প্রকীর্ণ শ্লোকাবলী ছাড়াও সেনবর্মণ রাজসভায় অলংকারবহুল উচ্চসিত কাব্য রচনার পরিচয় পাওয়া যায় রাজকীয় লিপিগুলির প্রশস্তি শ্লোকাবলীতে, এসব শ্লোক প্রায় অধিকাংশই রাজসভাকবিদের দ্বারা রচিত। যেমন ভবদেব-প্রশস্তি, বিজয়সেনের বারাকপুর প্রশস্তি, বল্লালসেনের নৈহাটি প্রশস্তি, লক্ষণসেনের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর ও তর্পণ দীঘি শাসনের প্রশস্তি প্রভৃতি সমস্তই সমসাময়িক কবি প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে।[১]

বাঙালী জীবনের কিছু কিছু চিত্র প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় রচিত গাথা সপ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল এবং খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের ভরতের নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। প্রাকৃত ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় সাতবাহন রাজবংশের রাজা মহাকবি হালরচিত গাঁথাসত্তসই অর্থাৎ গাঁথাসপ্তসতী কাব্যে অতি প্রাচীন লোকের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। একথা স্বীকার করতে হয় যে, পরবর্তীকালে সংস্কৃতে যে সমস্ত শ্লোক সংগ্রহ রচিত হয়েছে যেমন 'সুভাষিতাবলী', সদুক্তিকর্ণামৃত' এগুলির প্রধান আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছে

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৬-৬২৯।

'গাঁথা সপ্তশতী'। কিন্তু এ অপেক্ষা আরও বিস্তুর তথ্য প্রদান করেছে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত 'প্রাকৃতপৈঙ্গল'[১] নামক ছন্দগীতি গ্রন্থটিতে। চর্তুদশ শতকের শেষের দিকে কবিতা সংকলন গ্রন্থটির শ্লোকগুলির ভাব, বিষয়বস্তু ও ভাষা কৌশল বাংলার মত। এই সংকলনে বাঙালী জীবনের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। রাধাকৃষ্ণ কাহিনী ও গোপীলীলা এতে আছে, তবে দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ আবার প্রেমপ্রণয় গ্রথিত রসরঁসের পাশাপাশি তাদের সাজসজ্জার সুনিপুন চিত্র ধরা পড়ে।[২] এদিক দিয়ে বিচার করলে বাঙালীর জীবন চিত্রের জন্য গাঁথা সপ্তশতী ও প্রাকৃত পৈঙ্গল গ্রন্থ বাঙালী রমণীর বেশ ভুষণের তথ্য প্রদানে গুরুত্ব কম নয়। বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলার জীবন চিত্রের সংবাদ আহরণে এদুটি কাব্য সহায়ক উৎস।

প্রাচীন যুগের রমণীদের ব্যবহৃত অলংকার সম্পর্কে অসংখ্য নমুনার সাক্ষ্য মেলে খ্রীস্টীয় আনুমানিক তৃতীয় শতকের ভরতমুণির নাট্যশাস্ত্রে, বাৎস্যায়নের তৃতীয় চতুর্থ শতকের কামসূত্র এবং জিমূতবাহনের একাদশ শতকের দায়ভাগ গ্রন্থে। এ সময়ের রমণীরা গতানুগতিক গহনাই ব্যবহার করত।[৩] নাট্যশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার গলার অলংকারের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, ত্রিবেণী, মুক্তশবলী, রত্নমুক্তশ, রত্নাবলী, সুত্রা, সংকলিকা এবং হার। ত্রিবেণী হল তিনসারি বিশিষ্ট হার, মুক্তশবলী হল মুক্তশর একটি তার বিশিষ্ট রত্নাবলী পুঁতির একতার যুক্তশ, সূত্রা গলবন্ধের মত হার (Doe collared Necklece),[৪] সংকলিকা হত পুঁতির তৈরী যা ছোট থেকে বড় তৎপর এক্ষণ ক্রুমভাবে সারিবদ্ধ পুঁতি সন্নিবিষ্ট এবং হার হচ্ছে মূলনু সাধারণ মালা।[৫] নাট্যশাস্ত্রে রমণীদের

---

১ Prakrta Paingala by Pingala Acaryā, ed., Chandramohan Ghosh, Bibliotheca Indica, (Calcutta: 1902).

২ শ্রী অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

৩ S. Sahay, Indian Costume Coiffure and Ornament, (New Delhi: Munshtrum Manoharlal, 1975), P. 154.

৪ Natyasastra, XXIII, 2,31,33.উদ্ধৃতি S. Shay, Op.Cit., P.154.

৫ S. Sahay, Op.Cit., P. 154.

বিভিন্ন প্রকার কর্ণাভরণ ব্যবহারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যেমনঃ কুন্ডল, কর্ণিকা, কর্ণাবলী, পত্র কর্ণিকা, কর্ণমুদ্রা, কর্ণটকীলক এবং কর্ণপুরা। কুন্ডল হত গোলাকার কানদুল, কর্ণিকা সম্ভবতঃ ফুলের সদৃশ্য কানে ঝুলনু গহনা, কর্ণমুদ্রা কানের উপর গোলাকার অলংকার বিশেষ, কর্ণটকীলক ঢোল আকৃতির এবং কর্ণাপুরা, কর্ণমুদ্রা সদৃশ্য অলংকার। কর্ণাবলী গোলাকার আংটির মত এবং পত্রকর্ণিকা ছিল পত্র সদৃশ কানের ঝুলনু অলংকার।[১]

নাট্যশাস্ত্রে মাথার অলংকারের বিবরণ আছে, যেমন চাঁদমণি, শিরসজালা, মুক্তজালা, বেণীকুঞ্জ, শিকাপাশা, শিকাজালা, পিকিপত্র, ললাতিকাতিলক, ভরতললাটিকা প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুটি অলংকার কপালে পরিধান করা হত এবং অবশিষ্ট অলংকার মস্তকের উপর পরিধান করা হত।[২] এ গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের হাতের অলংকারের তথ্যও পাওয়া যায়। কব্জি, বাহু এবং কনুই ও কব্জির মাঝখানে অলংকার পরিধান করা হত। এগুলিকে বলা হত অর্ঘ্য, বলয়, বার্জুরা, কালাশাখা, হস্তপাদিকা প্রভৃতি। অর্ঘ্য হল অনন্ত, বলয় হল বালা যা হাতের পরিহিত এক প্রকার অলংকার, বার্জুরা হল ব্রেসলেট বা চুড়ি, হস্তপাদিকা হাতের তালুর উপর পরিহিত আধুনিক পাহাপঞ্জীর মত।[৩] এছাড়া পায়ের অলংকার যেমন পাদপাত্র, নুপুর, কিঙ্কিণী এবং পদকতক ব্যবহারের কথা জানা যায় নাট্যশাস্ত্রে। এ গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে আরো জানা যায় যে, সে সময় রমণীরা প্রকৃতই কেশ বিন্যাসে পারদর্শী ছিল। তারা তাদের বৃহৎ কেশগুচ্ছকে মনোরমভাবে বিন্যস্ত করতো।[৪] এ প্রসংগে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "ভরতমুণি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে তৃতীয় শতকের গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ এবং চুলের বেণীর শেষাংশ শিখার মত মুক্ত থাকার কথা উল্লেখ

---

১ <u>Natyasastra</u>, XXII, 23,25,26.

২ <u>Ibid.</u>, XXIII, 22,23,24,67.

৩ <u>Ibid.</u>, 34,35.

৪ <u>Ibid.</u>, XXIII, 6, S. Sahay, <u>Op.Cit.</u>, P. 104.

করেছেন।[১] বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রে তৃতীয় চতুর্থ শতকে গৌড়ের নারীদের মৃদুভাষিণী, অনুরাগবতী এবং কোমলাঙ্গী বলে উল্লেখ করেছেন। এ উক্তি থেকে বাঙালী রমণীর মানস ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা করা যায়।[২] জীমূতবাহন তাঁর দায়ভাগ গ্রন্থে সভাসমিতির জন্য রমণীদের পৃথক পোষাকের কথা বলেছেন। নর্তকী নারীরা পরত পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পায়জামা, দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিত একটি দীর্ঘ ওড়না।[৩] এ গ্রন্থের সাক্ষ্য প্রমাণে আরো জানা যায়, নারীরা সুতা কেটে তাঁত বুনে অথবা অন্য কোন শিল্পকর্ম করে তাদের স্বামীদের উপার্জনে সাহায্য করতো।[৪] তবে এ সমস্ত রমণীদের পোষাক ছিল একবস্ত্র বা শাড়ী, তা দ্বারা ব্যস্ত জীবনে কোন রকমে তারা শরীরকে আবৃত রাখত। দায়ভাগ গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সে সময় রমণীদের দাসী হিসেবে রাখার রীতির কথা এবং তাদেরকে আমোদ প্রমোদের কাজেও ব্যবহার করা হত।[৫] অন্যান্য সাহিত্যিক সাক্ষ্যে আমরা রাজপরিবারে অতি দামী বেশ ভূষণে ভূষিত রমণীদের উল্লেখ পাই, যারা পরিচারিকা বা দাসীরূপে পুরুষদের মনরঞ্জন করার কাজে ব্যবহৃত হত। কিন্তু তৃতীয় শতকের অর্থশাস্ত্রে, এ যুগের নারীরা পর্দা প্রথার কথা উল্লেখ আছে। নববধূর মাথায় থাকত অধিবাস বা উত্তরীয়। অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ অনুসারে জানা যায়, কুল বধূদের গুলফ পর্যন্ত লম্বা বস্ত্র এবং নাভি ও স্তনদ্বয় সংবৃত রাখা হত। তবে সর্বদা তার বড় আঁটুনি ছিলনা। জাতীয় উৎসবে এবং শোকের সময় মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে আসতো।

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ২৮৮।

২ <u>তদেব</u>।

৩ <u>তদেব</u>, পৃ. ২৮৫।

৪ <u>তদেব</u>, পৃ. ১১২-১৩।

৫ <u>Dayabhaga</u>, trans. by H.T. Celebrooke, (Calcutta: 1868), P. 159.

এ সময়ে মেয়েরা চুল বাঁধতো, তাদের খোঁপার নাম ছিল কুরীর, কুম্ব।[১] সুতরাং বলা যায়, আদিকাল থেকে প্রাচীন বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশে মানুষের পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে নানা রীতির প্রচলন ছিল।

বৈদিক যুগের পোষাক ছিল বেশ বড় এবং ঢিলা। পোশাকের ধার বা পাড় থাকতো। সিক (Sic) শব্দ দ্বারা বৃহৎ পাড়ের কথার উল্লেখ আছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাদা কাপড় পরিধানের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং রং করা বস্ত্র, স্বর্ণসূত্রে সমুজ্জল কাপড় রমণীরা ব্যবহার করত।[২]

বাংলার অতি আদিপর্বে রমণীদের ব্যবহৃত স্বর্ণসূত্রে সূচিকর্ম খচিত পোষাক সে যুগের শিল্প ও নান্দনিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এই প্রকার পোষাক তৈরী করা ছিল রমণীদের দৈনন্দিন পেশার অর্ন্তভূক্ত বিষয়। পেশওয়াজ শব্দ দ্বারা রমণী নর্তকীর ঘাঘরা পোষাকের কথা জানা যায়। উষ্ণীষ দ্বারা বেদে শিরোভূষণ বোঝানো হয়েছে।[৩] সেকালে মেষের গায়ের লোম দিয়ে পোষাক তৈরী ও বুনন হত। তারও পূর্বে সিন্ধু উপত্যকা এলাকায় সুন্দর তুলার পণ্য তৈরী হত। তাই বৌদ্ধ সাহিত্যে রমণী কারিগরদের তুলা বা তন্তু মসৃন ও কোমল করার জন্য বিভিন্ন পানি দিয়ে ধৌত করার কথা উল্লেখ আছে।[৪] ধাতব বস্তু রৌপ্য, তাম্র, লৌহ এর ব্যবহারের কথা এবং বেদে নিস্কনামে এক প্রকার অলংকারের উল্লেখ আছে। 'সৃণকা' নামে হারজাতীয় আভরণের কথাও জানা যায়।[৫] সৌন্দর্য-চর্চার জন্য রমণীদের চিরুনী (শলাকি), আয়না, অলংকার ,নানা প্রসাধনী ব্যবহারের প্রচলন ছিল সে সময়।

---

১ সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খন্ড, (পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩), পৃ. ৯৮।

২ Motichandra, Costume, Textiles, Cosmetics & Coiffure in Ancient and Mediaval India, (Delhi: India Oriental Pub. 1973), P. 8.

৩ Ibid., P. 9.

৪ Ibid., P. 5-11.

৫ সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

সপ্তম শতকে লিখিত হর্ষচরিতে বাণভট্ট মালতীর বেশ বিন্যাসের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। এ থেকে আমরা প্রাচীন কালের রমণীর বেশভূষণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। যেমন, রত্নরচা স্ফটিকের মতো তার অর্ধবাস আস্তৃত ছিল কুসুম্ভবর্ণের পুলকের চূর্ণ। শুভ্র কঞ্চুকের উপর আমলকী ফলের মতো স্থূল মুক্তার সংগ্রহের হার, তার পূর্ণ স্তনের শিখরে ছিল রত্নের একখানি প্রালম্ব মাল্য, হাতে ছিল পান্নার মকর বসানো সোনার এক-খানি কঙ্কণ, ছিটকিয়ে পড়ছিল এগুলির সূক্ষ্ম কিরণজাল। তার কান থেকে আরও দুলছিল বকুল ফুলের মতো বড় বড় তিনটি মুক্তার দানা। মালতীর ললাটের মাঝখানে তমাল শ্যামল তিলক বিন্দু।[১] বাণভট্টের হর্ষচরিতে অতি প্রাচীনকালের রমণীদের বেশ ভূষণে নকশার সুচারু বিন্যাস ও বর্ণসুষমা স্পষ্টই ফুটে উঠেছে। মালতীর সাজে বলা হয়েছে সাদা কঞ্চুক ও লাল অর্ধবাস এবং নীল ঘোমটার কথা। তদ্রূপ কাদম্বরীর চণ্ডাল কন্যার পরণে নীল কঞ্চুক, লাল ঘোমটা, কপালে কস্তুরী, গোরোচনার তিলক। হর্ষচরিতে সে সময়ের কাপড় ছাপানো ও রঙ করার এক অপূর্ব বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যারা কাপড় ছাপার কাজে ব্যস্ত থাকতো, দেখা যায়, 'তারা সহস্র সহস্র বস্ত্র চিত্রিত করে ফেলে রেখেছে, এবং বিরামহীন কর্মদক্ষতায় আবার মন দিয়েছে চিত্রণে। আনন্দিত রজক সঙ্ঘ সহস্র সহস্র বস্ত্র রাঙিয়ে আবার রাঙাচ্ছে, সেই সব রঙছাপা কাপড়ের দুটি পাড় ধরে সহস্র সহস্র পরিজনের সে কী ছায়া কাপড় শুকানোর নৃত্য, সেইসব শুষ্ক বসনের উপর বাঁকা-আঁকা পংক্তিস্থ সারি টানা যে সব আশ্চর্য সুন্দর বাহার আঁকা জিনিস ছিল, সে একটি দেখবার জিনিস। কুঙ্কুমের স্থাসক: এত দুরন্ত, এত স্পর্ধিত, এত ঘটা![২] সেখানে কত রকমের যে বসন ছিল তার তালিকা দেওয়া কঠিন'। এ বর্ণনা থেকে সেকালে কাপড় বুনন, উদ্ভিদ জাত রঙের মিশ্রণ ঘটিয়ে নানা রঙ তৈরী করার রীতি শামুকের খোলা পুড়িয়ে বেগুনী রঙ তৈরীর প্রচলনের কথা জানা যায়। বসনগুলির মধ্যে ক্ষৌম থেকে তৈরী ক্ষৌমবাস, বদরা-কার্পাস

---

১ <u>হর্ষচরিত</u>, বাণভট্ট, অনু. প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, (কলিকাতাঃ ১৩৮৫), পৃ. ৩০।

২ <u>তদেব</u>, পৃ. ১৬২।

থেকে বাদর বসন, মাকড়সার লালাতন্তুজাত উত্তরবাস, অংশুক, নেত্রবাস, প্রভৃতির কথা জানা যায়।[১] বাণভট্টের বিবরণের সাথে পাল আমলের অনুচিত্রগুলির রমণীদেহে পরিহিত বিচিত্র রঙের, নকশার, পাড়যুক্ত কাপড় বা বসনের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। রমণীদের পরনে দেখা যায়, লাল, হলুদ, নীল ও বেগুনী রংয়ের প্রাধান্য। এছাড়া বিন্দু, ডোরাকাটা, ফুল আকৃতি নকশা খচিত কাপড় গুলিতে ছিল রঙের উজ্জলতা যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হত।[২]

তাছাড়া পাল সাম্রাজ্যের সময়কালে বা তারও দুই এক শতাব্দী আগে হতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য সাহিত্যে, শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় সহজযানী সিদ্ধাচার্যগণের দোহা-কোষ ও ব্রাহ্মণ্য কবিগণের কাব্য সমূহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।[৩] আনুমানিক ৮০০ থেকে ১২০০ শতকের মধ্যে এ সমস্ত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য-গণের রচিত মাগধী অপভ্রংশের বিবর্তিত প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত চর্যাগীতি এবং সরহ, কাহ্ন, তিল্লোপাদের দোহাগুলি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সাহিত্যিক উৎস। এই দোহা ও এই ধরণের অন্যান্য রচনার কবি লেখকগণ প্রায় সকলেই বাংলা, উড়িষ্যা, আসামের অধিবাসী। তাই চর্যাগীতিকা ও দোহাগুলিতে তদানীন্তন বাঙালীর জীবন প্রণালীর কথা বিধৃত হয়েছে। বিশেষতঃ বাঙালীর ধর্ম, সমাজ ও মানসজীবনের মূল্যবান দলিল তাঁদের রচিত চর্যাপদগুলি। অপভ্রংশে রচিত দোহাগুলির সাথেও বাঙালী জীবনের আত্মিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না।[৪]

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ্রীস্টীয় অষ্টম-দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাংলাদেশের সিদ্ধাচার্যদের রচিত অপভ্রংশে শ্লোকগুলি সংগ্রহ করেন।

---

১ <u>হর্ষচরিত</u>, বাণভট্ট, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১৬২।

২ সরসীকুমার সরস্বতী, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৪১,৪৭,৬০।

৩ শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১০১-১০৬।

৪ <u>তদেব</u>, পৃ. ১০৬।

তিনি পুঁথি সংগ্রহের জন্য কয়েকবার নেপালে যান এবং সেখানে রাজ লাইব্রেরী থেকে পুরাতন নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত কয়েকটি দুর্বোধ্য পুঁথি যেমন, ডাকার্ণব, 'সুভাষিত সংগ্রহ', 'দোহাকোষ পঞ্জিকা, 'চর্যাচর্যবিবিনিশ্চিয়', ইত্যাদি উদ্ধার করেন।[১] চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিটিতে ছিল বিভিন্ন পদকর্তার রচিত ৪৬।। টি ছোট ছোট গান। গানগুলির সুবিস্তৃত সংস্কৃত টীকা ও গ্রন্থটিতে আছে। প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মুল গ্রন্থের একটি তিব্বতী অনুবাদে ৫১টি গীতি আবিস্কার করেন। আরো দুটি পুঁথি সিদ্ধাচার্য সরহ এবং কাহ্ন-রচিত দোহা সংগ্রহ এবং ডাকার্ণব রচিত ছিল দোহা সংগ্রহ। শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থই শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত এবং সংস্কৃত টীকাযুক্ত। আচার্য সুনীতিকুমার চর্যাগীতিগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলেন যে এগুলির ভাষা প্রাচীনতম বাংলা ভাষার লক্ষণাক্রান্ত এবং এর ব্যাকরণরীতি ও বাকভঙ্গী একান্তই বাংলা। গীতগুলির এমন অনেক প্রবাদ আজও বাংলাদেশে সুপ্রচলিত। এছাড়া এগুলিতে যে পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুপরিস্ফুট তা একান্তই নদীমাতৃক বাংলার।[২] গীতগুলিতে কোথাও জীবন চিত্র, জীবনের সৌন্দর্যানুভুতি, কোথাও বা লোক-জীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। যেমন শবরপাদের চর্যাগীতিকার মধ্যে পর্বত বাসিনী শবরকন্যা ও উন্মুক্ত শবরের মধ্যে নরনারীর আসক্তিপূর্ণ জীবন লীলা এবং অঙ্গসজ্জার রূপ সুন্দর কথায় ফুটে উঠেছে।[৩] বিশেষ করে সন্ধ্যাভাষিত চর্যাগীতিগুলিতে, সমসাময়িক জীবনের যে ছবি উঠেছে তা মধ্যকালীন সাহিত্যে নাই। চর্যাগীতিতে যে জীবনচিত্র কলোদ্ভাসিত তা দেবদেবীর নয়। রাজা প্রজা বা ব্রাহ্মণ শূদ্রের নয়। সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ও আচরণের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে এই গানগুলিতে যা ঐতিহাসিকের কাছে অতি মুল্যবান।[৪]

---

১ শ্রী অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ১০৬-১০৭।

২ নীহাররঞ্জন রায়, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৬০৭-৬০৮।

৩ মনীন্দ্রমোহন বসু, সম্পাঃ, <u>চর্যাপদ</u>, (কলিকাতাঃ ১৯৪৩), পৃ. ৫২।

৪ শ্রী সুকুমার সেন, <u>চর্যাগীতি পদাবলী</u>, (কলিকাতাঃ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৫৬), পৃ. ২৪।

শবর শবরীদের পাহাড়ী জীবন যাত্রার সুন্দর বর্ণনা একটি পদে উল্লেখ আছে, "পর্বতের সুউচ্চ শিখর চূড়ায় যে শবর কন্যা গলায় গুঞ্জার (gunjuri) মালা পরিয়া শিরে শিখি পাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কটিতে ময়ুরের পাখা জড়িয়ে কানে কুণ্ডল পরে, তাহাকে দেখিয়া আচার্য শবরপাদ সব ভুলিয়া যান, নিজ স্ত্রীকেই পরস্ত্রী মনে করিয়া উন্মুক্ত হইয়া উঠেন, শবরী বোধ করি স্বামীর এই পরনারী আসক্তি-কে কিঞ্চিৎ ভৎসনা করে। কিন্তু পরে পুষ্প গাছগুলি যে ভরিয়া উঠিয়াছে। তখন খাট পাতিয়া শয্যা রচিত হইল। কর্পূর যুক্ত তাম্বুল সেবা করিয়া উভয়েই রাগ রক্তিম হইয়া উঠিলেন, নিবিড় আনন্দের মধ্যে সমস্ত রাত্রি পোহাইয়া গেল"।[১] অপর একটি গানে জানা যায়, শবরী বালিকার কানে কুণ্ডল পরিহিত সে বনে নিজেকে একাকীত্ব অনুভব করে এবং যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়।[২] একটি পদে উল্লেখ আছে, রাত্রিতে বধু ঘুমাইয়া আছে। চোর সেই অবসরে বধুর কর্ণাভরণ চুরি করিয়া পলাইল। শশুর নিদ্রিত, বধুটি জাগিয়াছে, কোথায় গিয়া সে কানের অপহৃত অলংকার খুঁজিবে?[৩] এখানে সেকালের রমণীর অলংকার প্রীতির চিত্র স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।[৪]

একটি গীতে বর্ণিত হয়েছে ডোম্বী রমণী একটি পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে নাচছে, পদ্মটি ৬৪টি পাঁপড়ি যুক্ত।[৫] অন্য একটি গানে বৌদ্ধনাটক এবং নৃত্যের উল্লেখ আছে।[৬] অনেক বাদ্যযন্ত্রের নামও বিভিন্ন গীতে জানা যায়।[৭] প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে আমরা দেখে থাকি শবর,

---

১ মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাঃ, চর্যাপদ, গীত নং ২৮ এবং ৫২।

২ তদেব, গীত নং- ৫২।

৩ তদেব, গীত নং- ২।

৪ তদেব, গীত নং- ৩২।

৫ তদেব, গীত নং- ১০।

৬ তদেব, গীত নং- ১৭।

৭ তদেব, গীত নং- ১৯, ১৭।

নিষাধ, পুলিন্দ রমণীরা পত্রের কটিবন্ধ পরিধান করে তাদের শুধুমাত্র লজ্জা নিবারণ করেছে। তাদের শাড়ী পড়তে দেখা যায় তাদের পোষাক গাছের পাতা বা ময়ূরের পালক গুচ্ছ দিয়ে হত।[১] কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোকের উদ্ধৃতি থেকে পুলিন্দ রমণীদের গুঞ্জার বীচি (gunja seeds) দিয়ে মালা গেঁথে পরার কথা জানা যায়।[২] শবর পাদের চর্যাগীতি দুটিতে আদি রমণীদের জীবন চিত্র সূক্ষ্ম রেখায় কিন্তু নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয়েছে, "পাহাড়ের টিলার উপর তাদের বাড়ী, বাড়ীর পাশেই কার্পাস ভুঁই। কাংনি দানা ফসল উঠিলে হাঁড়িয়া তৈয়ারী করে এবং তা খাইয়া প্রমত্ত হয়", এই প্রমত্ততার চিত্র পাহাড়-পুরের ভগ্ন মন্দির ভিত্তিতে পোড়ামাটির ফলকে পাওয়া যায়।[৩] কোন কোন গীতি রমণীদের খেয়া পারের কাজ পরিচালনা করার কথা জানা যায়।[৪] একটি গীতে তুলা ধোনার কথা আছে। মাদুর ও মোটা কাপড় বোনার বিবরণও পাওয়া যায়।[৫]

অতএব চর্যাপদগুলি থেকে আমরা ধারণা করতে পারি বঙ্গদেশের সামাজিক আর্থিক জীবনের মানদণ্ডের কথা, "বাঙালী মানেই ছিল গরীব বেচারা এমন তথ্য পাওয়া যায় কয়েকটি পদে।[৬] তবে এ সময়ের কয়েকটি পরিধেয় অলংকারের উল্লেখ চর্যাপদে যেমন উল্লেখ আছে। যাজন-নূপুর (ঘন্টা নেউর), কাঁকণ (কাঙ্কান), মুক্তাহার (মুত্তিহার), এবং 'কুণ্ডল' এর প্রসাধন কালে দর্পন বা আরশির ব্যবহার রমণীরা করত বলে

---

১ মনীন্দ্রমোহন বসু সম্পাঃ, চর্যাপদ, গীত নং- ২৮, S. Hussain, J.V.R.M., Vol. 5, P. 65.

২ চর্যাপদ, গীত নং- ২৮।

৩ শ্রী সুকুমার সেন, চর্যাগীতি পদাবলী, গীত নং- ২৮, ৫০, পৃ. ৩৪।

৪ চর্যাপদ, গীত নং- ১০,১৩,১৪,১৫,৩৮,৪৯।

৫ চর্যাগীত পদাবলী, গীত নং- ২৬,২৫।

৬ তদেব, গীত নং- ৩৯, ৪৯।

জানা যায়।[১] আরো উল্লেখ করতে হয় চর্যাপদ বাংলা ভাষায় আদিম যুগের নমুনাই শুধু নয়, পালযুগের সাধারণ বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দানে বিশেষ সহায়ক তথ্যের সন্ধান দেয়। প্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ এর বর্ণনার সাথে সমকালীন সাহিত্যিক তথ্যের সমর্থন মেলে। য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ প্রাচীনকালের রমণীদের নানা রকমের অলংকার পরিধানের কথা লিখেছেন। সেসময় রমণীরা শিরে অলংকার, হাতে বালা, গলায় হার, মাথায় টায়রা এবং আঙুলে আংটি ব্যবহার করত।[২] অতএব বলা যায়, চর্যাগীতিতে বিধৃত সমাজ একান্তভাবে বাঙালীর। অনেকগুলি গীতেই বাঙালীর সমসাময়িক গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। ময়ূর পুচ্ছ, হাড়ের ও গুঞ্জার মালায় সৌন্দর্যের ও প্রসাধনের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হত। কার্পাস ফুল, পাকা ধানই সে সময়ের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত দেয়। আবার অভাবক্লিষ্ট সমাজের কথা জানা যায় চর্যাগীতিতে। প্রস্ফুটিত পদ্ম দলের উপর নৃত্যরতা নারীর উপমা সে সময়ের নৃত্যকলার উৎকর্ষের সাক্ষ্য। মোটের উপর চর্যাগীতিতে বাঙালার আদিবাসী কৌম, শবর, পুলিন্দ, ডোমদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস সংস্কার রীতি রেওয়াজ, জীবন জীবিকা ও সমাজ সংস্কৃতির কিছুটা পরিচয় পেয়ে থাকি।[৩]

আরবীয় লেখক সুলায়মান এবং আবু জাহিদের বর্ণনায়ও রমণীদের গহনা ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তাঁরা নবম শতকে ভারতে এসেছিলেন। ঐতিহাসিক আল বেরুণী লিখেছেন, বিভিন্ন উৎসবে রমণীদের অলংকার ব্যবহারের কথা। রমণীদের সঙ্গে তাদের পুরুষ সঙ্গীও অলংকার পরিধান করত।[৪] একাদশ শতকের ঐতিহাসিক আল বেরুণীর বর্ণনায় ভদ্র পরিবারের মেয়েদের বেশবাস সম্পর্কে জানতে পারা যায়, রমণীরা নীচের

---

১ <u>চর্যাগীত পদাবলী</u>, পৃ. ৩৫।

২ T. Watters, <u>op.cit.</u>, p. 151.

৩ আনিসুজ্জামান সম্পাঃ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৪৩৪-৪৩৭।

৪ S. Sahay, <u>Op.Cit.</u>, P. 163.

হাতে শাখা, উপরের হাতে 'বাহ্খড়' গলায় সাতেসরী বা দেবচ্ছন্দ হার, মাথায় হংস-পদিকা, কানে সোনার তোরঙ্গ বা কচি তালপাতার অবতংস তালীপত্র (কুণ্ডল), পরত, পরণে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, মলমল বা পাটের কাপড়, মেঘ উদুম্বুর', 'গঙ্গাসাগর', 'লক্ষ্মীবিলাস', 'দ্বারবাসিনী', 'সিলহটি', 'গার্গেয়ী', কত নামের শাড়ী ছিল সে সময়।[১] যা হোক, দশম একাদশ শতকের বাংলার গীতিকথায় সমাজ এর কথা পাওয়া যায় বেশী। গীতি কথায় অতি প্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ থাকে কিন্তু শতকে শতকে গল্পগুলির কথ্য ভাষার রূপ পরিবর্তিত হলেও এগুলি অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাণবন্ত। এগুলিতে ভেসে আসে, প্রাচীন কালের রাজকন্যার এলোকেশ চুল, মেঘউম্বুর শাড়ী, আর চন্দন রাঙা চাদর', মালা, চন্দন এসব ছিল উচ্চ পর্যায়ের বেশবাস।[২]

---

১ শ্রী সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, (কলিকাতাঃ ১৯৭৪), পৃ. ৩৬-৩৭।

২ তদেব, পৃ. ৩৫।

পঞ্চম অধ্যায়

ক) প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণঃ

বেশ ও ভূষণ অর্থাৎ পোষাক, অলঙ্কার, শিরোবিন্যাস এসব কে মিলিতভাবে মানুষের অঙ্গসজ্জা বা দেহসজ্জা বলা হয়। এই সাজসজ্জার মাঝেই মানুষের সৃজনীশক্তি ও শিল্পীমনের প্রথম বিকাশ। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজের কথা শোনা যায় না যারা পোষাক ও রূপ-চর্চাকে একেবারে উপেক্ষা করেছে।[১] এই সুন্দরের প্রতি আনুগত্য থেকে সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনে অগ্রসর হয়েছে এবং সত্য ও সুন্দরের চর্চার মাধ্যমেই সভ্যতার পরিচর্যা এবং বিকাশ সম্ভব হয়েছে। প্রয়োজনের তাড়নায় যেমন তেমনি আনন্দের বশেও মানুষের সৃষ্টি শক্তি গতি লাভ করেছে। এই দুই ধরণের আত্মপ্রকাশের মাঝে শিল্পের দুটি ধারা গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রয়োজনের উপর যে সৃষ্টি নির্ভর করেছে তা আবশ্যিক শিল্প, যেমন-পোষাক, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, কেশবিন্যাস এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। অপরটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত আনন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত তা ললিতকলা বা চারুকলায় রূপায়িত হয়েছে। এরূপ সৃষ্টি কেবল মানুষের সৌন্দর্য বৃত্তিকে চরিতার্থ করেছে যেমন চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাহিত্য, কাব্য, সংগীত, নাট্যকলা ইত্যাদি। কিন্তু দুটি শিল্পচর্চা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একটি ভিন্ন অপরটির সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখে থাকি জীবনের আবশ্যিক বিষয়গুলি চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির ফলকে প্রতিভাসিত হয়েছে সভ্যতার আদিকাল থেকেই। প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রথমতঃ এই কলা শিল্পের উপরই নির্ভর করতে হয়। এছাড়া প্রাচীন সাহিত্য থেকে এ বিষয়ে কিছু লিখিত তথ্য আমরা পেয়ে থাকি। সুতরাং প্রাচীন বাংলার প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান সমূহে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা ও সাহিত্য থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বাঙ্গালী রমণীর বেশ-ভূষণ এর প্রতি আলোকপাত করা সম্ভব। বাঙ্গালী রমণীর বেশ-ভূষণের তথ্য সম্বলিত ইতিহাস এ দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক

---

১ তোফায়েল আহমেদ, আমাদের প্রাচীন শিল্প, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ১৯৬৪), পৃ. ১১১।

ইতিহাসের গতানুগতিকতার মাঝে বৈচিত্র নিয়ে আসতে পারে। অপরপক্ষে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অপরিসীম। বেশ ও ভূষণ মানব জগতের সর্বকালের ও সর্বসাধারণের একটি অভিব্যক্ত চিত্র যা দিয়ে নির্ণয় করা যায় মানব সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায় এবং সংস্কৃতির বিচিত্র রূপ।

আমরা দেখেছি সভ্যতার প্রাথমিক স্তর থেকে নারী পুরুষ উভয়েই প্রাকৃতিক বৈভব প্রত্যক্ষ করে নিজেদের অলঙ্কৃত ও শোভিত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তারা ফুল, বীজ, উদ্ভিজ, ফল, হাড়, হস্তিদন্ত দিয়ে সজ্জিত করেছিল নিজেকে। ঘাস বা লতায় গেঁথে এবং পুঁতি, কাঁচ, পাথরের গুটিকা দিয়ে গহনা তৈরী করে অঙ্গে ধারণ করেছে। কিন্তু পুরুষেরা তাদের কর্মব্যস্ত জীবনে রূপচর্চার জন্য পরবর্তীতে আর সময় ব্যয় করতে পারেনি, ফলে বেশ ও ভূষণ চর্চা কেবল রমণীদের চিরাচরিত রীতি হয়ে থেকে যায়।

সমসাময়িক প্রস্তর ও ধাতব দেবদেবীর মূর্তিতে, পোড়ামাটির অসংখ্য ফলকে প্রাচীন বাঙালী রমণীদের বসনভূষণ সম্বন্ধে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করে থাকি, তা হল শাড়ীই ছিল সে সময়ের মেয়েদের সাধারণ পরিধেয়। তবে একটু সংগতিপূর্ণ পরিবারের রমণীরা ভদ্রবেশ হিসেবে আর একখন্ড সেলাইবিহীন বস্ত্রের ব্যবহার করত, যাকে উত্তরবাস বা ওড়না বলা হত। পায়ের কব্জি পর্যন্ত শাড়ী ঝুলিয়ে কোমরে একাধিক প্যাঁচ দিয়ে অধোবাস রচনা করত নারীরা।[১] এ প্রসঙ্গে ডঃ শাহানারা হোসেন বলেন, "From Archaeological as well as literary evidence we know that the under garments of women were kept in position by girdle belts. As their upper garments women wore bodices, something like modern blouses and scarfs"[2] তাঁর মতানুসারে দেখা যায়, রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদের

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫২।

২ Shahanara Hussain, S.L.W.E.M.B. pp. 52-53.

মধ্যে দিয়ে শালীনতা রক্ষা করাও প্রধান বিষয় ছিল তাই তারা দেহের উর্ধাংশে ব্লাউজ বা জামা এবং কোন কোন সময় ওড়না ব্যবহার করেছে।

ডঃ হোসনে আরা শাহেদ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "শাড়ীর আদি রূপ একখন্ড বস্ত্র বা দুটি বস্ত্র। দু'টুকরো কাপড়ই কালক্রমে শাড়ীতে রূপ নিয়েছে। ধুতি ও শাড়ী এক রকম বস্ত্র নয়। পুরুষদের পরিধেয় ধুতি ছিল স্ত্রীলোকের চেয়ে খাটো। রমণীরা আদিকাল থেকেই কাপড় পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরেছে, তাদের পরার ধরণ ছিল ভিন্ন। বিভিন্ন ধাঁচে কাপড় পরিধানের এমন রীতি রমণীদের করেছিল স্বতন্ত্র এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন"।[১] লেখিকা আরো বলেছেন, "রমণীরা বসনখন্ড কোমরে জড়ানোর পরে শেষ অংশটুকু সামনে অথবা পেছনে ঝুলিয়ে রাখত। এটিকে পুরুষের ধুতির কাছা বলা যায়না, তারা সামনের দিকে শাড়ীর কুঁচি বা ভাঁজ দুপায়ের মধ্যস্থলে দুলিয়ে অঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করত। তাদের শাড়ী পরার রীতি ছিল কাছাবিহীন ঢংয়ে"।[২] আমরা ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতের সাথে লেখিকার বক্তব্যের মিল খুঁজে পাই। নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমতে, "পুরুষদের মত মেয়েদের বসন প্রান্ত পশ্চাৎদিকে টানিয়া কচ্ছে রূপান্তরিত নয়"। তবে রমণীদের মাঝে শাড়ীর সাহায্যেই উত্তরবাস রচনা করে দেহ আবৃত করার প্রচলন কমই ছিল। তারা একখন্ড কাপড় বা ওড়নার দ্বারা উত্তরার্ধের কিছু অংশ ঢেকে রাখত। কিন্তু দরিদ্র রমণীরা তাঁদের একবস্ত্রের অঞ্চল টেনে কখনো অবগুণ্ঠনের কাজ করত।[৩]

এই শাড়ী শব্দের অর্থ এবং এ শব্দের ব্যবহার কখন থেকে সে সম্পর্কেও পুরনো লেখমালা, মূর্তি বিগ্রহ, পোড়ামাটি ফলকচিত্র এবং বিচ্ছিন্ন কিছু সাহিত্যিক উপাদানের ভিত্তিতে ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি তত্ত্ব দাঁড় করানো যায়। মোহেনজোদড়ো থেকে শুরু করে গুপ্তযুগে অজন্তা, ইলোরার গুহা প্রাচীর চিত্রের রমণীদের

---

১ হোসনে আরা শাহেদ, শাড়ী, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২৬।

২ তদেব, পৃ. ২৭।

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।

পরণে শাড়ী শোভিত আছে। এ থেকে শাড়ী পড়ার প্রচলন এ সময়েও ছিল বলা যায়। কিন্তু শাড়ীর ব্যবহার তারও পূর্বে থেকে কারণ, জানা যায় আর্যদের সময় শাড়ীকে 'সাটিকা', 'শাটী', বলা হত। 'সাট্কা' বা 'সাটিকা' শব্দটি পালি। মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা সংকলণে পালিতে সাট্কা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আবার সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধানে শাড়ী শব্দের অর্থ 'শাটী', সংস্কৃত শব্দ। শাটীঃ স্ত্রীং সং, পরিধেয় বস্ত্র, শাড়ী।[১] কিন্তু বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থ থেকে জানা যায় বৈদিক 'ছান্দস' ভাষার সংস্কার করা পরিমার্জিত শব্দ সংস্কৃত। স্থানীয় ভাষার কাছে তার অনেক ঋণ। আর্যরা তাদের প্রচলিত বহু শব্দ চয়ন করেছে স্থানীয় অস্ট্রিকদের কাছ থেকে। অনুমিত হয় 'শাটী' সংস্কৃত পূর্ব কোন শব্দ হতে পারে।[২] অতএব আর্যদের অনেক পূর্বে খ্রীস্টপূর্ব হাজার হাজার বছর আগে এই দেশেই শাড়ীর ব্যবহার প্রথম উদ্ভাবিত হয় তা সুস্পষ্ট।

সাহিত্যিক সাক্ষ্য, বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণনা, প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি থেকে তৎকালীন রমণীরা কি ধরণের পোষাক অলঙ্কার ব্যবহার করত তার সঠিক তথ্য আমরা লাভ করে থাকি। সভ্যতার আদিকাল থেকে বাস্তবিক কারণেই সমাজের প্রভাব শিল্পকলায় অতি প্রকটরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। পোড়ামাটির পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলক এবং প্রস্তর, ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য বাংলার পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতীতে আবিস্কৃত হয়েছে। পাহাড়পুরের মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয় সেকালের বাঙ্গালী রমণী সাধারণতঃ এখানকার মতই একখানা শাড়ী কাছা অথবা কাছাবিহীন ঢংয়ে পরিধান করত। রমণীদের শাড়ী পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত পৌঁছিত এবং তা কেবল দেহের নিম্নার্ধ আবৃত করত। নাভির উপরের অংশ কখনো অনাবৃত দেখা গেলেও তারা সাধারণতঃ ওড়না ব্যবহার করছে (চিত্র নং- ৩২,৩৩ক, ৩৪ক,৩৫গ,৩৬ক)। কখনো রমণীরা স্কার্ট বা ঘাঘরার মত বসন পরিধান করেছে ভারতীয় রমণীদের মতই (চিত্র নং-৩৪ক)। তারা নিম্নবসনকে কোমরের সঙ্গে আঁটসাঁট রেখেছে একটি কটিবন্ধনীর দ্বারা (চিত্র নং-২৭ক ও খ, ৩১খ, ৩২ক,৩৫খ)। নর্তকী

---

১ সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, মহাত্মা রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। ৪র্থ সং, রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবর্তিত ও সংশোধিত।

২ হোসনে আরা শাহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

নারীরা পরেছে পায়ের কণ্ঠা পর্যন্ত বিলম্বিত আঁটসাঁট পায়জামা, তারা দেহের উর্ধাংশে কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখত একটি দীর্ঘ ওড়না, নৃত্যের গতিতে ওড়নার প্রান্তদ্বয় উড়ত লীলায়িত ভঙ্গিতে[১] (চিত্র নং- ২৬,২৭ক,৩৬খ)। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে আরো জানা যায় যে, নিম্নকোটিস্তরের শবর, নিষাদ, পুলিন্দ রমণীরা পত্রের কটিবন্ধনী পরিধান করে নিম্নাঙ্গ আবৃত করত, কখনো তারা উপবীত ধাঁচে উর্ধাঙ্গে পর্ণমাত্র পরিধান করত (চিত্র নং-৩৯ক ও খ)। তারা তাদের পোষাক অনেক সময় ময়ূরের পালকগুচ্ছ দিয়ে সজ্জিত করত। এছাড়া শবরী রমণীরা শাড়ী এবং কুচবন্ধনী পরত (চিত্র নং- ৩৮খ ও ৪০)।

মহাস্থানগড়ের প্রত্ন সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় রমণীদের প্রধান বসন হিসেবে শাড়ী এবং উত্তরবাসরূপে একখানি ওড়নার ব্যবহার ছিল (চিত্র নং- ১৯ক, ও খ, ২০ক)। নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়, যেমন অলঙ্কৃত মুকুট, দুই তিন সারি গুটিকার মেখলা, কর্ণে ঝাঁপা কুন্ডল ইত্যাদি (চিত্র নং- ১৬,১৭,১৮,২০খ)। এ অঞ্চলের রমণীদের গলায় গলবন্ধনী আকৃতির গুটিকার হার, হাতে হালকা বলয় এবং কখনো কেয়ূর পরতে দেখা যায়। তারা শিরে খোঁপা বেঁধে কেশবিন্যাস করত (চিত্র নং- ১৬,১৮,১৯ক)। এখানে প্রাপ্ত সাক্ষ্যে গুটিকার অলঙ্কারে ভূষিত ও বৃহৎ কেশবিন্যাসে শোভনীয় দেবীর চিত্রে মনে হয় সে সময় রমণীরা উন্নত ও সৌখিন জীবন যাপন করত (চিত্র নং- ১৭খ)। ময়নামতীতে প্রাপ্ত সাক্ষ্যেও দেখা যায়, রমণীরা শাড়ী পরেছে কাছাবিহীন রীতিতে (চিত্র নং- ৪৯গ)। কেউ কেউ কোমরে জড়িয়ে আঁটসাঁট নিম্নবসন পরিধান করেছে যা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র নং- ৪৮ক ও খ)। এখানকার রমণীদের ওড়না পরার তথ্য পাওয়া যায় (চিত্র নং- ৪৯ক ও খ)। রঙিণ পাথরের ছোট-বড় গুটিকার হার, তাম্রের চুড়ি, আংটির নিদর্শন থেকে আমরা এ সময়ের রমণীদের অলঙ্কার পরিধানের ধারণা পেয়ে থাকি (চিত্র নং- ৫০,৫১,৫২)। তারা ঘাড় সংলগ্ন করে খোঁপা বাঁধত। কর্ণে কুন্ডল, গ্রীবাদেশে হার, খোঁপায় অলঙ্কার পরিধান করত (চিত্র নং-৪৮,৪৯)। ময়নামতীর মূর্তিগুলিতে বৃহৎ খোঁপায় অলঙ্কার দিয়ে সজ্জিত রমণীদের চিত্র নজরে পড়ে। যা দেখা যায়

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে (চিত্র নং- ৪৫গ)। এ ছাড়া এখানে নানা কৌশলে সুবিন্যস্ত কেশই ছিল রমণীদের শিরোভূষণ। কপালের উপর দুল্যমান কুঞ্চিত কেশদাম বস্ত্র-খন্ড দ্বারা ফিতার মত করে বেঁধে, কখনো লম্ববান কেশগুচ্ছ ঘাড়ের উপর খোঁপা বেঁধে কেউ কেউ মাথার পশ্চাদিকে এলিয়ে কেশ বিন্যাস করত (চিত্র নং- ২২,২৩, ২৫,২৬,৩৩ক ৩৪ক, ৩৫গ, ৩৭খ)। চূড়াখোঁপা বা পাখার মত করে চুল বেঁধে অথবা অলঙ্কৃত করে এবং শিরে নানা প্রকার অলঙ্কার সংযুক্ত করে চুল বাঁধার রীতি এ স্থানের রমণীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় (চিত্র নং- ২৮,৩৬ক,৩৮ক,৪৩ক,৪৪খ, ৪৫ক)। অনুরূপ পাখা আকৃতির কেশবিন্যাস রচনা করে শিরে মুকুট পরিধান করে সাজসজ্জা করা রমণীদের মাঝে প্রচলিত ছিল ময়নামতীতেও (চিত্র নং- ৪৮ক)। আবার পাহাড়পুরের রমণীদের মত স্কার্ট বা ঘাঘরা জাতীয় পোষাক পরিহিতা রমণীর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড়ে (চিত্র নং- ৩ ও ৪খ)। তাদের মাঝে শাড়ী পরার রীতিও ছিল (চিত্র নং- ৫ক ও ৫গ, ৯ক ও খ)। এখানকার রমণীরা দেহের উর্ধাংশে ওড়না ব্যবহার করত (চিত্র নং- ৪ক ও ৭গ)। রমণীদের দেখা যায় প্রায়শঃই বিবিধ অলঙ্কার ভারগ্রস্তা থাকতো। তারা শিরে বৃহৎ কেশবিন্যাস করত পাথরের, অথবা মুক্তার গুটিকার গাঁথা অলঙ্কার ও পাঁচ থেকে দশটা পর্যন্ত অস্ত্রাকৃতি চুলের কাঁটা সংযুক্ত করে (চিত্র নং- ৪ক, ৬ক)। এছাড়া ললাটের উর্ধাংশে গুটিকার বন্ধনী ও একটু নিম্নে টিকলীর ব্যবহার করে রমণীরা প্রায়শঃই শোভিত থেকেছে (চিত্র নং- ৬ক ও খ এবং ৭ক ও খ)। তদ্রূপ বৃহৎ পাখির ঠোঁট আকৃতির মস্তক দেখা গেছে পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত রমণী মূর্তিতে (চিত্র নং- ১)। এমন আকৃতির শির দৃষ্টে অনুমান করা যেতে পারে এটাই ছিল সে সময়ের কেশবিন্যাসের এক বিশেষ রীতি। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটি ফলকে রমণীদের মাথা চ্যাপ্টা পেরেক আকৃতির কর্ণাভরণ, ঝুলন্ত মুক্তার অথবা পাথরের গুটিকার সারিযুক্ত কানদুল পরার তথ্য পাওয়া যায় (চিত্র নং- ৪খ, ৭ক ও খ)। কেন্দ্রে মণিমুক্তা খচিত অলঙ্কার সংযুক্ত ঝুলন্ত হার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকৃতির অলঙ্কারযুক্ত গলবন্ধনীর ন্যায় নেক-লেস, দীর্ঘ হার যা বক্ষস্থলের নীচ পর্যন্ত ঝোলান এবং কয়েকসারি গুটিকার পঞ্চলহর হারের সাক্ষ্য মেলে এখান থেকে (চিত্র নং- ২ক,খ,৪খ, ৬খ ও গ, ৭ক)। চক্ষু আকৃতি, পাখা সদৃশ কেশবিন্যাস করত এখানকার রমণীরা। মস্তকের ডান অথবা বাম দিকে বৃহৎ

খোঁপা বেঁধে সারিবদ্ধ গুটিকা দ্বারা সজ্জিত করা এবং অলঙ্কার খচিত বন্ধনী ও মুকুট পরিধান করার প্রচলন থেকে সে আমলের রমণীদের বিলাসবহুল জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় (চিত্র নং- ২ক ও খ, ৪ক, ৬গ, ৭ক ও গ, ৮ক, খ,গ)। রমণীদের সাজসজ্জায় মুক্তা বা পাথরের গুটিকা খচিত কটিবন্ধনী এবং হাতে ভারী পুরু বলয় ও চুড়ির ব্যবহার, পায়ে মল ও স্যান্ডেলের নমুনা এ অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে (চিত্র নং- ২কওখ, ৪ক ও খ, ৬ঘ, ৭খ, ১০ক,খ,গ)। এখানকার অভিজাত রমণীদের মাঝে ফুল হাতা ফ্রক বা ঘাঘরা পরিধানের রীতি ছিল (৩ক ও ১০ক)। চিত্রিত পান্ডুলিপিতে রমণীদের দেখা যায় রঙিণ নক্সী হাতওয়ালা ব্লাউজ পরিধান করতে (চিত্র নং-৫৪)। পোড়ামাটির ফলক ও ভাস্কর্য থেকে সেকালে নারীদের উত্তরবাস ও তাদের শাড়ী নানা প্রকার ফুল এবং জ্যামিতিক নকশা দ্বারা মুদ্রিত থাকত বোঝা যায় যেমন দেওপাড়া, রাজশাহীতে প্রাপ্ত গঙ্গা মূর্তিতে দেবীকে সুচ্ছ শাড়ী পরিহিতা দেখা যায় যা গোলাপ ফুল আকৃতির নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত (চিত্র নং-৬৩ক)।

মোটকথা প্রাচীন বঙ্গের রমণীরা নিম্নবাস হিসেবে একখানা কাপড় পরিধান করত যা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত লম্বা ছিল (চিত্র নং- ৬৩খ)। সম্ভবত এ ধরণের নিম্নবসন বাংলার পাল আমলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রাচীন ভাস্কর্যে রমণী মূর্তিকে দেখা যায় নিম্নবসন শরীরের নিম্ন অংশকে গোলাকারভাবে আবৃত করে পরিধান করতো। এই বসন মনে হয় শাড়ী। যার আবার উর্ধমুখভাবে বিন্যস্ত। রমণীর উর্ধাঙ্গ আংশিক আবৃত এবং শাড়ীর এক অংশ তার বাম কাঁধের উপর দিয়ে বাম হাত সম্পূর্ণ আবৃত করেছে। বাম পায়ের বাঁদিকে মনোরম ঝাঁজযুক্তভাবে বিন্যস্ত। প্রাচীন বাংলায় সাধারণতঃ শাড়ী দিয়ে দেহের উপর অংশ আবৃত করা হত না। উর্ধ্ব অংশ কোন কোন সময় আংশিক আচ্ছাদিত করা হত ওড়না দিয়ে। এছাড়া এক ধরণের উর্ধ্ব বসন হিসেবে চোলী অথবা স্তনপট্টের ব্যবহারের তথ্যও পাওয়া যায় (চিত্র নং- ২৩)। মহিলাদের উর্ধ্বাঙ্গের পরিধেয় সম্ভবতঃ কখনো কখনো বাহুর উর্ধ্ব অংশ আচ্ছাদিত করে দেহের নিম্নদেশ পর্যন্ত আসতো। এরূপ একটি সরস্বতী দেবীর ভাস্কর্য চব্বিশ পরগণা থেকে পাওয়া গেছে (চিত্র নং- ৬৪ক)। দেবীর পরিহিত

উর্ধ্ববসন দুই পার্শ্বে ঝুলন্ত যা অত্যন্ত মনোরম মনে হয়। তবে কেহ কেহ আবার উত্তরবাস রূপে সেলাই করা 'বডিস' জাতীয় এক প্রকার জামার সাহায্যে স্তন এবং বাহুর নিম্ন ও উর্ধ্ব পর্যন্ত দেহাংশ ঢেকে রাখত (চিত্র নং-২৫)। সন্দেহ নাই, এ ধরণের উত্তরবাসের ব্যবহার নগর ও উচ্চকোটি স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। নারীর পরিহিত এই উত্তরবাস ও শাড়ীর তথ্য সমসাময়িক পান্ডুলিপি চিত্রের সাক্ষ্যে সুস্পষ্ট।[১] চব্বিশ পরগণায় প্রাপ্ত লক্ষী দেবীর পরণের নিম্নবসন নকশায় সমৃদ্ধ এবং আঁটসাঁট অলংকৃত কটিবন্ধের সাহায্যে কাপড়টি কোমরে আঁট-কানো। কটিবন্ধের গাঁটটি ঠিক নাভির নীচেই দুল্যমান। এই দেবী বহু অলঙ্কারে সুসজ্জিতা (চিত্র নং- ৬৪খ)।

প্রাচীন বাঙালী রমণীরা প্রসাধনী হিসেবে কপালে কাজলের টিপ পরত এবং সীমান্তে সিঁদুরের রেখা টানত, পা রঞ্জিত করত লাক্ষারস অলক্তক দিয়ে, ঠোঁটে দিত সিঁদুরের রং, দেহে ও মুখমন্ডলে মাখত চন্দনের গুঁড়ো ও চন্দন পঙ্ক, মৃগনাভী, জাফরান প্রভৃতি। রমণীরা খোঁপায় ফুল গুঁজে, গলায় ও হাতে ফুলের মালা জড়িয়ে বিলাস ও প্রসাধন করত। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রসাধনরত রমণীর চিত্রটি সুবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রমণী বাম হাতে আয়না ধৃত (চিত্র নং-৬৪ক)। মনে হয় যে প্রসাধনে অতি ব্যস্ত চিত্রটি প্রাচীন বাঙালী রমণীর অঙ্গসজ্জা বা রূপচর্চার তথ্য দিয়ে থাকে। সমসাময়িক সাহিত্য ও প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য হতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় প্রাচীন বাঙালী রমণীরা কর্ণে কর্ণকুন্ডল, কর্ণাঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক, গলায় কণ্ঠহার, হাতে বলয়, কেয়ুর, কটিদেশে মেখলা, পায়ে মল পরত। শঙ্খ বলয়ের ব্যবহার মনে হয় শুধু বিবাহিতা রমণীরাই করত। একাধিক হার গলায় দিত রমণীরা এবং অনেক সময় পশ্চিম দেশীয় স্ত্রী লোকের ন্যায় হাতে অনেকগুলি চুড়ি, বালা পরত। ধনী রমণীরা সোনা, রূপা ছাড়াও মণিমুক্তার অনেক আভরণ ব্যবহার করত।[২] যেমন মুক্তাখচিত হার যা মহানীলরক্তশঙ্খমালা নামে পরিচিত। এছাড়া মূল্যবান পাথরের গুটিকার ও হীরক খচিত বিভিন্ন অলঙ্কার, রত্নখচিত ঘুঙুর, মরকত, নীলকান্তমণি প্রভৃতি রত্নাদি ব্যবহারের কথা জানা যায়। এ ধরণের অলঙ্করণ প্রসাধনে পটিয়সী ছিল সাধারণতঃ রাজ পরিবারের রমণীরা। মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থ রমণীদের এ মূল্যবান গহনা ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তারা শঙ্খবলয়, পুষ্প ও পত্রের মালা ও কর্ণাভরণ পরিধান করে সুসজ্জিতা হ'ত।

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।

২ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, "তখনকার মানুষ যে পোষাক ব্যবহার করত তার কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। তাই উপত্যকায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে এ বিষয়ে ধারণা করতে হয়"।[১] প্রাচীন ভারতে হরপ্পা সভ্যতা, অজন্তা, ভারহুত, সাঁচী, অমরাবতী, মথুরা, গান্ধার প্রভৃতি স্থানের প্রাপ্ত ভাস্কর্য মূর্তি থেকে ভারতীয় রমণীর বেশ ভূষার একটি সুন্দর চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। হরপ্পা সংস্কৃতির আবিস্কার এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। এখানে পোড়ামাটির শিল্পের মধ্যে মূর্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। রমণী মূর্তি গুলির পোষাক উপরের দিকটা শালের মত এবং নীচের অংশ ধুতির মত দেখায়। স্ত্রী-পুরুষের পোষাকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। পোষাকের জন্য সম্ভবত তুলো ব্যবহার করা হত। সেখানে দেখা গেছে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে অলঙ্কার পরিহিত। গলায় হার, কঙ্কন, বিচিত্র রকমের আংটি, শিরোভূষণ এবং অলঙ্কারের বাহুল্য হরপ্পা নিদর্শনগুলিতে দেখা যায়। অলঙ্কার নির্মাণে সোনা, রুপা এবং মূল্যবান ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে। মূলতঃ হরপ্পা সংস্কৃতির মূর্তিগুলিতে অধিকতর সাজসজ্জার চিহ্ন বর্তমান। মেয়েরা অধর রঞ্জনী ব্যবহার করত। হরপ্পায় পাওয়া একটি ভ্যানিটি ব্যাগ কৌতুহলের উদ্রেক করে। মনে হয় মধ্যবিত্তের সমৃদ্ধি এই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট। তাদের বিলাস দ্রব্য যেমন হাতির দাঁত, চুল আঁচড়ানোর জন্য হাতীর দাঁতের চিরুণী এবং বিশেষ করে রমণীদের সুতীবস্ত্র পরিধানের রীতির কথা জানা যায়।[২] হরপ্পায় প্রাপ্ত নর্তকী মূর্তিতে হাতভরা চুড়ি দেখা যায় (চিত্র নং- ৬৫ক)। রুপা ও তামার তৈরী আংটিগুলি খুব সাধারণ ধরণের। মোহেনজোদড়ো বাসীর রমণীরা হার, কেশবন্ধনী, বলয়, আংটি ব্যবহার করেছে। মেখলা, কানবালা, কটিবন্ধ, চন্দ্রহার, পায়ে মল ইত্যাদির ব্যবহার স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ তথ্যের সন্ধান পাই এখানকার ধ্বংস-স্তুপ থেকে প্রাপ্ত নারী মূর্তি নিদর্শন সমূহে। মোহেনজোদড়োয় প্রাপ্ত মৃৎফলক চিত্রে সাজসজ্জার জন্য হাতে আয়নার ব্যবহার রমণীদের ভূষণচর্চা ও অলঙ্কারের সুসমৃদ্ধ রূপের

---

১ সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২ তদেব, পৃ. ২৩-২৪।

পরিচয় দেয়। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত রমণীদের নানান অলঙ্কারের নিদর্শন সুদূর প্রাচীনকালের নারীদের বেশ ও ভূষণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যুগের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অলঙ্কার 'হার' দুই বা তিন সারি বিশিষ্ট ছিলো। গলবন্ধ ধাঁচের অলঙ্কারও উল্লেখযোগ্য। রমণী দেহে কানের সাধারণতঃ গহনা দেখা যায় না। সম্ভবতঃ উঁচু শিরোভূষণের জন্য কানের অলঙ্কার ঢাকা পরেছে।[১] তবে কিছু কিছু দেহভংগীমায় কানের কুন্ডল বা বৃত্তাকার কানদুল দৃষ্ট হয়। এখানকার প্রাপ্ত রমণী মূর্তিগুলিতে ফুল আকৃতি, ভি আকৃতির কানের গহনা এবং কপালের উপর যেখানে কেশ দুভাগ হয়েছে, এসব স্হানে মস্তক অলঙ্কার টিকলী পরিধান করতে দেখা যায়। বিভিন্ন ধাতুর তৈরী চুলকাঁটা এখানে পাওয়া গেছে। মেয়েরা মাথার সৌন্দর্যবর্ধক অলঙ্কার হিসেবে অথবা কেশকে যথাস্হানে আঁটকিয়ে রাখার জন্য চুলের কাঁটা ব্যবহার করত। বাহু এবং হাতের অলঙ্কারেরও ব্যাপক প্রচলন এ সময় ছিল। বাহুমূলের উপর প্রান্ত থেকে হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত কয়েক প্রকার বলয়, কেয়ূর ও চুড়ি নর্তকী রমণীদের মধ্যে পরিধানের রেওয়াজ ছিল। মোহেনজোদড়োয় প্রাপ্ত মৃৎফলকে রমণীদের কয়েক প্রকার কটিবন্ধের নমুনা পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কতগুলি লম্বা সারি-বদ্ধ অতি মূল্যবান প্রস্তরের গুটিকার। কম মূল্যের পাথরের একই ধাঁচে তৈরী কটিবন্ধও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু রমণী দেহে 'এস' আকৃতির অলঙ্কার দেখা যায়। এছাড়া এখানকার রমণীরা পায়ে মল পরিধান করত। কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতির ব্রোঞ্জের পা হতে এ তথ্য পাওয়া যায় এবং মৃৎফলক থেকেও এতথ্য জানা যায়। কিছু রৌপ্যের আংটি মোহেনজো-দড়োতে আবিস্কারের ফলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে প্রাচীনকালে রমণীদের মাঝে আংটির ব্যবহার ছিল। বৈদিক যুগের পুরুষ এবং রমণীরা একই প্রকার অলঙ্কার পরিধান করত, তবে পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য ও মহাকাব্যের যুগে নারী ও পুরুষের অলঙ্কারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধযুগের যে অলঙ্কারের নমুনা পাওয়া যায় সেগুলি সম্ভবতঃ সে সময় রমণীরা পরিধান করত। ভারতের অন্যান্য অংশেও মৌর্য পূর্বকালে রমণী দেহে

---

১ J. Marshall, Mohenjodara and Indus Civilijation, Vol.II, (London, 1937), pp. 18–19.

গলার অলঙ্কার, কানবালা, কোমরবন্ধ বা কটিবন্ধ, বালা, অনন্ত প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহারের কথা জানা যায়। অলঙ্কৃত বৃহৎ কেশবিন্যাসের ব্যবহার মোহেনজোদড়োয় প্রাপ্ত রমণী মূর্তিতে দেখা গেছে। এমন কেশবিন্যাসে কর্ণদ্বয় পর্যন্ত আবৃত আছে (চিত্র নং- ৬৬ক)। অপর একটি রমণী দেহে পরিহিত কয়েকটি হার এবং মস্তকাবরণ অতি প্রাচীন যুগের রমণীদের ভূষণ অলঙ্কারের প্রচলনের আভাস দেয় (চিত্র নং- ৬৫খ) রমণী তিনসারি কীলকযুক্ত কটিবন্ধনী পরিহিত।[1]

আমরা মৌর্য আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্য পোড়ামাটির ফলক চিত্র ও ভাস্কর্যে রমণীদের বেশ ও ভূষার তথ্য পেয়ে থাকি। খ্রীঃপূঃ ২য় শতকে উত্তর-পূর্ব ভারত বিহারের পাটনায় প্রাপ্ত নৃত্যরত রমণীর পরিধেয়ে একটি হাঁটু পর্যন্ত ঘাঘরা এবং ঊর্ধ্বাঙ্গে বাম কাঁধের উপর উত্তরীয় পরিহিতা দেখা যায় (চিত্র নং- ৬৭ক)। পোড়ামাটি ফলকে উৎকীর্ণ এই রমণীর ঘাঘরায় পাখা সদৃশ ঝালর ও কটিবন্ধনী লক্ষণীয়। সে তার হাতে পুরু মোটা বালা এবং কর্ণে গহনা পরেছে। রমণীর কেশবিন্যাস সাবলীল।[3] অপর একজন রমণীকে ভিন্ন ধাঁচের ঘাঘরা পরিহিতা দেখা যায়। মনে হয় ঘাঘরার অনেক কোলায় কুঁচি তবে সম্মুখ দিকটি উন্মুক্ত। পাটনায় প্রাপ্ত খ্রীঃপূঃ ২য় শতকের এই রমণী তার মস্তকে বৃহৎ মস্তকাবরণ এবং গলায় গলবন্ধনী আকৃতির হার, কোমরে কটিবন্ধনী পরিধান করেছে (চিত্র নং- ৬৬খ)।[4] একই সময়ে মধ্য ভারতের ভারহূত থেকে প্রাপ্ত ভাস্কর্য যক্ষীকে নিম্নবসন পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত আঁটসাঁট রূপে পরিহিত দেখা যায়। ঊর্ধ্বাংশে বক্ষস্তনের উপর দিয়ে একটি ভাঁজযুক্ত কাপড় পরিলক্ষিত হয়। রমণীর মস্তক মনে হয় কাপড় দ্বারা আবৃত। বহুল

---

১ S.K. Saraswati, A.S.I.S. pl. I, Fig-5.

২ Dhavalikar Madhaukar Keshov, Master piece of Indian Terracottas, pl. 4.

৩ S. Sahay, I.C.C.O. pl. V. Fig. 25.

৪ A.L. Bashan. W.T.W.I. pl. LXII,a

অলঙ্কারে ভূষিত এই রমণী (চিত্র নং- ৬৮খ)। কয়েক সারি গুটিকার কটিবন্ধনী এবং একাধিক হার ছোট বড় গুটিকাযুক্ত তার গলায়। হাতের মণিবন্ধে এবং পায়ের গোঁড়ালী চিকন গুচ্ছ চুড়ি ও মল পরিহিতা রমণী। তার নিম্নাঙ্গের বসন ভাঁজযুক্ত এবং সম্মুখে দুপায়ের মধ্যস্হলে ঝুলন্ত কুঁচি নিম্নদেশ পর্যন্ত ছুঁয়েছে। অপর একটি কাপড় খন্ড কোমরের সঙ্গে বন্ধনী সহকারে সামনে দোদুল্যমান।[১] ভারহুতে প্রাপ্ত অপর ভাস্কর্য মূর্তিটি 'চুলকোকা' দেবী, বৃক্ষ হস্তে দন্ডায়মানা। এই রমণীর নিম্ন বসনের ভাঁজযুক্ত কাপড় দুপায়ের মধ্যস্হলে নিম্নদেশ পর্যন্ত ঝোলান। একটি ফিতার মত কোমর বন্ধনী কটিতে ফাঁস দিয়ে ঢিলা রূপে বাঁধা, ফিতার দুটি প্রান্ত দোলায়িত বা উড়ছে মনে হয়। রমণীর মস্তক কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত। সে প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিতা (চিত্র নং- ৬৮ক)। গুটিকার ছয়লহর আর দুই হাতের মণিবন্ধে কয়েক গাছি চুড়ি পরিহিতা। রমণীর পায়ে অনেকগুলি চিকন মলও দেখা যায়। এই দেবীর বেশ ভূষণে অধিক আকর্ষণীয় দিকটি এই যে, তার দুই কাঁধ ও কোমরের দুই পার্শ্বে আড়া-আড়িভাবে একটি সরু ফিতার বন্ধনী, তার ঠিক কেন্দ্রে একটি অলঙ্কার সংযুক্ত। যা স্তন-যুগলের মধ্যস্হলে ফুল আকৃতি লকেটের মত অবস্হিত। তার পায়ে মণিবন্ধের গোড়ায় পুরু মল এবং হাতের বাহুতে অঙ্গদ লক্ষ্য করা যায়।[২] মৌর্য যুগের খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকে বিহারের দিদারগঞ্জে প্রাপ্ত যক্ষী মূর্তিটি পালিশকৃত এবং দৈহিক গঠনে কোমলতা, সজীবতা বর্তমান।

পাটনার নিকটবর্তী দিদারগঞ্জে প্রাপ্ত পালিশকৃত একটি রমণী মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। এটি ভারতের পূর্বাঞ্চলের রমণীর পরিধেয়ের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর নিম্নবসনের রীতি তৎকালীন উত্তর পূর্ব ভারত বর্ষের অন্যান্য রমণীর পোষাকের সাথে তুলনীয় নয়। রমণীর কোমরে জড়ানো চাদর, যার শেষ প্রান্ত পায়ের মাঝখানে সামনের দিকে নীচ পর্যন্ত ঝুলে আছে। কাপড়ের সামনের ভাঁজ একটি অতিরিক্ত অংশ হলেও মনোরমভাবে বিন্যস্ত। এতে পাঁচটি

---

১ Charles Fabri, D.I.S, pl. 5.

২ A.L. Basham, W.T.W.I. pl. XXV.

কটিবন্ধ দুটি কীলকের দ্বারা ভাঁজের দুই পার্শ্বে বিস্তৃত, বক্ষ অনাবৃত। তবে একগুচ্ছ লম্বা হার বুকের নীচ পর্যন্ত ঝুলন্ত। ডান হাতে চিকন চুড়ি ও বালা। সম্ভবতঃ এই রমণী কপালের উপর অলঙ্কার পরিহিতা (চিত্র নং- ৬৭খ)[১]। এছাড়া এই অঞ্চলের রমণীরা কাছাবিহীন রীতিতে শাড়ী পরেছে, যা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত ঝুলন্ত হত। এ সময়ের রমণীরা দেহে উর্ধাংশে ওড়না ব্যবহার করেছে। যা অত্যন্ত মার্জিত বৈশিষ্ট পূর্ণ মনে হয়।[২]

অতএব মৌর্য এবং শুঙ্গ শিল্পকলার পরিবর্তনমূলক অধ্যায়ে রমণীর অঙ্গের নিম্নাংশের বসন হিসেবে আমরা দুই প্রকার পরিধেয়ের নমুনা পেয়ে থাকি। যথা (১) ঘাঘরা এবং (২) শাড়ী। পোড়ামাটির ফলক চিত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে অনুমান করা যায় যুবতীরা সাধারণতঃ ঘাঘরা এবং বিবাহিতা রমণীরা লম্বা কাপড় বা শাড়ী পরিধান করত। শরীরের উপরের অংশ কখনো অনাবৃত রাখা হলেও বক্ষবন্ধনী ও ওড়না পরিধানের রীতি ছিল। বহিঃর্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যের সম্প্রসারণের কারণে ঘাঘরা পরাকে বিদেশী প্রভাব বলে মনে করা হয়। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় এর ব্যবহার থেকে এ পোষাককে ভারতের গতানুগতিক রীতি বা ভারতেই এর উৎপত্তি বলা যায়। মৌর্য আমলের সমকালীন পোড়ামাটি ফলকে রমণীর নিম্নবসন ঘাঘরার সাথে তাতে বোনানো পাড় এর তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষতঃ নর্তকীর ঘাঘরায় এ পাড়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। ঘাঘরার সাথে পাড়ের সংযোগ অত্যন্ত সুন্দর।[৩]

এছাড়া মৃৎফলকের প্রাপ্ত তথ্য থেকে রমণীদের মজবুত, পুরু মধুচক্র ডিজাইনের সুনিপুণ ধাঁচে কটিবন্ধ দ্বারা সংযুক্ত সূক্ষ্ম পশমী বস্ত্রের নিম্নবসনে পাখা সদৃশ ভাঁজ এবং পাতলা কাপড় পরিধানের রীতির কথা জানা যায়। দোপাট্টা জাতীয় উপরের বস্ত্র কাঁধের

---

১ S.K. Saraswati, <u>A.S.I.S.</u> pl. IX, 47.

২ A.S. Altekar, <u>P.W.H.C.</u> pl. IV,B.

৩ S.Sahay, <u>op.cit.</u>, pp 35-37

উপর দিয়ে উপরের অংশ আবৃত করার রীতিও জানা যায়। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় রমণীর নিম্ন বসন ঘাঘরা, শাড়ী এবং উপরের বসন উত্তরীয় বা দোপাট্টার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, এটাই প্রতীয়মান হয়। মূলতঃ শাড়ী ছিল সবচেয়ে ব্যাপক প্রচলিত পরিধেয় এবং ধনী ও দরিদ্র সকলেই শাড়ী পরিধান করত। মৃৎফলক ও প্রস্তর ভাস্কর্যে উন্নত মানের সূক্ষ্ম শাড়ী দৃশ্যমান হয়। এছাড়া আরেকটি বৈশিষ্ট হল, নিম্নবসন সবসময় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা না হয়ে কখনো মাটি ঘেষে বা মাটি স্পর্শ করত। সম্ভবতঃ রাজকীয় রমণীদের নিকট এমন পোষাক জনপ্রিয় ছিল। কানিংহামের মতে ভারহুতের যক্ষী রমণী এবং 'চুলকোকা' দেবীর উপর অংশ অনাবৃত ছিল। কিন্তু তা নয় তাদের উপর অংশ অনাবৃত ছিলনা। রমণী মূর্তি-গুলিতে হালকা মসলিন কাপড়ের ভাঁজ ডান স্তনের উপর দিয়ে লক্ষ্য করা যায়। কানিংহাম আরও বলেন, তাদের নিম্নবসন অতি সূক্ষ্ম ও হালকা ছিল, যা ভাস্কর্যগুলি দেখলে বাস্তবিক মনে হয়। কিন্তু ভাঁজবিহীন এই কাপড় সম্পূর্ণরূপে বক্ষস্তন এবং নাভিকে আবৃত করলেও কাপড়ের সূক্ষ্মতার জন্য রমণীদের উর্ধাঙ্গ অনাবৃত মনে হয়। এই মসৃণ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, একজোড়া পোষাক একটি আংটির মধ্যে দিয়ে ঢুকানো যেত।[১]

কুষাণ আমলের শিল্পকলা গান্ধার এবং মথুরা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর প্রভাব উত্তর পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। বঙ্গ এবং বিহারের বিভিন্ন প্রাচীন এলাকায় প্রচুর মৃৎফলক ও প্রস্তর ভাস্কর্য আবিস্কৃত হয়েছে যেগুলির গঠন বৈশিষ্ট এবং পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির দৃষ্টিকোন এবং রীতি, গান্ধার ও মথুরার অনুরূপ। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে এ অঞ্চলের রমণীরা শাড়ী পরিধান করেছে যার প্রশস্ত ভাঁজ সামনের দিকে ঝুলে থাকে এবং উপর অংশ এ বসনের কিছু অংশ দিয়ে ঢেকেছে। এর থেকে বলা যায় সে সময়ে নিম্নবসন এত দীর্ঘ ছিল যে তা মাথা হতে পুরো দেহ অতিক্রম করে পায়ের পাতা পর্যন্ত আবৃত করত। এ রীতির পোষাক গান্ধার এবং মথুরা ভাস্কর্যে দেখা যায়। কোমরের সাথে সংযুক্ত থাকত কোমরবন্ধ দ্বারা (চিত্র নং-৬৯ক)। কিন্তু অপর গান্ধার ভাস্কর্যে নিম্নবসন বা শাড়ী পরার ভিন্ন ধাঁচ দেখা

---

১ S. Sahay, <u>op.cit.</u>, pp. 39-40.

যায়। এই ভাস্কর্যে রমণী কোমরকে চতুর্দিক দিয়ে আবৃত করে পেছন দিকে সেলাই বা সংযুক্ত করা শাল বা চাদর পরিহিতা এবং অবশিষ্টাংশ বাম কাঁধের উপর দিয়ে ছড়িয়ে রাখা (চিত্র নং-৬৯খ)। রমণীর মস্তক মনে হয় কাপড় দিয়ে ঢাকা, তার বক্ষদেশের একপ্রান্ত অনাবৃত। কখনো রমণীরা শাল বা চাদরটি কোমরের সংগে সংযুক্ত করেছে। পায়ের গোঁড়ালীর সামান্য উপর পর্যন্ত ন্যাস্ত কুঁচিসহ শাড়ী, দুই কাঁধে ঝুলন্ত ওড়না এবং পূর্ণ হাতা উর্ধবসন পরিহিতা একজন রমণীকে দেখা যায় (চিত্র নং-৬৯গ)। সে তার শিরে একটি চূড়াখোঁপা বেঁধেছে মনে হয়। অপর রমণী একটি শাড়ী পরিহিতা। শাড়ীটি তার বক্ষস্তনের উপর দিয়ে কাঁধে তোলা হলেও ডান স্তনটি অনাবৃত (চিত্র নং-৬৯ঘ)। অত্যন্ত ঢিলা রীতিতে রমণী শাড়ীটি পরেছে। শাড়ীর কিছু অংশ দেহের নিম্নভাগে জড়ানো, অন্য অংশটি বুকের উপর দিয়ে উঠে বাম বাহু জড়িয়ে পেছনে পতিত। যা অত্যন্ত মনোরম ও সুন্দর মনে হয়।[১] মাথায় হেলমেট ও পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত ঝোলান শাড়ী পরিহিতা এক রমণীকে দেখা যায় (চিত্র নং-৭০ক)। তার শাড়ী পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত দীর্ঘ কিন্তু উপরের অর্ধে কুঁচিযুক্তভাবে ঝোলান একটি পোষাক যা রমণীর বক্ষদেশ আবৃত হয়ে দুই কাঁধের উপর তোলা এবং পিন দ্বারা আটকানো মনে হয়। বক্ষের ঠিক নিচে একটি বন্ধনী দ্বারা উর্ধবসনটিকে আঁটসাঁট রাখা হয়েছে। গান্ধার রমণীর এই বসন বেশ সমৃদ্ধশালী সংস্কৃতির পরিচয় দেয়।[২] খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের পোষাকের মধ্যে মথুরা অঞ্চলের রমণীদের দেখা গেছে পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত লম্বা এবং বিস্তৃত শাড়ী পরতে, যা কোমরের সঙ্গে কটিবন্ধনী দ্বারা শেষাংশ নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হত (চিত্র নং- ৭০খ)। কোন কোন রমণীর শাড়ী কোমরে বেঁধে রাখা হত (চিত্র নং- ৭০গ)। উভয় পার্শ্বে ফাঁস দিয়ে শাড়ীর বাকি অংশ ঝুলিয়ে রাখা হত। অপর রমণীকে দেখা যায় শাড়ী পরিহিতা, যার একদিক কোমরকে জড়িয়ে অন্য অংশ বাম স্তনকে আবৃত করে বাম কাঁধের উপর দিয়ে পেছনের দিকে রাখা

---

১ Motichandra, op.cit., pp. 37-39.

২ Ibid., p. 40.

হয়েছে (চিত্র নং– ৭০ঘ)। মথুরা ভাস্কর্যে রমণীদের মস্তক কাপড় দিয়ে আবৃত করতে দেখা যায় না, তবে ভিন্ন রীতিতে তারা কেশবিন্যাস করেছে।[১] লক্ষণীয় বিষয় হলো এ অঞ্চলের রমণীদের কাঁচুলী বা বক্ষবন্ধনী ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তবে শাড়ী পরার রীতি উত্তর ভারতীয় ধর্মীয় চেতনার ইঙ্গিত বহন করে। পূর্ব ভারতীয় নারীদের বসন কুষাণ পরবর্তী সময়ে বিহারের পাটনায় প্রাপ্ত একটি রমণীকে শাড়ী পরিহিতা দেখা যায়, কিন্তু শাড়ী পরার ধাঁচ ভিন্ন ধরণের (চিত্র নং– ৭১গ)। রমণী তার পুরো দেহকে আবৃত করে শাড়ী পরিধান করেছে। তার উর্ধ, নিম্ন অঙ্গ এবং পুরো হাত আবৃত দেখা যায়। একটি কাপড় দিয়ে তার মস্তক আবৃত। এই কাপড়ের দুই প্রান্ত রমণীর ঘাড়ের উপর ন্যাস্ত।[২]

বিরাট রাজনৈতিক সাফল্য এবং শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষতার কারণে গুপ্ত যুগকে ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে। এ সময় সমাজ জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। জনসাধারণের মধ্যে সৌখিনতা বৃদ্ধি পায় এবং ভোগ-বিলাসিতার পাশাপাশি তাদের পোষাক পরিচ্ছদের ধাঁচ এবং নকশায় উন্নত রূপ লক্ষ্য করা যায়। বৈদেশিক পর্যটকদের বর্ণনায় গুপ্ত আমলের ভারতীয় রমণীদের বেশ ভূষণ সম্পর্কে হিউয়েনচোয়াঙ এর বর্ণনা থেকে কিছুটা স্পষ্ট হওয়া যায় যে রমণীরা তৎকালে সর্বদা সাদা কাপড়ের প্রতি বেশী আসক্ত ছিল। সে সময় রমণীরা বৃহৎ বহির্বাস পরিধান করত যা কাঁধ থেকে আলতোভাবে নীচের দিকে ঝুলে থাকত।[৩] রমণী নর্তকীরা তাদের শরীরকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে পোশাক পরিধান করত। অজন্তার গুহা চিত্রে এ সময়ের নর্তকীর সাক্ষ্য মেলে। নর্তকীরা পায়জামা পরত নিম্নাঙ্গে। তাদেরকে উপরের অংশে জামার মত বসন পরিহিতা দেখা যায়। উত্তরীয় উভয় কাঁধের উপর দিয়ে দুলিয়ে রাখা হত। একটি রঙিণ কোমর বন্ধনীও তারা পরত। তাদের

---

১ Motichandra, <u>op.cit.</u>, pl. 49,72,74,80, pp. 38-41.

২ S. Sahay, <u>I.C.C.O.</u>, pl. XV, 93.

৩ Watters, <u>op.cit.</u>, p. 148.

গলায় একসারি হার দেখা যায়।[১] অজন্তা চিত্রে রমণীদের শিরে মুকুট ও ললাটে টিকলী, কেশে নানা প্রকার অলঙ্কার পরতে ও পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করতে, খোঁপা বাঁধতে এবং উর্ধাঙ্গ নকশী ব্লাউজ দ্বারা আবৃত করতে দেখা যায় (চিত্র নং-৭২ক)। এছাড়া রমণীরা সেলাই করা ডোরাকাটা এবং ফুল আকৃতির নকশাপূর্ণ ও কারুকার্য করা পোষাক পরত। এ ধরণের পোষাক পরবর্তীতে ভারতীয় রমণীদের মাঝে স্থায়ীভাবে প্রচলিত হয়ে পড়ে।[২] গুপ্তযুগের কিছু মুদ্রায় এ যুগের রমণীদের চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে। পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত লম্বা শাড়ী পরিহিতা রমণীর বক্ষদেশের নিম্নে একটি বক্ষনী দ্বারা আবৃত দেখা যায় (চিত্র নং-৭১খ)। এই রমণীর কাঁধদ্বয় চাদর বা কাপড় দ্বারা ঢাকা। চাদরের একপ্রান্ত ডান হাতে পেঁচানো মনে হয়।[৩] এ যুগের সমুদ্র গুপ্তের একটি স্বর্ণ মুদ্রায় রমণীকে দেখা যায় পায়ের নিম্ন পর্যন্ত পোষাক পরিহিতা। সে একটি কাঁচুলী পরিধান করেছে যা পিঠে গিঁট। দ্বারা বাঁধা মনে হয়।[৪] এ সময়ে অজন্তার রমণীরা পরেছে প্রধানতঃ শাড়ী বা ঘাঘরা। অজন্তা গুহাচিত্রে রাজার সখী রমণীদের দেখা যায় গোঁড়ালী পর্যন্ত লম্বা, ডোরাকাটা নকশাযুক্ত পোষাক পরিহিতা (চিত্র নং- ৭২গ)। অনেক সময় অজন্তার চিত্রে রাজকুমারীরা সেলাই করা নিম্ন-বসন এবং সুক্ষ্ম ও স্বচ্ছ ব্লাউজ পরিধান করেছে (চিত্র নং- ৭২খ)। রমণীর বক্ষবন্ধনী পেছনে গিঁট। বাঁধা এবং মস্তক ওড়না দ্বারা আবৃত দেখা যায়। এছাড়া অজন্তার রমণীরা লম্বা হাতওয়ালা, নানা নকশা খচিত বস্ত্র পরিধান করেছে, যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখাত (চিত্র নং- ৭২ঘ)। মুলতঃ গুপ্তযুগে রমণীদের পরিধেয়ে লম্বা সালের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

---

১ Motichandra, C.T.C.C., p. 72.

২ Ibid., p. 76.

৩ Allan, Catalogue of the Gupta Coins of the Gupta Dynasty and Sasanka, King of Gauda, (London: 1974), pp. 1-9.

৪ A.S. Altekar, op.cit., pl. V,B.

যা শরীরের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত আবৃত থাকত— অনেকটা মুসলিম রমণীর বোরকার মত। এছাড়া বিশেষ ধরণের পোষাকের কথা জানা যায়। বিবাহ উৎসবে রমণীর পরিধেয়ে থাকত দুই খন্ড বস্ত্র যা সমস্ত দেহকে আবৃত করত এবং এ পোষাক তৈরী হত রেশমী সুতা দিয়ে।[১] নববধুর অঙ্গে লাল রংয়ের বক্ষ বন্ধনী পরিধানের কথা জানা যায়। এগুলি পোষাক কালিদাসের কালে প্রচলিত ছিল, যা সম্পূর্ণ রঙিন হত এবং নববধুরা পরিধান করত। গুপ্তযুগের রমণীর বেশ ও ভূষণের উপরোক্ত তথ্য আবার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্যে সমর্থন পাওয়া যায়। সমসাময়িক ভাস্কর্যের সাক্ষ্যে জানা যায় রমণীরা পোষাক ও অলঙ্কার বিষয়ে অধিক আগ্রহী ও যত্নশীল ছিল। সম্ভবতঃ তাদের নিকট মসৃণ, কোমল, রঙিণ ও বিচিত্র পোষাকের চাহিদা ছিল। এ সময়ের রমণীদের নিম্নবসন ছিল শাড়ী। আর উপরের অংশে বডিস বা জামা জাতীয় বস্ত্র পরিধান করা হত।[২] উল্লেখিত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে জানা যায় ভারতীয় রমণীদের শাড়ীর পাশাপাশি ঘাঘরা সদৃশ পোষাকের প্রচলন থাকলেও শাড়ীই ছিল রমণীদের জনপ্রিয় পরিধেয়। গুপ্তযুগ থেকে বিভিন্ন ধরণের পরিধেয় যেমন, কাঁচুলী, ওড়না বা ঘোমটা, চাদর প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত পরবর্তী যুগে রমণীদের পোষাক আরও উন্নত রূপ লাভ করে। পাল আমলে এ পোষাকের প্রভূত সমৃদ্ধি ঘটে। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে পূর্ব ভারতের পাটনায় প্রাপ্ত রমণীকে দেখা যাচ্ছে নৃত্যরতা অবস্থায়। বৃহৎ চাদর বা ওড়না রমণীর দুই কাঁধ আচ্ছাদিত হয়ে একপ্রান্ত ঝুলানো রয়েছে যা দোদুল্যমান মনে হয় (চিত্র নং– ৭১ঘ)। রমণীর নিম্নবসনের কিছু অংশ কুঁচি আকারে সম্মুখে নিম্নদেশ পর্যন্ত ঝুলন্ত। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকে কর্ণাটকে প্রাপ্ত গৌরীর পরিধেয়ে স্বচ্ছ ঢেউ খেলানো পোষাক লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং– ৭৫খ)। দেবী মস্তকে একটি অলঙ্কৃত মুকুট, কর্ণে কুন্ডল, গলায় ছোট এবং বড় হার পরিহিতা আছেন। পাল ও সেন আমলের শেষের দিকের এই ভাস্কর্য মূর্তিটি সুবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

১ S. Sahay. op.cit., p. 41.

২ Ibid., p. 42.

খ্রীঃপূঃ প্রথম দ্বিতীয় শতকের পূর্ব ভারতীয় রমণীদের কেশ বিন্যাসে দেখা যায় বিভিন্ন ধাঁচ। ভারহূত ও সাঁচীতে প্রাপ্ত রমণীদের দেখা যায়, মাথায় পাগড়ী বেঁধে কেশবিন্যাস করতে। মস্তকের কিছু অংশ কাপড় ব্যবহার করে, পেছনে চুল উন্মুক্ত রেখে তারা কেশ পরিপাটি করেছে। এছাড়া পুরো মস্তকটি অলঙ্কৃত টুপি জাতীয় পোষাকে আবৃত রেখে পেছনে দুটি বেনুনী দুলিয়ে কেশ বিন্যাসের রীতি লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং-৭৩ ক, খ, গ)। গুপ্তপূর্ব যুগে গান্ধার রমণীরা তাদের কেশ সর্পিল বা পেঁচানো আকৃতির বড় খোঁপা মস্তকের উপরে বেঁধে রাখত। কখনো চূড়াখোঁপা তারা বেঁধেছে অথবা জালিকা দিয়ে বা মুক্তা বা গোলাপ ফুল দ্বারা খোঁপা বেঁধেছে রমণীরা। মস্তকের উর্ধে মধ্যস্থলে খোঁপা বেঁধে মস্তককে কৌণিক রূপে বিন্যাসিত করেছে তারা। মস্তকের পশ্চাতে কেশগুচ্ছকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ক্রমান্বয়ে বড় থেকে ছোট করে বৃহৎ এলো খোঁপা বেঁধেছে রমণীরা (চিত্র নং- ৭৮ ছ, জ)। আবার দেখা যায় অজন্তার রমণীদের ঢিলা খোঁপার সাথে কেশের কয়েকটি কুন্তলী পাকিয়ে পিঠে ফেলে কেশবিন্যাস করতে। কখনো গোলাকার পাউরুটির মত খোঁপা বেঁধে খোঁপায় ফুল দ্বারা অলঙ্কৃত করেছে তারা (চিত্র নং-৭৩ চ, ছ)। গুপ্ত পরবর্তী যুগে রমণীদের খোঁপা বেঁধে কেশবিন্যাস করতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৭৩ ঘ, ঙ)। উড়িষ্যার এই দুই রমণীর খোঁপা আকর্ষণীয় দেখা যায় (চিত্র নং- ৭৩ ঘ ও ঙ)।[১] একজন রমণী পশ্চাতে অপর জন মস্তকের উপরিভাগে ললাটের দিকে বৃহৎ খোঁপা বেঁধেছে। পশ্চাতে বাঁধা খোঁপাটির গোড়ায় বাঁধন লক্ষ্য করা যায়। গুপ্ত যুগের অজন্তা গুহাচিত্রে রমণীর কেশবিন্যাস অত্যন্ত মনোরম (চিত্র নং- ৭৭খ)। নানা প্রকার অলঙ্কার এবং পুষ্প দিয়ে সজ্জিত রমণীর খোঁপাটি। গুপ্ত ধ্রুপদী যুগের পার্বতীর মস্তকের ভাস্কর্যটি উত্তর ভারতের রমণীদের কেশবিন্যাসের একটি বিশেষ নিদর্শন যা সুকুমার সৌন্দর্যে ভরপুর। সমস্ত চুলকে কুন্তলী আকারে বিন্যস্ত করে পশ্চাতে বিরাটাকারে এলো খোঁপায় ভূষিত এই রমণী (চিত্র নং- ৭৬ক)। নানান নকশায় এবং শেষে পুষ্পের নকশায় অলঙ্কৃত রমণীর খোঁপা। অপর রমণীর মস্তকের পশ্চাতে বৃহৎ গোলাকার থালার মত খোঁপা এবং সম্মুখে ললাট পর্যন্ত মণিমুক্তা ও গুটিকা দ্বারা অলঙ্কৃত (চিত্র নং- ৭৬খ)। তার গলায় নকশা খচিত মোটা হার এবং কর্ণে লম্বা ও ভারী ওজনের কানদুল লক্ষ্যণীয়। পাল আমলের শেষের দিকে খ্রীষ্টীয় দশম, একাদশ শতকে মধ্য ভারতের খাজুরাহোতে প্রাপ্ত রমণীকে লেখণীরতা অবস্থায় দেখা যায় (চিত্র নং- ৭৫ক)। সে একটি গিঁটা খোঁপা বেঁধেছে যা ঘাড় সংলগ্ন আছে। চুলের কিছু অংশ খোঁপার

---

১ Motichandra, <u>op.cit.</u>, p. 227.

নিচে পিঠের উপর ঝোলান এই রীতি বিশেষ বৈশিষ্টসূচক মনে করা হয়। পরবর্তী পাল সেন যুগের শেষের দিকে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের রাজগড়ে প্রাপ্ত অপর রমণীটির মস্তক বৃহৎ মস্তকাবরণ দ্বারা আবৃত (চিত্র নং- ৭৭ক)। মস্তকাবরণটিকে মণিমুক্তা খচিত টুপির মত মনে হয় এবং মস্তকের পশ্চাতে পাখা সদৃশ পুষ্পখচিত মস্তকাবরণটি আকর্ষণীয়।

মৌর্য আমলের ভাস্কর্য সমূহে রমণীর কেশবিন্যাস পাখা সদৃশ মুক্তার বা গুটিকার দড়ি বা মালা সংযুক্ত করে বৃহৎ থালাকৃতি বস্তুর মত কপালের উপরে একপাশে মাথার কেশকে উন্মুক্ত রেখে পতিত শেষাংশে ফাঁসের মত দুটি গোলাকার বৃত্তাকারে গীট দেয়া হত। শুঙ্গ আমলে মৃৎফলকে উত্তর পূর্ব ভারতের একাধিক কেশবিন্যাসের রীতি রমণীদের মধ্যে দেখা যায়। একই সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তারা চুল বাঁধত। অধিকাংশ রমণীরাই ছোট চুলের খোঁপা বাঁধত মাথার ডান অথবা বাম দিকে। এ ধরণের কেশবিন্যাসে প্রথমে চুলগুলিকে এক জায়গায় জমা করে পরস্পরতঃ কুন্ডলী পাকিয়ে উঁচুতে গিঁটা দেয়া হত। কখনও তারা চুল আঁচড়িয়ে কপালের উপর থালাকৃতি অথবা মোচাকৃতি করে ফুলের সদৃশ্য নকশা করত। মোটকথা চুলকে মাঝখান দিয়ে বিভক্ত করে পরিপাটি করে আঁচড়ান এবং কপালের যে কোন পার্শ্বে ফেলে রাখাও তাদের একটি কেশ বিন্যাস রীতি দেখা যায়।[১]

শুঙ্গ আমলের প্রস্তর ভাস্কর্যে ভিন্ন পদ্ধতিতে চুল বিন্যস্ত দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারহুতে প্রাপ্ত রমণীরা তাঁদের চুলকে চূড়া খোঁপা করে বিন্যস্ত করেছে, এর থেকে তারা যে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে শিরোভূষণের প্রতি এ কথাই প্রতীয়মান হয়। ভারহুতের অতি সাধারণ কেশ বিন্যাসের ধরণ মাথায় খোঁপা বাঁধা হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে চুলকে পেছনের দিকে বিন্যস্ত করে তাকে প্রথমে সমান দুভাগে বিভক্ত করে তারপর আবার দুভাগে ভাঁজ দেয়া, যা আধুনিক রমণীদের মধ্যে দেখা যায়। সাঁচীর উৎকীর্ণ রমণীর চুলকে পেছনে ফেলে সুতা দিয়ে পাকিয়ে গিঁটা বাঁধতে দেখা যায়, কিন্তু ভারহুতে তারা চুলকে ভাঁজ দিয়ে

---

১ S. Sahay. op.cit., p. 102.

অথবা গোলাকারভাবে মাথায় কুন্ডলী তৈরী করে। কোন সময় ভারহুতের রমণীরা চুলকে কুন্ডলী পাকিয়ে মাথার উপরে গিঁটা বাঁধে অথবা মাথার পেছনে চুলের গিঁটা বেঁধে সুতা দিয়ে পাকিয়ে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ঢিলা চুলে কিছু গহনা দিয়ে আঁটকিয়ে রাখে।

কুষাণ আমলে আমরা ভিন্ন ধাঁচে কেশবিন্যাসের নমুনা পাই, কারণ এ সময় ভারতীয় শিল্পের একটি নতুন ধারা প্রভাব বিস্তার করে। সে সময় ভারত বিদেশী শাসনাধীনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে পূর্ব ভারতে লোকায়ত, হেলেনস্টিক, শক ও ভারতীয় রীতি সমূহের সংমিশ্রিত ধারা গড়ে উঠে। এ সমস্ত বৈদেশিক রীতিনীতি ভাবধারা চুলবাঁধা কৌশলে কিছু প্রভাব ফেলে। খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতকের কুষাণ ও গুপ্তযুগে মথুরায় প্রাপ্ত রমণীদের অঙ্গে সুন্দর অলঙ্কার, কটিবন্ধ, মনোরম প্রসাধনী, চন্দন এবং অগরুর আঠা, সুগন্ধি, পাউডার আর পরিধেয়ে মসলিন, সিল্ক বসন পরিহিতা দেখা যায়।[১] এ সময় অমরাবতীর রমণীরা ফুল দ্বারা তাদের খোঁপা সজ্জিত করেছে। পত্র পুষ্পের মালা দিয়ে অঙ্গ শোভিত করা এখানকার রমণীদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গুপ্তযুগে তদ্রুপ রমণীরা সাজসজ্জায় এবং প্রসাধনীতে বেশী উৎসাহিত ছিল। ফুলের কটিবন্ধ, পায়ে লাক্ষার রস, রমণীরা ব্যবহার করত।[২] কেশের উপর টায়রার ব্যবহার এ সময় দেখা যায়। কেশবিন্যাসে মুক্তার গাঁথা মালা সংযুক্ত করত তারা। দক্ষিণ ভারতের অজন্তা এবং বাগ গুহাচিত্রাবলীতে এ ধরণের কেশবিন্যাসে সমৃদ্ধ রমণীদের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[৩] গুপ্তযুগে পোষাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি কেশচর্চা ও অলঙ্কারের ব্যবহার রমণীদের মধ্যে বেশী প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। এ আমলে রমণীরা কেশকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করে

---

১ Motichandra, op.cit., pp. 199-203.

২ Ibid., p. 219.

৩ Ibid., pp. 226-227.

করত না বরং চুলে ফুল, গহনা প্রভৃতি পরিধান করে নিজেকে সুন্দর মনোরম ও আকর্ষণীয় করে সাজাতে ভালবাসতো। এ সময়ের সাহিত্যিক উৎস, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বিদেশীদের বর্ণনা তাদের চুলের বিন্যাস সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে সহায়ক হয়। কবি কালিদাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় রমণীরা লম্বা চুল মাথায় রাখত। কেশকে পরিপাটি করে আঁচড়িয়ে দুইভাগ করত, তৎপর লম্বা বস্ত্র দিয়ে তাকে বাঁধতো। তারা কেশকে ফুল দ্বারা শোভিত করত। অনেক সময় মণি, মুক্তা রমণীদের মাঝখানের সিঁথিতে শোভা পেত। অনেক সময় মুক্তার জাল দ্বারা কেশগুচ্ছকে আবৃত করত।[১] কেশবিন্যাসের রীতি সম্পর্কে আমরা আরো জানতে পারি কালিদাসের রঘুবংশে। এই কাব্যে কেশবিন্যাসের বিভিন্ন ধাঁচের বিভিন্ন নাম উল্লেখিত হয়েছে, যেমন কুম্বা, স্তুকা, অপসা, কর্পদ। রমণীরা চুলে চারটি বিনুনী গেঁথে পেছনে ফেলে কর্পদ ধাঁচে বেঁধেছে, মাথার উপর চূড়ায় গিঁট বেঁধে খোঁপার নাম অপসা, কুম্বা হচ্ছে শিং-এর মত খোঁপা এবং গোলার্ধকারভাবে খোঁপা রচনা করার নাম স্তুকা বলে জানা যায়।[২] গুপ্ত আমলের মুদ্রায় রমণী মূর্তিতে সাধারণতঃ লম্বা কেশকে খোঁপা করে পেছনে অথবা উপরে বাঁধা দেখা যায়। মৃৎফলক ও প্রস্তর ভাস্কর্যে রমণীদের গোলাকার কুন্ডলীকৃতভাবে চুল মস্তকের পেছনে অথবা উপরে বাঁধার অথবা পেছনের দিকে ব্রাশ করে গুটিয়ে রাখার রীতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মাঝখান দিয়ে ভাগ করে অলঙ্কার পরিধানের এবং অন্য একটি ধাঁচে আঁচড়িয়ে চুল দুভাগ করে মাথার দুপার্শ্বে পতিত করার তথ্যও পাওয়া যায়। গুপ্ত পরবর্তী যুগে রমণীদের কেশবিন্যাস গুপ্ত আমলের মত একই রকম। সাহিত্যকর্ম থেকে এ সময়ের কেশ চর্চার তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।[৩]

---

১ S.Sahay, <u>op.cit.</u>, p. 105 (Ori:RV.IV,15;XIVc12),VI,23.

২ <u>Ibid.</u>, p. 104.

৩ <u>Ibid.</u>, p. 106.

খ) প্রাচীন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রমণীদের বেশ ভুষার সাথে বাংলার রমণীদের বেশ ভুষণের তুলনামুলক আলোচনা ঃ

বাঙ্গাঁলী রমণীর বেশ ভুষণের সাথে ভারতীয় রমণীদের বেশ ভুষণের তুলনা করার প্রারম্ভে এ কথা আমাদের সর্বদাই মনে রাখতে হয় যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোন থেকে এবং বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন বাংলা তৎকালে ভারত উপমহাদেশের অর্ন্তুভুক্ত একটি দেশ ছিল। দেশ বিভক্তির পর যদিও বাংলাকে পৃথকভাবে দেখা হয়, কিন্তু অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়কালে বাংলা নামক ভু-খন্ডের কোনরুপ বিভক্তিকরণ ছিল না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১৯৪৭ সনের বিভাগপুর্ব বাংলা নামক প্রদেশের রাষ্ট্রীয়, ভৌগোলিক পরিমন্ডলের সীমারেখা ধরে প্রাচীন বাংলাকে নির্দিষ্ট ভুখন্ডে ফেলে, সেই ভুখন্ডের অধিবাসীদের মধ্যে নারীর বেশ ভুষণ এর সাথে ভারতীয় নারীর বসন-ভুষণের তুলনা করা যেতে পারে। অতএব বাঙ্গাঁলী রমণীর বেশ ভুষণ এবং ভারতীয় রমণীর বেশভুষণ-এর মুলগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা সাপেক্ষে এ দুই দেশের পোষাক পরিধেয়ে কি সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ছিল তা তুলে ধরা যায়।

সাহিত্য গ্রন্থ এবং প্রত্নবস্তুর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, প্রাচীন বাঙ্গাঁলী রমণীরা শাড়ী পরত কিন্তু শাড়ীর সাহায্যেই সাধারণতঃ উত্তরবাস রচনা করে দেহ আবৃত করত না। প্রত্ন-তাত্ত্বিক সাক্ষ্যে অনুমিত হয় নারীরা কখনো কখনো দেহের উত্তরাংশ অনাবৃত রাখত। তারা বডিস বা কুচবন্ধনী জাতীয় এক প্রকার পোষাক উর্ধাঙ্গে ব্যবহার করত। তাদের ব্লাউজ পরতেও দেখা যায়। রমণীরা মাঝে মাঝে উত্তরীয় বা ওড়না ব্যবহার করত। স্কার্ট বা ঘাঘরার পরিধেয় বাঙ্গাঁলী রমণীদের মাঝে দেখা যায়। এ ধরণের পোষাক ধনী ও উচ্চবিত্ত পরিবারের বিলাসী রমণীরাই ব্যবহার করেছে মনে হয়। নর্তকীরা পায়ের কন্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ আঁটসাঁট পায়জামা পরত এবং কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখত দীর্ঘ ওড়না। চিত্রিত পান্ডুলিপি ও মুর্তির সাক্ষ্যে অনুমিত হয় রমণীদের শাড়ী কোন কোন সময় বিভিন্ন প্রকারের নকশা দ্বারা খচিত হত। বাঙ্গাঁলী রমণীর পোষাক পরিচ্ছদের জন্য সাধারণত সুক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, রেশম বস্ত্র ও রত্ন দ্যুতি খচিত অংশুক বস্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন ছিল, যা সাহিত্য ও লিপিমালায় উল্লেখিত হয়েছে। নারীরা তাদের সুদীর্ঘ চুল কখনো এলায়িত খোঁপা আবার কখনো মাথার

উপর ফিতে দিয়ে বড় খোঁপা বেঁধে রাখত। তারা খোঁপা ফুল, নানা প্রকার অলঙ্কার ও গুটিকা দ্বারা সজ্জিত করত। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে বাঙালী রমণীদের কুন্ডল, হার, অঙ্গদ, কেয়ুর, বলয়, মণিমেখলা, রসনা প্রভৃতির ব্যবহারের কথা জানা যায়। প্রত্নসাক্ষ্যে মূর্তিগুলিকে এ ধরণের নানাবিধ গহনায় অলঙ্কৃত দেখা যায়। চিত্রিত পান্ডুলিপিতে দেবদেবীর দেহে মণিমাণিক্য মূল্যবান পাথর খচিত অলঙ্কার এবং রঙিণ নকশাযুক্ত কাপড় পরিহিত দেখা যায়। সে সময় স্বর্ণের অলঙ্কার রাজন্যবর্গ ও ধনী অভিজাত পরিবারের নারীরাই শুধু পরতেন। সাধারণ রমণীরা পুষ্প পাতার গহনা ও শঙ্খের বলয় পরিধান করত।

অপরপক্ষে রামায়ণ বর্ণনা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় রমণীদের উর্দ্ধ বসন উত্তরীয় এবং নিম্নবসনকে অধোবাস বলা হয়ে থাকে। উপরের বসনটি উর্দ্ধাঙ্গ আবৃত করত আর নিম্নবসনটি চাদরের মত গোলাকারভাবে বেষ্টন দিয়ে পরিধান করা হত। কটিবন্ধ দ্বারা তা কোমরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকত।[১] মোহেনজোদড়োতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। সেখানকার সুতোর কাপড়ের আবিস্কার থেকে প্রায় পাঁচ হাজার খ্রীঃপূর্বাব্দের ভারতবাসীদের তুলো উৎপাদনের তথ্য লাভ করা যায়। এখানে প্রাপ্ত কিছু মূর্তিকে জানু হতে কোমর পর্যন্ত লম্বা ঘাঘরা সদৃশ পোশাক পরিধান করতে এবং কটিবন্ধ দ্বারা তা সংযুক্ত রাখতে দেখা যায়। সিন্ধু সভ্যতায় শিরোভূষণের রেওয়াজ জনপ্রিয় ছিল। হরপ্পা ও মোহেনজোদড়োর নারীমূর্তিগুলি পাখা ও শঙ্খাকৃতি শিরোভূষণ ব্যবহার করেছে। গোলাকার টুপি জাতীয় শিরোভূষণও এখানকার কিছু কিছু মূর্তিতে পরিদৃষ্ট হয়। বৈদিক যুগের রমণীরাও সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেছে। তাদের তাঁতে বোনা কাপড়ে সূচীকর্মের নকশা মুদ্রিত থাকত। এ সময় রমণীরা শাড়ীই পরত বলে জানা যায়।[২]

---

১ S. Sahay. op.cit., p. 32 (Ori: Ramayana, 5.15.2.).

২ Ibid., pp. 3-4.

পরবর্তী মৌর্য, শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের ভারতীয় রমণীদের বেশ ভূষণ সম্পর্কে জানা যায় যে এই সময়কালে রমণীরা শাড়ী কোমরবন্ধনী দ্বারা মনোরমভাবে পরিধান করত। গান্ধার ভাস্কর্যে সকল রমণীকেই শাড়ী পরিহিতা দেখা যায় যা পায়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত ঝুলে থাকত। বিস্তৃত কটিবন্ধ কোমরের সাথে যুক্ত করত এবং ধনুকাকৃতির বাঁধন দিয়ে গাঁটটি একপার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখত (চিত্র নং- ৬৯ ক,খ,গ)। এ অঞ্চলের অধিকাংশ রমণীদের শরীরের উপরের অংশ শাড়ী দিয়ে সম্পূর্ণ আবৃত থাকত না। তারা একটি ওড়না ব্যবহার করত। কখনো ওড়না দ্বারা মস্তক আবৃত করত (চিত্র নং- ৬৯খ)। পরবর্তী সাতবাহন যুগে রমণীরা দুই প্রকার নিম্নবসন পরিধান করেছে। সেলাইযুক্ত লুঙ্গির মত পোষাকের সাথে একটি কাপড় কোমরে পেঁচিয়ে কিছু অংশ তারা সামনে ঝুলিয়ে রাখত। এ সময়ের রমণীরাও তাদের মস্তক সাধারণতঃ সুন্দরভাবে ওড়না দ্বারা আবৃত করত। ওড়নার প্রান্তদ্বয় পেছনের দিকে ঝুলতে দেখা যায়। এধরনের ওড়নার মস্তকাবরণে পাখার মত নকশা ও কখনো পাগড়ীর মত বন্ধনী লক্ষ করা গেছে। অনেক সময় রমণীরা টুপি এবং মুকুটও পরিধান করত।[১] প্রাচীন ভারতীয় রমণীরা মস্তকাবরণ অথবা পাগড়ী পরে এর উপর মাথা আচ্ছাদিত করত, একটি ওড়না অথবা একখন্ড কাপড় দিয়ে। এ রীতিতে তারা ফ্যাশন রক্ষা করত বলে মনে হয়। মধ্য ভারতীয় অঞ্চল ভারহুত এবং সাঁচীর ভাস্কর্যে রমণী এরূপ ওড়না পরিহিত আছে।(চিত্র নং- ৭৩ ক,খ,গ)। কুষাণ যুগে ভারতীয় রমণীরা পরিধান করেছে শাড়ী। কখনো তারা উর্ধাঙ্গে একটি বড় চাদর ব্যবহার করেছে। এ সময়কালের রমণীরাও মস্তকাবরণ রচনা করেছে এক টুকরো কাপড় দিয়ে। পরবর্তী গুপ্তযুগে রমণীর পোষাক দুখন্ড কাপড়েই সীমিত থেকেছে। তাদের উপরের পরিধেয়টি শাল জাতীয় কাপড়। বিপুল সংখ্যক গুপ্ত মুদ্রায় রমণীদের বড় শাল জাতীয় উর্ধবসন ব্যবহার করতে দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের অজন্তা গুহাচিত্রে রমণীরা নাভির নিম্নে থেকে শাড়ী পরেছে, কিন্তু শাড়ীর অংশ বক্ষদেশ হয়ে কাঁধে তোলা হয়নি। দেশের উপরাংশে একটি পৃথক ব্লাউজ বা জামা ব্যবহার করেছে

---

১ Motichandra, <u>op.cit.</u>, pp. 19-25.

২ A.S. Altekar, <u>op.cit,</u>, p. 381.

তারা। অজন্তার রমণীদের অপূর্ব রীতিতে কেশবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। তারা কেশবিন্যাসে ফুল এবং অলঙ্কার ছাড়াও কাপড় ব্যবহার করত। পাল সেন যুগেও ভারতীয় রমণীরা শাড়ী পরেছে কাছা অথবা কাছাবিহীন ধাঁচে। পূর্ব ভারতের পাটনায় প্রাপ্ত তারা দেবীর পরণে নিম্নবসন শাড়ী (চিত্র নং- ৭৪ক)। দেবী উর্ধবসন হিসেবে ব্লাউজ পরিহিতা দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বাঙালী ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রমণীর বেশভূষণের তুলনা করলে প্রতীয়মান হয় এ সব অঞ্চলের রমণীদের বেশ ভূষণ প্রায়ই সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা অতি প্রাচীন যুগের মোহেনজোদড়ো সভ্যতার সংস্কৃতির সাথে বাংলার সংস্কৃতির সাদৃশ্য দেখতে পাই। সেখানকার প্রাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্যের রমণীদের পোষাক ঘাঘরা, শাল, কোমরের কয়েক-সারি কটিবন্ধ, কানের কুন্ডল, হাতের চিকন চুড়ির নমুনা প্রাচীন বাঙালী রমণীদের মাঝেই যেন খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন পাহাড়পুরের পোড়ামাটি ফলকে চিত্রিত রমণী ঘাঘরা ও নৃত্যরতা রমণী হাতে চিকন চুড়ি পরিহিতা (চিত্র নং- ৩৪ক,২৬)। অনুরূপ ঘাঘরা পরিহিতা রমণীর সাক্ষ্য চন্দ্রকেতুগড়ে, তামলুকেও লক্ষ্য করা গেছে (চিত্র নং- ৩ক,৪খ,৬১ক)। বাংলা ও ভারত রমণীরা একই রীতিতে শাড়ী পরেছে, যেমন গান্ধার, পাহাড়পুর, ময়নামতীর রমণীরা শাড়ী পরেছে কাছাবিহীন ঢংয়ে (চিত্র নং-৬৯ক,৩৩)। তদ্রুপ বাংলার বিভিন্ন প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত তারা, মনসাদেবী, যমুনা ও তার সংগী রমণী, রাধা, শিবের সংগী রমণী, উড়িষ্যায় প্রাপ্ত তারা দেবী, গান্ধার, মথুরা, পাটনা অঞ্চলের রমণীরা শাড়ী পরেছে একই রীতিতে (চিত্র নং- ২৩,২৪,২৮,৩০,৪২গ,৭০ঘ,৭১গ,৭৪ক)। শাড়ীর এক অংশ বক্ষদেশের উপর আড়াআড়িরূপে কাঁধে তুলে পেছনে ঝুলিয়ে দেয়ার রীতি তাদের মাঝে লক্ষ্য করা গেছে। এই রীতি আধুনিক বাঙালী রমণীদের মতই বলতে হয়।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মাথা ও হাতবিহীন রমণীর পোড়ামাটির ফলক চিত্রে ফুল,নকশা মুদ্রিত শাড়ী, রমণীর কোমরে কয়েক সারি ভিন্ন ভিন্ন গুটিকার কটিবন্ধ, গলায় ছোটবড় গুটিকার মালা দেখা যায় যা খ্রীঃপূঃ ২য় শতকের পাটনায় প্রাপ্ত মস্তক ও হাতবিহীন নারীর

ফুল নকশা খচিত শাড়ী ও অনুরূপ অলঙ্কারের সাক্ষ্য বহন করছে (চিত্র নং-৩১খ,৭৪গ)। এ থেকে পূর্ব ভারতীয় মৌর্য যুগীয় সংস্কৃতির প্রভাব বাংলার পাল আমলে পড়েছিল তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। একই শতকের বুদ্ধগয়ার রেলিং এর ভাস্কর্য মূর্তি লক্ষীদেবীর পরিহিত শাড়ী ও সুপ্রচুর গহনা বাংলার রাজশাহীতে প্রাপ্ত গঙ্গা দেবীর অঙ্গে শোভিত শাড়ী ও অলঙ্কারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই দুই দেবী গলায় একই প্রকার তিনটি করে হার এবং কোমরে ভারী ও কয়েক সারি কটিবন্ধনী দ্বারা শোভিতা। তাদের নিম্নবসন স্বচ্ছ এবং পরিপাটি করে পরিহিতা মনে হয় (চিত্র নং- ৬৩ক,৭৫ঘ)। লক্ষী দেবীর মস্তকের কুন্ডলী-কৃত চুলের ভাঁজ ময়নামতীতে প্রাপ্ত রমণীর (চিত্র নং-৪৯খ) কুন্ডলীকৃত কেশবিন্যাসের অনুরূপ। আরো লক্ষ্য করা যায় যে দিদারগঞ্জে প্রাপ্ত যক্ষী কাছাবিহীন রীতিতে শাড়ী পরিহিতা। খ্রীস্টীয় ৩য় শতকের এই রমণীর পরিধেয়ের সাথে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত যমুনা ও তার সংগী রমণীর কাছাবিহীন ধাঁচে শাড়ী পরার ভঙ্গিমা সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে এই রমণীদের বেশভূষণে কিছুটা বৈসাদৃশ্যও দেখা যায়। বৌদ্ধ যুগীয় এই যক্ষী রমণীর অঙ্গে বৃহৎ বৈজয়ন্তীকা হার, কয়েক সারি কটিবন্ধনী যমুনা ও তার সঙ্গীর দেহে দেখা যায়না। এরূপ অলঙ্কার প্রাচুর্যতা পালযুগে প্রাপ্ত এই রমণীদের অঙ্গে পরিলক্ষিত হয়না। তাদের হালকা অলঙ্কারে সুসজ্জিত দেখা যায়। পাটনায় প্রাপ্ত কুমারী দেবীর পরিহিত শাড়ী (চিত্র নং- ৭৫খ) এবং অলঙ্কারের সাথে পাহাড়পুরের প্রাপ্ত রমণী (চিত্র নং- ৬৩খ) দেবীর বেশ ভুষণের এবং গঠন ভঙ্গীমার মাঝে হুবহু মিল লক্ষণীয়। তাদের নিম্নবসন কাছাবিহীন রীতিতে শাড়ী এবং উভয়ের গলায় পরিহিত হার একই রূপ। পার্থক্য এই কুমারীর মাথায় মুকুট নাই, পাহাড়পুরের রমণী মস্তকে বৃহৎ মুকুট পরিহিতা।

ভারতীয় রমণীরা উর্ধাঙ্গে একটি ওড়না ব্যবহার করেছে। যাকে দোপাট্টা বলা হত। কখনো এই ওড়না দ্বারা তাদের বক্ষদেশ আবৃত হত কখনো বা কাঁধের উপর দিয়ে দুদিকে ঝুলে থাকত বা বাহুতে জড়ানো ও উড়ন্ত অবস্থায় দেখা যেত। বাংলার মহাস্থানগড়ের মায়াদেবী, পাহাড়পুরের নৃত্যরতা রমণী (চিত্র নং- ১৯ক ও ২৬) ও অন্যান্য রমণীদের পরিধেয়ের এই ওড়নার ব্যবহারের রীতি পূর্ব ও উত্তর ভারতীয় গান্ধার, মথুরা, উড়িষ্যার রমণী (চিত্র নং- ৬৯গ, ৭০খ, ৭১ঘ) দেহে অনেক পূর্বেই প্রচলিত ছিল। গুপ্ত ও পাল

যুগের বাংলার রমণীদের এই ওড়না ব্যবহারের রীতি ভারতীয় মৌর্য ও শুঙ্গ যুগীয় রমণীদের দোপাট্টার অনুকরণ বলা যায়। বাঙালী রমণীরা উর্ধবসন হিসেবে কখনো সুনপট্ট বা বডিস ব্যবহার করেছে (চিত্র নং- ২৫,৩৪গ,৩৫গ,৪০)। বাংলার পাল আমলের এই বক্ষবন্ধনী ভারতের গুপ্তযুগীয় মুদ্রায় উৎকীর্ণ রমণীর কাঁচুকীর সাথে তুলনীয় (চিত্র নং- ৭১ক)। এ যুগের অজন্তা চিত্রেও নারীদের বক্ষবন্ধনীর ন্যায় পেছনে গিঁটা বেঁধে উর্ধাঙ্গে বডিস বা ব্লাউজ জাতীয় পোষাক লক্ষ্য করা গেছে (চিত্র নং- ৭২ ক ও খ)। এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় অজন্তা চিত্রের রমণীদের উত্তর বসন হিসেবে নকশা খচিত ব্লাউজ এবং ডোরাকাটা, বিন্দু নকশার নিম্নবসনের সাথে পাল যুগের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার চিত্রিত পান্ডুলিপির দেবীর পরিধেয়ের সাথে অপূর্ব সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় (চিত্র নং-৩২,৪৩ক,খ, ৫৪,৫৫, এবং ৭২ ক,গ)। একই রকম বিন্দু ও ডোরা পায়জামা পরিহিতা রমণী ময়না-মতীর ফলক চিত্রে লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং- ৪৮ক)।

বাঙালী নর্তকীরা সাধারণত আঁটসাঁট পায়জামা পরত যা পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত লম্বা হত এবং একটি ওড়না কাঁধের উপর দুলিয়ে রাখত (চিত্র নং- ২৬, ২৭ক,গ, ৩৪ক)। কিন্তু পূর্ব ভারতীয় নর্তকী রমণীদের কেউ পরেছে হাঁটু পর্যন্ত নিম্নবসন এবং এই বসনের একপ্রান্ত কোমরে বেঁধে সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত। তঙ্গে একটি বড় দোপাট্টা হাতের বাহুমূলে জড়িয়ে অপর কাঁধের উপর দিয়ে তারা ঝুলিয়ে রাখত (চিত্র নং- ৭১ঘ)। ব্যতিক্রম এই যে দক্ষিণ ভারতীয় অজন্তা নর্তকীকে এ ধরণের পায়জামা বা ওড়নার ব্যবহার করতে দেখা যায় না (চিত্র নং- ৭২ঘ)। এই নর্তকী ডোরাকাটা, নকসী উর্ধবসনের সাথে গ্রীবাদেশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সম্মুখদিকে আচ্ছাদন জাতীয় একটি পোষাক বা এপ্রোন ব্যবহার করেছে যা দেহে ঝুলন্ত দেখা যায়। অনুমিত হয় নর্তকী পূর্ণহাতা উর্ধবসন ব্যবহার করেছে। অনুরূপ পূর্ণহাতা পোষাক চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত রমণীদেরও পরিহিত দেখা যায়(চিত্র নং- ৩ক ও ১০ক)

মধ্য ভারতীয় রমণীরা শিরোভূষণ ব্যবহারে বেশী আগ্রহী ছিল তা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য পোড়ামাটির ফলক চিত্রে ও ভাস্কর্যে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- ভারহূতের প্রাপ্ত দুজন যক্ষীর মাথা কাপড় দিয়ে আবৃত দেখা যায় (চিত্র নং- ৬৮ক ও খ)। সাঁচীর অপর রমণীদের (চিত্র নং- ৭৩ ক,খ,গ) মস্তক কাপড় খন্ড, টুপি, পাগড়ী সদৃশ শিরোভূষণ

লক্ষ্য করা গেছে। মধ্য ভারতীয় এই রমণীদের মাঝে মস্তক আবরণীর প্রচলন গুপ্তযুগের মুদ্রায় খোদিত মস্তকেও দেখা গেছে (চিত্র নং- ৭১ক)। এই ধরণের মস্তক আবরণ বাংলার মহাস্হান, পাহাড়পুর, ময়নামতীর প্রত্নসাক্ষ্যে রমণীদের মাঝে কিছু কিছু ধরা পরে (চিত্র নং- ২৭খ, ৩২,৪৮খ) টুপি জাতীয় বা পাখা ও মোচাকৃতি মস্তকাবরণের ব্যবহার এ অঞ্চলের রমণীদের মাঝেও লক্ষণীয়। চিত্র নং- ২৭ ক ও খ, ৩২,৩৮ক,৪১ক,৪৫ক,৪৮খ)। আমরা ভারতীয় নারীদের বৃহৎ শিরোভূষণের তথ্য অতি প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পা, মোহেনজোদড়ো ও পরবর্তী যুগের মথুরা, গান্ধার, ভারহূত, সাঁচী, প্রভৃতি এলাকায় প্রাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্য থেকে পেয়ে থাকি (চিত্র নং- ৬৬ ক ও খ, ৭৮ ক,খ,গ,ঙ,চ,ছ)। এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার রমণীদের শিরোভূষণ চর্চায় বাহুল্যতা কম ছিল বলতে হয়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়ে জাকজমকপূর্ণ অলঙ্কৃত শিরোভূষণের নমুনা সর্ব ভারতীয় রমণীদের হার মানায়।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ অলঙ্কার ভারগ্রস্থ, চূড়াযুক্ত শিরোভূষণ শোভিতা ও পর্যাপ্ত কেশবিন্যাসযুক্ত যক্ষিণী বা অপ্সরার মূর্তি প্রাচীন পাটলী পুত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত যক্ষিণী মূর্তিগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যবহুল। বিচিত্র কেশবিন্যাসযুক্ত, মুকুট পরিহিতা একটি বিদেশী নারীর মুখসহ তামলুকের কয়েকটি মূর্তি (চিত্র নং- ৪ক,৬ক,খ, ৭ক,খ,গ,৮১খ,৮২চ), পাটলীপুত্রের অনুরূপ মূর্তিগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১] তামলুক ও মহাস্হানের কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তির দেহভঙ্গী সচেতন, অলঙ্কার ভারগ্রস্ত ও যৌন আবেদন সম্পন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তাদের বসন ও অলঙ্কারের স্থূলতায় স্পষ্টভাবেই আদি কৌম সমাজের আভাস দেয়। এখানকার প্রাপ্ত মূর্তিগুলিতে শুঙ্গ আমলে মথুরার শৈল্পিক আদর্শ নজরে পড়ে।[২] তামলুকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি নারীমূর্তির বিচিত্র ও বিশদ শিরোভূষণ লক্ষণীয় যাতে অঙ্কুশ, কুঠার, ত্রিশূল প্রভৃতি পঞ্চায়ুধ প্রতীকের পঞ্চচূড়া সংযুক্ত। প্রায় একই ধরণের অস্ত্রাকৃতি চুলের কাঁটা পরিহিতা যক্ষীর নিদর্শন পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড়ে। তামলুক ও চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত এই মূর্তিগুলিকে শিরোভূষণ ও কেশবিন্যাস শুঙ্গ শৈলীর বৈশিষ্টসূচক মনে করা হয়। এখানকার প্রাপ্ত ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ নারী মূর্তির মধ্যে কোন কোনটির

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৭৭।

২ তদেব, পৃ. ৭৭৮।

পরিধেয় বিন্যাসে গান্ধার শিল্পের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। আবার জানা যায়, চন্দ্রকেতুগড় ও তামলুকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলি শুঙ্গ কুষাণ শৈলীর ঐতিহ্য বহন করছে। বিশেষতঃ যক্ষিণী মূর্তিগুলি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের অর্ন্তগত মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত যক্ষিণী মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। এছাড়া চন্দ্রকেতুগড় ও তামলুকে আবিস্কৃত পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনের মধ্যে মৌর্য যুগের বিশদ শিরোভূষণ পরিহিতা যক্ষিণী ও নারী মূর্তির প্রভাব বর্তমান। শুঙ্গ যুগের নমুনাগুলির মধ্যে চন্দ্রকেতুগড়ে পক্ষযুক্ত যক্ষিণী, বৃহৎ কেশবিন্যাসে ও পরিধেয়ে সজ্জিত ক্ষুদ্রাকার মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুষাণ আমলের নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছে রমণীদের পরিধেয় ও অলঙ্কার এবং মাছের প্রতীক চিহ্নিত একটি নারীমূর্তি। ~~এছাড়াও~~ গুপ্তযুগের কিছু নারী-মূর্তির নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে।[১]

মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটেছে সভ্যতার শুরু থেকেই। একে অপরের মধ্যে অনুকরণ প্রবণতাও ছিল বেশী। বাঙালী রমণীদের বেশ ভূষণের সাথে এজন্য ভারত রমণীদের একটি মিল পরিলক্ষিত হয়। বাংলার দেবী মূর্তি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তৈরী হওয়ায়, এগুলির তুলনায় অসংখ্য যক্ষী, অপ্সরা, সুরসুন্দরী, অলসকন্যা নর্তকীর আবরণ ও আভরণে সুসজ্জিত নারীর বেশ ভূষার সাথে ভারত রমণীর বসন ভূষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ফুল দ্বারা অঙ্গ সুশোভিতকরণের প্রথা বাংলায় আদিকালের রমণীদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তারা প্রকৃতির লতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রংয়ের ফুল দিয়ে নিজেকে অপরূপ করে তুলত। এ রীতি দেখা গেছে অজন্তা চিত্রের রমণীদের মাঝে। তারা মাথায় মুকুট, গলায় গুটিকার মালা, খোঁপায় ফুল, মস্তকে চূড়াখোঁপা, এলো খোঁপা বেঁধে সজ্জিত হয়েছে (চিত্র নং- ৭৩ চ ও চ)। অনুরূপ ফুল ও অলঙ্কারে শোভিত করে খোঁপা বেঁধেছে খাজুরাহোর রমণী (চিত্র নং- ৭৯খ)।

প্রাচীন বাংলার রমণীদের বিনুনী গাঁথা চুলের ঢং অতি প্রাচীন কালেরই রেওয়াজ। আজও নারীরা কত রূপে, কত ঢংয়ে বিনুনী বেঁধে দুলিয়ে মনোমুগ্ধকর রূপচর্চা করছে। এ রীতি সমগ্র ভারত উপমহাদেশেরই সর্বকালের সার্বজনীন কেশ বন্ধনী রীতি। এ রীতিতে বঙ্গের সাথে ভারত রমণীর কোন বৈসাদৃশ্য নাই। কেশবিন্যাস রীতির ক্ষেত্রে রমণীদের

সাজসজ্জার জন্য চুলের নানান বিন্যাস, বৈচিত্র ও ফ্যাশন অমরাবতীর ভাস্কর্য সমূহ অক্ষয় উদাহরণ। সমসাময়িক বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যেও এ সময়ের ভাস্কর্য সাক্ষ্যের চুলের স্টাইলকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বর্ণিত আছে। অমরাবতীর বিভিন্ন রকমের প্রতিকৃতি ভাস্কর্যে ভিন্ন রীতি বৈশিষ্ট সম্পূর্ণ কেশবিন্যাসের ধাঁচ সাতবাহন আমলের সামাজিক জীবনের একটি পরিচয় দিয়ে থাকে। এখানে দেখা যায় একটি রমণী পেছনে ঢিলা খোঁপা বেঁধে ছেড়ে দিয়ে ক্লিপ জাতীয় অলঙ্কার যুক্ত করে চুল বেঁধেছে (চিত্র নং- ৮০চ)। অপর রমণী চূড়াখোঁপা বেঁধে শিকলযুক্ত অলঙ্কার সিঁথিতে পরেছে, এরূপ কেশচর্চাকে যুথিকাবাহার বলা হয়ে থাকে (চিত্র নং- ৭৯ঙ)। কুন্ডলী পাকিয়ে বৃহৎ খোঁপা বাঁধা একজন রমণীর (চিত্র নং- ৮০ছ) এবং পেছনে বেণী গেঁথে গোঁড়ায় স্বর্ণের টুপি জাতীয় অলঙ্কার যুক্ত করেছে অপর রমণী (চিত্র নং- ৭৯চ)। নাগরা ধাঁচে কেউ কেউ চুল বেঁধেছে (চিত্র নং- ৮০ খ,গ,ঘ)। পশ্চাৎভাগে সুকৌশলে গাঁট দিয়ে খোঁপা বেঁধে কিছু চুলের গুচ্ছ সামনের দুই দিকে ঝোলানো রীতিতে অন্য রমণীকে কেশবিন্যাস করতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৮০ঙ)। কিন্তু এমন রীতি অমরাবতী ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। মস্তকে সিঁথিবিহীন অথবা সিঁথি কেটে গোলাকার খোঁপাকে কেশপাশ বলা হয়েছে। এ রীতিতে উত্তর-পূর্ব, মধ্য ভারতীয় ভারহূত, সাঁচী, অমরাবতী, মথুরা, গান্ধার প্রভৃতি এলাকায় রমণীদের কেশবিন্যাস করতে দেখা গেছে। বাংলার মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতী অঞ্চলের রমণীরাও একই রীতিতে কেশবিন্যাস করেছে। (চিত্র ৩৩ক,৩৫গ,৪২ক,খ, ৪৩গ,৪৮ঘ,৪৯ক,৭৮চ,৭৯ক,খ, গ, ৮০ক,ছ)। ঘোড়ার লেজের মত মাথার পেছনে উপরদিকে সীমান্তের শেষে চুল গোছাবদ্ধ-ভাবে বেঁধে রাখার রীতিও লক্ষ্য করা যায়। বাংলার এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের রমণীদের বিশেষতঃ অবিবাহিত বালিকাদের মাঝে এ রীতি প্রচলিত ছিল বেশী। অমরাবতী ও গান্ধার শিল্পে, অজন্তা চিত্রকলায়ও এ ধরণের কেশবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। এ রীতিতে কখনো আবার জালিকা ব্যবহার করা হয়েছে (চিত্র নং- ৭৮জ)।

পোষাক-পরিচ্ছেদের পাশাপাশি সেকালের বাঙালী ও সর্বভারতীয় রমণীরা অনেক গহনা দ্বারা ভূষিত থেকেছে। তবে সময়ের ব্যবধানে তাদের গহনা ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য

পরিলক্ষিত হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান পাথর খচিত অলঙ্কার রমণীদের প্রধান চাহিদা ছিল। প্রাচীন বঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটি ফলকচিত্রে রমণীরা কপালে অলঙ্কার পরেছে যা তাদের চুলের কিছু অংশ ব্যাপী বিস্তৃত। তাদের কানে বড় এবং মজবুত বৃহৎ গহনা গলায় মুক্তাহার বা গুটিকার বা স্বর্ণের হার,চুড়ি, বলয় এবং কটিতে ভারী ও দামী কটিবন্ধ পরিধান করতে দেখা যায় (চিত্র নং- ৪ক,খ,৬ক, ৭ক ও গ)। খ্রীস্টীয় ১ম,২য়,৩য় শতকের এই অঞ্চলের রমণীদের অলঙ্কার প্রাচুর্য্যতা বাঙালী রমণীদের বেশ ভূষণে, ফ্যাশন দুরস্তের কথাই ইঙ্গিত দেয়। টুনটুন শব্দ বিশিষ্ট ফিতাযুক্ত পায়ে মল পরিধান করা তৎকালের রমণীদের কাছে জনপ্রিয় ছিল। বঙ্গের রমণীদের নাকে নথ, নোলক, নাকফুল পরিধানের কথা প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলায় মৌর্য যুগ থেকেই প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক সমূহে রমণীদের বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের নিদর্শন আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু অতি প্রাচীন সভ্যতা পান্ডুরাজার ঢিবিতেও দামী ও কমমূল্যের পাথর বা গুটিকার তৈরী অলঙ্কারের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুঙ্গ,কুষাণ যুগে মণিমুক্তাখচিত পঞ্চলহর, মুক্তাবলীর হার, ফুলের মালায় অলঙ্কৃত হার, চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত রমণীর অঙ্গে শোভিত আছে (চিত্র নং- ৬খ,৭ক,৪খ)। বৃহৎ গুটিকার হার যা নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ,বৈজয়ন্তীকা হার তাদের পরিহিত দেখা যায় (চিত্র নং- ৮২ক)। গুপ্তযুগে বাংলার মহাস্থান-গড়ে রমণীদের গলায় এই মুক্তাবলী হার, পেঁচানো শিকলের মত মালা পরিধানের রেওয়াজও লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং- ৮২খ ও গ)। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত রমণীর কটিবন্ধ প্রথমদিকে যদিও অতি সাধারণ, পরবর্তীতে চারসারি গোলাকার নকশা বিশেষ এবং বিভিন্ন আকৃতির গুটিকার সংযুক্ত কটিবন্ধের নমুনা পাওয়া গেছে। কখনো শুধুমাত্র একটি স্বর্ণখচিত অলঙ্কারের কটিবন্ধ এখানকার রমণীরা পরেছে (চিত্র নং- ৮৩ক, ৮২ক,৩ক)। শুঙ্গ, কুষাণ যুগে রমণীরা হাতে বলয়, চার প্রকারের চুরি পরেছে (চিত্র নং- ৬গ, ৮২ক,৮৩ক)। এছাড়া কেয়ুর পরিধানের রীতিও বাংলার বিভিন্ন স্হানের রমণীদের বাহুমূলে পরিলক্ষিত হয়। মৌর্য,শুঙ্গ, কুষাণ যুগের রমণীদের কর্ণে খচিত নানান নকশার কুন্ডল, ইয়ারিং পরিহিত দেখা গেছে। মাথামোটা পেরেক আকৃতির কানের দুল চন্দ্রকেতুগড়ের রমণীদের কর্ণে বেশী

লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ফুল, পত্র আকৃতির কুন্ডল বাংলার রমণীরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই পরে আসছে, এই পত্র কুন্ডল দুল কর্ণসুবর্ণ ও মহাস্হানে প্রাপ্ত রমণীদের কর্ণে সুশোভিত হয়েছে। বাংলার পাহাড়পুর, মহাস্হানগড়-এ প্রাপ্ত রমণী চিত্রে বিভিন্ন প্রকারের কটিবন্ধ পরিধানের রীতি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া পান্ডুরাজার ঢিবিতে রমণীদের কটিবন্ধ ব্যবহারের নমুনা পাওয়া গেছে। এ থেকে কটিবন্ধনী পরিধানের রেওয়াজ বাংলার অতি প্রাচীনকালেরই সংস্কৃতি বলে মনে করা যেতে পারে।[১]

প্রত্নসাক্ষ্যের বিশ্লেষণে এ উপমহাদেশের রমণীর বসন ও ভূষণের যে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে বৈশাদৃশ্য অপেক্ষা সাদৃশ্যই বেশী নজরে পড়ে। বেশভূষার বৈপরীত্য ও বৈচিত্রের সমাবেশও কম নয় যা আজ অবধি আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এছাড়া চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিতে গ্রীক প্রভাব সূচক বৈশিষ্ট্য নারীমূর্তিগুলির শরীর গঠন, মুখ ও দেহাবয়ব ও পোষাকে পরিস্ফুট। এই নিদর্শনগুলিতে গ্রেকো-রোমান প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। এখানে প্রাপ্ত খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের গ্রেকো-রোমান চর্ম পাদুকা পরিহিতা চরণ যুগলও উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক সাক্ষ্যে রমণীদের অলঙ্কৃত পাদুকার নমুনা মেলে। সাহিত্যিক বর্ণনায় রমণীদের পাদুকা ব্যবহারের কথা যদিও পাওয়া যায় না কিন্তু যে সমাজে আদিকাল থেকে রমণীরা যে কোন অবস্হায় যে কোন মর্যাদায় সাজসজ্জা, শিরোবিন্যাস, প্রসাধন, অলঙ্কারে সদা ব্যস্ত থেকেছে সেখানে পাদুকা ব্যবহারের রীতি একেবারে ছিল না একথা স্বীকার করা যায়না। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, সামাজিক স্তর বিন্যাসের তারতম্যের কারণে, হয়তো এ রীতি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ভারতের গান্ধার ভাস্কর্যেও অনুরূপ কয়েক প্রকার গ্রীক রোমান স্টাইলের পাদুকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পাদুকাটি সাধারণ কিন্তু লম্বা-চওড়া। মেডেল আকৃতির অলঙ্কার শোভিত একটি পাদুকার নমুনা এখানে পাওয়া গেছে।[২] বেশ ভূষণ চর্চায় রমণীরা আদিকাল থেকে প্রসাধনী বস্তু ব্যবহার করতে সদা উৎসাহী ছিল, যা প্রাচীন সভ্যতা মোহেনজোদড়োতে প্রাপ্ত আয়না, চিরুণীর ব্যবহার, মৌর্য যুগীয় ভারতীয় রমণীর প্রসাধনে ব্যস্ত চিত্র, অজন্তাচিত্রে রমণীর প্রসাধনী, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত

---

১ S.S. Biswas, op.cit., pp. 19-24.

২ Ibid., p. 134.

রমণীর আয়না ধৃত চিত্র , দশম শতাব্দীতে আয়নায় অবলোকনে নর্তকীর চিত্র (চিত্র নং- ৮৪ ক,খ, ৮৫ ক,খ) এবং বহুবিধ নক্সার অলঙ্কারের নমুনা এই উপমহাদেশের রমণীর বসন ভূষণ, প্রসাধনের অপূর্ব সাক্ষ্য (চিত্র নং- ৮৬)।

কোন রীতি বা রেওয়াজ হঠাৎ করে শেষ হয়ে যায় না। কেননা নতুনকে গ্রহণ করা যায় যত সাচ্ছন্দে পুরনো রীতিকে বর্জন করা তত সহজ হয়ে ওঠে না। তাই দেখা যায় এদেশের রমণীর বেশ ও ভূষণের মাঝে মিশে আছে ঐতিহ্য। আর ঐতিহ্যের মাঝেই থাকে সৌন্দর্যের রহস্য। যেমন দেশের রাজা-রাণীর পোষাক পরিচ্ছদ অনুকরণ করেন অভিজাত সমাজ, আর অভিজাতদের দ্বারা প্রভাবিত হয় সাধারণ মানুষ, এই তো সামাজিক নিয়ম। যেমন- জাহাঙ্গীরের সময়ে রকমারী নকশায় কোমরবন্ধ বা পাটকার (Patka) ব্যবহার, যা রাজপুত মেয়েরাও ব্যবহার করত ঘাঘরার সংগে। পাটকা শুধু যে বেল্টের কাজ করত তা নয়, তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কোমরকে সরু রাখতে সাহায্য করত। পাটকা কাংড়া অঞ্চলের মেয়েরাও পরত।

বিস্ময়ের বিষয় যে, এই পাটকার ব্যবহারও প্রচলিত ছিল অতি প্রাচীনকালে (চিত্র নং- ৮৩খ)। খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের তামলুকে মৃৎফলক সজ্জো রমণীর অঙ্গে ছিল পাটকার ব্যবহার। নিঃসন্দেহে এ রীতি ছিল উচ্চ বিলাসী রমণীর। এস, এস , বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে চমকপ্রদ উক্তি করেছেন যে, "Some times richly brocaded and embroidered patka decorated with stringed beads are suspended from the Kamarband. Hanging between the legs they add a special charm to the costumes"[1] সুতরাং বলা যায় গ্রহণ এবং বর্জন করার মত উদার চিত্ত রমণীদেরকে সৌন্দর্যের জ্ঞান দান করেছে। শাড়ীর ডোরা নকশা, অলঙ্কারে জড়ানো সোনা-রুপার ফুল বসানো কাপড় ভারত রমণীদের মধ্যে চলন ছিল। পরবর্তী মুঘল আমলের মেয়েদের কাপড়েও ডোরা কাটা সিল্ক ও মসলিনের কারুকার্য খচিত নকশার প্রাধান্য দেখা যায়।

---

1 S.S. Biswas, <u>op.cit.</u>, p. 118.

প্রাচীন বাংলা তথা ভারতীয় নারীর সাজসজ্জার এমবিবর্তনের মধ্যে পরিবর্তন থাকলেও তারমধ্যে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য কখনো ছিলনা। তাই মধ্য যুগেও দেখা যায় প্রাচীন যুগের সুক্ষ্ম বস্ত্র, মনোরম নকশা, রং মনমুগ্ধ অলঙ্কার, প্রসাধনের রীতি-নীতি। ভারতীয় রমণীরা যে কোন সময়ই তাদের পোষাকে সৌন্দর্য গুণটি সম্পৃক্ত করতে ছিল সদা ব্যস্ত এবং ঠিক একই আগ্রহ প্রাচীনকালের রমণী সমাজের সাজসজ্জায়, প্রসাধনে, সুগন্ধি, সিঁদুর, টিপ, নাকে মূল্যবান নথ, ঠোঁট পান খেয়ে রাঙানো এবং সুবাসের জন্য কর্পুর ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান করা যায়। হাতে কঙ্কন, সুন্দর কাজ করা কাঁচুলি ও সূক্ষ্ম দামী শাড়ী, পায়ে মল ছাড়াও সর্বাঙ্গে চন্দন মাখা নববধুর সজ্জায় ছিল প্রাচুর্যতা স্বরূপ। সেকালে সর্বাঙ্গে অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে রমণীরা দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। আবার বাঙালী সাধারণ নারীরা সাজসজ্জায় প্রাচুর্যকে এড়িয়ে তারা তাদের দেহ ও মুখমন্ডল সুন্দর করেছে শাঁখা ও পোড়ামাটির অলঙ্কারে বা পত্র ও পুষ্পের সজ্জায়।

দেশ ও কালের প্রভেদে রুচিরও পরিবর্তন যথেষ্ট দেখা যায়। যা এক দেশের মতে সুন্দর তা অন্য দেশে অসুন্দরও হতে পারে। এজন্য রুচি ও সৌন্দর্যবোধ দেশ-কাল-পাত্র হিসেবে পৃথক হয় এবং একই দেশে একই সময়ে সে সমাজে ভিন্ন রুচির লোক দেখা যায়। কারণ সমাজ, পরিবার ও জাতির আপেক্ষিক প্রভাবের উপর রুচিবোধ অনেকখানি নির্ভর করে। তবুও অবশ্য স্বীকার্য যে, পৃথিবীতে এমন অনেক স্বাভাবিক ও সুন্দর বিষয়বস্তু আছে, যার সৌন্দর্য্য দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে অধিকাংশ সভ্য লোকেরই রুচিতে ভাল লাগে।

গ) প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য ও নন্দনতত্ত্বঃ

একটি নির্দিষ্ট যুগে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তা সবই সেই যুগের সমাজ বাস্তবতারই ফলশ্রুতি। সভ্যতার আদি সুরু থেকে সমাজ সচেতনতা ছাড়াও যুগ চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। যুগ হচ্ছে সেই যুগের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক সমস্যা। সেই সংগে থাকে নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। শিল্প কলা, সংস্কৃতি যা কিছু চিন্তাচেতনার বিষয় তা প্রতিটি যুগেরই বৈশিষ্ট। মানুষের যে কোন ধরণের বহিঃপ্রকাশ সামাজিক সত্যের সৃজনশীল অভিব্যক্তি। আমরা সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, যেদিন থেকে মানুষের অস্তিত্ব, যেদিন থেকে মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, সেদিন থেকে কোন না কোনভাবে সংস্কৃতির সে ধারক হয়েছে। এভাবে মানুষ যত অগ্রসর হয়েছে সংস্কৃতি চর্চা তত উন্নত হয়েছে, বিকাশ লাভ করেছে এবং বৈচিত্রপূর্ণ হয়েছে। যেমন এক পর্যায়ে যে সংস্কৃতি চর্চার উদ্ভব হয়েছিল নেহাৎ বাঁচার তাগিদে এখন তা ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে সমাজ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিংবা নিছক চিত্ত বিনোদন বা সৌন্দর্য চর্চা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষতঃ বেশ ও ভূষণ মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয়। যা মানুষের রুচি ও ব্যক্তিসত্ত্বার আধার।

বাংলার মৃৎফলকে সুদূর অতীত কাল থেকে সমাজের বিভিন্ন অবস্থার এবং মানব জীবনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে এক অর্থবোধক ধ্যান-ধারণা, আগ্রহ ও অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে এসব ফলকগুলিতে। মানুষের বিভিন্ন জীবনমুখী চিত্রের মাধ্যমে ফলকগুলিতে পোষাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি তারা সমাজে কোন গোত্রের, সংস্কৃতির অন্তর্ভুত তা নিরুপিত হয়েছে। এছাড়া পোষাক পরিচ্ছদে সম্পদের মান এবং সামাজিক সনাক্তীকরণের প্রতিফলন ঘটেছে। এভাবে বেশ ও ভূষণ অতি প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন জাতির মানুষের জীবন ধারায় অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করেছে। এদেশীয় সংস্কৃতিতে সুসজ্জিত রমণী সমাজে মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছে সব সময়ই। রমণীরা অনুরূপ হয়ে ওঠার জন্য স্বাভাবিক রীতিতেই অঙ্গ শোভাবৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছে কারণ সুন্দরী হবার বাসনা তাদের তীব্র। মানব মনের এই সাজবার প্রবণতা কখন থেকে তা অনুমান করা যায় মানুষ

যেদিন প্রাকৃতিক অজস্র রং ঋতুর রূপময়ী রূপান্তর দেখেছিল এবং ঐশ্বর্যমন্ডিত বিশ্বের নিগূঢ়তম রহস্যে অনুপ্রাণীত হয়ে তার মনে সৌন্দর্যানুভূতি জেগেছিল তখন থেকেই তা ব্যক্ত করবার তাড়না থেকে নিজেকে সুসজ্জিত করতে প্রয়াস পেয়েছিল। আদর্শ, কল্পনা, অনুভূতিকে প্রকাশ করতে মানব সভ্যতার উষালগ্ন কাল থেকে রমণীরা পত্র, পুষ্প, প্রাকৃতিক ভঙ্গুর, অল্প ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যগুলি নিয়ে প্রথমতঃ অঙ্গসজ্জা করেছিল। যে কোন দ্রব্য ব্যবহারে মঙ্গল অর্থে অথবা শত্রু-মিত্র সকলের উপর যাদু বলে প্রভাব বিস্তার করা, স্বাস্থ্য অটুট রাখা ইত্যাদি কারণে আদিম মানব কোন শ্বাপদের নখ, দন্ত, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর চোয়াল, ঝিনুক অথবা রঙিন পাথর ছিদ্র করে ব্যবহার করেছিল।[১] যার নমুনা এ যুগের মার্জিত রুচি সম্পর্ন মানুষের মাঝে আজও বর্তমান। এখনো হীরক, প্রবাল, চুনি, পান্না, প্রভৃতি ব্যবহারের সময় ধারকের পক্ষে মঙ্গল বা অমঙ্গলের ফলাফলের বিচার করা হয়ে থাকে। পোষাক আষাকের কেতা বা ঢং তখন অনুকরণের বিষয়টি সবার মাঝে প্রকট ছিল না। প্রাচীনকালে বেশবাসের মূলে ছিল বিশেষতঃ স্থানীয় রীতি, শাস্ত্রীয় অনুশাসন। প্রথম অবস্থায় শাড়ী এসেছিল গাত্রাচ্ছাদন, আভরনের প্রয়োজন থেকে, পরে আসে তার সৌন্দর্য চেতনা। পোষাকে, পরিধান ভঙ্গিতে পরিবর্তন, বৈচিত্র, রঙের উজ্জলতা, নকশার প্রণয়ন একেবারে আদিতে সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে রমণীরা তাদের বেশ ভূষণে সাদা-মাটা রীতি কাটিয়ে উঠেছে এবং পরিধানে রং, নকশার সমন্বয়ে সুশোভিত হয়ে উঠেছে। এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সর্বোপরি ভৌগলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে রমণীদের বেশ ভূষণের তারতম্য ঘটেছে তা অল্প মাত্রায়। বিশেষ ধাঁচ বা রীতি কালের বিবর্তনে পরিবর্তন হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু বেশ ও ভূষণের মূল বৈশিষ্ট আজও প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য হয়ে টিকে আছে। বাংলার আবহাওয়ায় রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে সহজ উপায়ে আচ্ছাদন হিসেবে, সামাজিক দায়িত্ববোধে, যেমন রমণীদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড, পশুপালন, সন্তান লালনে সহায়ক ছিল রমণীদের লম্বা আঁচল। এক সময় রমণীদের উর্দ্ধাংশে কোন আবরনের চল

---

১ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'অলঙ্কার', ভারত কোষ, ১ম খন্ড (কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৬), পৃ. ১৪০।

ছিল না। কিন্তু এ রীতি অবস্থাপন্ন পরিবারের ধন সম্পদ প্রতিপত্তির বাহনে দেখা যায়না। নগরাঞ্চলেও উর্ধাঙ্গ আবৃত রাখার প্রচলন ছিল। ভদ্র বেশ হিসেবে সমাজে উর্ধ্ব বসনের ব্যবহার অবশ্য বাঞ্ছনীয় ছিল। উর্ধ্বাঙ্গ বা বক্ষাবরণের জন্য এ বসন ছিল একখন্ড কাপড়, কখনও তা অবগুণ্ঠনের কাজ হত। রমণীরা নিজেদের আচ্ছাদিত করতে, শালীনতা রক্ষা করতে দুখন্ড বস্ত্র ভিন্ন আরও এক টুকরো কাপড় ব্যবহার করেছে। তা মস্তক আবরণের জন্য হউক কিংবা কেশগুচ্ছকে একটি চওয়ে কাপড় দিয়ে বেষ্টন করে রাখার জন্য হউক। বক্ষাবরণের জন্য পৃথক অপর একখন্ড বস্ত্রের ব্যবহার সে সময় রমণীদের মাঝে প্রচলিত ছিল, যাকে কাঁচুলি বলা হয়েছে। কাঁচুলি সেলাইবিহীন একখন্ড কাপড় যা বক্ষের সামনের দিকটা টেনে পেছনে বাঁধা। বলা যায় বেশ ভূষণে রমণীদের এমন রীতি নীতি সর্বক্ষেত্রে পালন করা সম্ভবত ছিলনা। দরিদ্র অথচ ভদ্র ঘরের মেয়েরা উত্তরবাস হিসেবে ভিন্ন এক টুকরো কাপড় এম্ন করতে অসমর্থ হওয়ায় অধোবাসের কিছু অংশ টেনেই উর্ধ্বাংশ ঢাকত বা ঘোমটা দিত। তাকে সম্ভবতঃ সেওটা বলা হত। পাল আমলে আনুমানিক ৮৫০ থেকে ১১৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রমণীদের উপরার্ধে জড়ানো কাপড়ের নাম ছিল 'আথনা' (আথখানা)। এই 'সেওটা' ও 'আথনা' আজকের শাড়ীর 'আঁচল' ও সংস্কৃতিতে 'অঞ্চল'।[১] এরূপ অধো-বাসের অংশ বিশেষ টেনে উর্ধ্বাংশ আবৃত করার রীতি লক্ষ্য করা গেছে যুগে যুগে। আদি রমণীরা একবসনে নিজেদের আবৃত করেছে যে সমাজে, সামাজিক বৈষম্যের কারণে সেই রমণীদেরই কখনো কঠোর পর্দার আড়ালে থাকার কথা জানা যায়। তৃতীয় চতুর্থ শতকের প্রাচীন বাংলায় রাজবাড়ীর অন্দর মহলের রমণীগণের নিজ খুশীমত চলাফেরা করার অভ্যাস ছিল না। সমাজের উচ্চ স্তরের এই রমণীরা অষ্ট প্রহর ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাখত। এ সমস্ত সম্ভ্রান্ত বাড়ির রমণীরা যখন রাস্তায় বেরোত তখন লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেদের আড়াল করে রাখত। জমিদার ঘরের এমন গৃহিনীদের ঘোমটা ছিল কুল মর্যাদার লক্ষণ।[২] এ রীতি সম্ভবতঃ আদি সামন্তযুগীয় সমাজের প্রভাব। সম্পত্তি করায়ত্তের পাশাপাশি

---

১ হোসনে আরা শাহেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

নারীদের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের ফলে রমণীরা আবদ্ধ হয়েছিল গৃহে, মর্যাদা পেয়েছিল কুলবধূর। অন্য আর একশ্রেণী রমণী টিকে রইল পুরুষের উপভোগের উপাচার হয়ে। সমাজের শ্রেণীভেদ, রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা, সংস্কৃতির সংঘাত, মিশ্রণ সর্বকালের মানব সভ্যতার পরিবর্তন ঘটেছে যেমন স্বাভাবিকভাবে, তেমন রমণীর বেশ ও ভূষণের ব্যতিক্রম ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মেই। অর্থনৈতিক বৈপরীত্যে মানুষের রুচি জ্ঞান সৌন্দর্য স্পৃহার মাঝে অসামঞ্জস্য ছিল। শ্রেষ্ঠ সুন্দর ব্যয়বহুল বেশ ভূষণ পরিধানের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি সকলের পক্ষে ছিলোনা। মূলতঃ সামাজিক অসমতার কারণেই প্রাচীন যুগের রমণীর বেশ ভূষণে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে সব সময়ই।

পুরুষদের সংগে রমণীদের অর্থনৈতিক কার্যে সহায়তা করার জন্য গৃহপালিত পশু পালনে, ধান ভেনে, মাছ বিক্রি করার কাজে হাটে মাঠে শ্রম দিতে হত। তাছাড়া দাসী, অশিক্ষিত ধাই এবং বারবণিতাদের নিজের জীবিকা নিজেকেই আয় করতে হত। এক্ষেত্রে তাদের পরিধেয় শাড়ী শুধুমাত্র একখন্ড বস্ত্র, উর্দ্ধাংশে ব্লাউজ, বা পেটিকোট কিছুই ব্যবহৃত হয়নি। ইউরোপীয় লেখিকা ফ্যানিপার্কস এ পোষাককে অদ্ভুত বলে আখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন, কোন অর্ন্তবাস পরা হতো না বলে শাড়ীর ভিতর দিয়ে চামড়ার রং এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকৃতি দেখা যেত।[১]

সপ্তম শতকে এদেশাগত চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াঙ বাঙালী রমণীর পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ রেখে গেছেন। মেয়েদের পোষাক মোটা শাড়ী বা সুতোর কাপড়। তারা একখন্ড ফতা কাপড় হাঁটুর নীচ পর্যন্ত কোমরে পেঁচিয়ে এবং অন্য একখন্ড বস্ত্র দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে উপর দিয়ে বামকাঁধ দিয়ে পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেয়।[২] তবে আদি রমণীরা প্রসাধন প্রিয় ছিল। সাজসজ্জার ব্যাপারে তারা ছিল স্বতন্ত্র রুচি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা চুলের পরিচর্যা করতে খুব ভালবাসত এবং শিমুল ফুল, চম্পাফুল

---

১ P. Parks, pp.59,60উদ্ধৃতি গোলাম মুর্শিদ, সংকোচের বিহ্বলতা, (বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ১০৫।

২ Travels of Hiouen Thsang: Translated by S.Beal, Vol.IV, Calcutta:, 1931), p.16.

বা করবী ফুল খোঁপায় গুজে দিয়ে অঙ্গসজ্জা করে দেহের লাবন্য বৃদ্ধি করতে ছিল অত্যন্ত পটিয়সী। কখনও সাধারণ পল্লী ও নগরবাসী দরিদ্র গৃহস্থ রমণীরা পরত নির্ভূষণ কার্পাস বস্ত্রমাত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল ছিন্ন ও জীর্ণ। তাদের ব্যবহৃত অলঙ্কার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল রুপার। তবে উচ্চ ধনী শ্রেণীর মধ্যে সোনার গহনার প্রচলনই ছিল সর্বাধিক। তারা কটিদেশে এবং পায়ে রুপার অলঙ্কার পরত। পায়জোর, নুপুর, চরণপদ্ম ও আঙ্গুঠী পায়ের অলঙ্কার ছিল অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়। ধনবতীদের পায়ের অলঙ্কারের ওজন মধ্যে মধ্যে চার সের পর্যন্ত হত। বিবাহিত স্ত্রীলোকের হাতে শাখা ও লোহার খাড়ু অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। তৎভিন্ন সোনা কিংবা রুপার বলয়, কঙ্কন, বাহুতে সোনার তার, বাজু, গলায় হার দিবার রীতি ছিল। নিতান্ত দরিদ্র বিবাহিত রমণী গুঞ্জা দিয়ে মালা গেঁথে গলায় দিত।[১] নাকে ছিদ্র করে নথ বা নোলক পরত। নাকের গহনাটি সামাজিক বিধি অনুযায়ী সোনার দ্বারাই তৈরী হত। যাদের সোনাও জুটতো না তারা কেবল একটি বালী নাকে দিত। যা হোক বিশেষ ক্ষেত্রে অলঙ্কার ভারগ্রস্থ রমণীদের কানে কুন্ডল, কড়ীখেড়ী, পাশা, ঝুমকা ও কর্ণফুল দিবার রীতি ছিল। এইসব অলঙ্কার ভারে কখনো কখনো তাদের কান ছিড়ে পড়ত।[২] সাজসজ্জার দিকে প্রাচীন কালের রমণীরা যে সৌখিন ছিল তা তাদের কাজলের টিপ কপালে, সিঁথিতে সিঁদুর, পায়ে আলতা, ঠোঁটে অলক্তক, দেহ ও মুখমন্ডল প্রসাধনে চন্দনের গুঁড়ো, জাফরান ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোন রমণী বিধবা হলে সামাজিক রীতি অনুযায়ী সিঁথিতে সিঁদুর, নাকে নাকফুল ও অন্যান্য প্রসাধন বা অলঙ্কার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। বেশ ও ভূষণ এর ক্ষেত্রে তাদেরকে শাস্ত্রীয় নিয়ম মোতাবেক চলতে হত। সেকালে সমাজের বিভিন্ন সভা সমিতিতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ ধরণের পোষাকের রেওয়াজ ছিল। যেমন বারাঙ্গনার নর্তকী রমণীদের পরিধেয় ছিল পায়ের গোঁড়ালী পর্যন্ত আঁটসাঁট পায়জামা, দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের উপর দিয়ে তারা ঝুলিয়ে দিত

---

১ সুধীর কুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, (কলিকাতাঃ মিতালী প্রকাশন, ১৯৬২), পৃ. ১৯৩।

২ শ্রী দুর্গাচরণ স্যান্যাল, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, (কলিকাতাঃ ১৩১৭ বং), পৃ. ৪২৯-৩০।

লম্বা একটি ওড়না। নৃত্যরত অবস্থায় ওড়নার প্রান্তদ্বয় উড়তো লীলায়িত ভঙ্গিতে।[১] পায়জামা সাধারণতঃ কটিবন্ধের সাহায্যে কোমরে আঁটকানো থাকত। মুক্তা বা পুঁতির গাঁথা মালা কখনও রেশমী পাতলা মসৃণ কাপড়ের কটিবন্ধ তারা ব্যবহার করত। বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিত থাকত এসব নর্তকীরা।[২] সেকালে নগরে ও গ্রামে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখার প্রথা ছিল। তার উপর আবার দেব দাসী প্রথা ছিল, এই প্রথম অষ্টম শতকের দিকের রীতি বলে জানা যায়। দেব দাসীদের সম্পর্কে জানা যায় তারা সকলেই নানা কলা নিপুনা হত এবং বিত্তবান ও প্রভাবশালী সমাজে নিজেদেরকে তাদের সঙ্গিনীরূপে ভাবত, বিভিন্ন লিপি প্রশস্তিতেও দাসীদের বিলাসলাস্য ও সৌন্দর্য লীলা বর্ণিত আছে।[৩] আরো জানা যায়, রাজ-বাড়ীর ভৃত্যের স্ত্রীরা নাকি হার, কর্ণাঙ্গুরীয়, মল, সুবর্ণ বলয় ইত্যাদি পরত। ভরত-মুনি রমণীদের বেশভূষণ সম্পর্কে তার নাট্য শাস্ত্রে আনুমানিক তৃতীয় শতকে লিখেছেন, "গৌড়ী নামক প্রায়ং সশিখা পাশ বেনিকম" অর্থাৎ গৌড়ীয় নারীদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ এবং তাদের চুলের বেণীর শেষাংশ থাকত শিখার মত মুক্ত।[৪] কখনও বাঙ্গালী রমণী গন্ধ তেল মাখানো চুল মাথার উপর চুড়োর মত করে বাঁধতো।[৫] বাঙ্গালী রমণীরা নানা কৌশলে বিন্যস্ত করে চুল রক্ষা করতে ভালবাসতো। প্রাচীন সাহিত্যে রমণীদের দীর্ঘ কেশ চর্চার কথার উল্লেখ অনেক স্থলেই আছে। খোঁপা বাঁধবার যে কত কৌশল এদেশের মেয়েরা জানতো তার ইয়ত্তা করা যায় না। ময়নামতীর গানে অদুনার খোঁপা বাঁধবার বিস্তারিত বর্ণনা থেকে খোঁপা বাঁধা বিদ্যাটা যে কলা শিল্প হিসেবে রীতিমত শিক্ষা দেয়া হত তা

---

১ R.C. Majumdar, (ed), H.B., p.614.
M. A. S. I. No. 55, pl. XXXIV,a, XLI,c .

২ Ibid., M.A.S.I. No. 55, pl,XXIX,d., S.L.W.E.M.B. pl. IX 2,3, pl. II,I.

৩ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭-৮৮।

৪ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৯।

৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

স্পষ্টই বুঝা যায় ডঃ শাহানারা হোসেন তাঁর গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, They decorated their coiffure with Ornaments, flowers and floral wreaths, they also used oil in their hair.[২] বিবাহ উৎসবে খোঁপা বাঁধা নববধুর সৌন্দর্য বিকাশে যেমন অত্যাবশ্যকীয় ছিল, তেমন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানাদিতে, কর্ম ব্যস্ততায় কেশগুচ্ছকে সাজসজ্জা বেশে অথবা প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন ধাঁচে ঢংয়ে বেঁধেছে বাঙ্গালী রমণীরা। তারা কেশ বিন্যাসে ছিল পারদর্শী তবে মস্তকাবরণ সব সময় ব্যবহার করেনি। বাংলার রমণীদের খোঁপার বিভিন্ন নামের তথ্য দিয়েছেন পন্ডিত দীনেশ চন্দ্র সেন। তাঁর মতে এই খোঁপাগুলির মধ্যে এক এক রকম খোঁপার এক এক নাম ছিল, শুয়াঠুঁটি, মুটকী, ঝুটকী, বেনে পেতে পাড়া, বিউনী, সিঁথি কাটা, চুড় খোঁপা, প্রজাপতি, গোয়ালিনী এবং সিঁতে খোঁপা প্রভৃতি।[৩]

কেশবিন্যাস সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। অবিন্যাস্ত চুলকে পরিপাটি করে সাজিয়ে তাকে ইচ্ছামত আকারে বা ঢংয়ে বাঁধন দিয়ে বা আঁটকিয়ে রাখা এবং পুষ্প, স্বর্ণের চুলকাঁটা, অতিরিক্ত মণি রত্ন সমৃদ্ধ মাথার দিকে প্রশস্ত পেরেক জাতীয় অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করা সভ্যতার উষালগ্ন থেকে মানুষের মধ্যে প্রচলিত প্রথা হিসেবে চলে আসছে। আবার মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে এবং ব্যক্তি অভিরুচির তারতম্য ভেদে চুলের পরিপাটি বা তার রীতি ঢংয়ের পরিবর্তন হয়েছে।[৪] ঘাড়ের ওপর ঝোলানো খোঁপা, কখনো মাথার পেছনের দিকে এলানো, এভাবেই রমণীরা তাদের কেশদাম নিপুন কৌশলে বিন্যস্ত করত। তদ্রুপ ব্যক্তি সৌন্দর্য চরিতার্থ করবার জন্য প্রাচীন বাঙ্গালী ও ভারতীয়

---

১ শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯১-৯২।

২ S.Hussain. S.L.W.E.M.B , P. 54.

৩ শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯১-৯২।

৪ S.S. Biswas, op.cit., p. 129.

রমণীরা অর্থে অলঙ্কার ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়েছে। অলঙ্কারের প্রতি নারীর দুর্বলতা এবং সৌন্দর্য পিপাসা থেকে নিজেকে শোভনীয় করার সচেতনতা মানব সমাজের উষালগ্ন থেকেই। পুরুষের কাছে সুন্দরী নারী চিরকালই কাম্য বস্তু। তাই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী তার সৌন্দর্য চর্চা করে নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য পিপাসা মেটাতে এবং পুরুষের নিকট সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতো। প্রাচীনকালে রাজকীয় ও অভিজাত সমাজে বহু বিবাহ এবং হারেম প্রথার প্রচলনও অভিজাত ধনী পরিবারের রমণীদের নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও বজায় রাখতে সদা সচেষ্ট রাখতো। তবে সূচনাকালে বা প্রাথমিক স্তরে রমণীদের ব্যবহৃত অলঙ্কার ছিল খুব সাধারণ বা আদিম এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে তা সুন্দর ও সূক্ষ্ম রূপ লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রকার নক্সার গহনা রমণীরা স্মরণাতীতকাল থেকে ব্যবহার করে আসছে। পন্ডিত শান্তি স্বরূপ যথার্থই বলেছেন, "রমণীদের অলঙ্কার বিচিত্র ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে গহনাগুলি কেবল মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য ধাতু দ্বারা কারিগরী বিদ্যায় উদ্ভাবন হয়নি বরং ইচ্ছামত শ্রম দ্বারা ব্যাপক, মনোরম এবং দীপ্তিময় করে তৈরী করা হয়েছে। অলঙ্কার তৈরীর বিভিন্ন ধাঁচে, সবগুলিতেই ভিন্ন নকশা বা মোটিফের সমন্বয় যুগের পর যুগ ব্যবহার কারিনীদের চক্ষু ঝলসিয়ে দিয়েছে।"[১] বাংলার আলোচ্য সময়কালের পোষাক, পরিচ্ছদ, কেশচর্চা, অলঙ্কার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মোহিতকর। ভারত রমণীরা কেউ শাড়ী, ঘাঘরা ও ফুল শোভিত ওড়না ব্যবহার করত। তাদের কাপড় মসৃণ তন্তু দ্বারা মনোরোম ভাবে তাঁতে বোনা। তাদের সৌন্দর্য সচেতনতা প্রতীয়মান হয় তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদের লাবন্যতার মাঝে। তাদের অলঙ্কার গহনা সমাজের বাস্তবজীবনকে দীপ্তিময় করেছে। সিল্কের মত কেশের সুনিপুন বিন্যাস আর কোমরের কটিবন্ধ তাদের রূপ যৌবনের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেছে। কোমর বন্ধনী দ্বারা আঁটকানো শাড়ী বা ঘাঘরা এবং তার সাথে ওড়নার আংশিক সামনের দিকে ঝুলেপড়া কিনারদ্বয় বাতাসে দোলায়িত সমকালীন ভাস্কর্য বা পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ এই চিত্রগুলি হতে প্রতীয়মান হয় যে দৈহিক শোভা বর্ধনে প্রাচীন বাঙালী রমণীরা একটি সুরুচীপূর্ণ মানসিকতার অধিকারী।

---

১ S. Swarup, The Arts and Crafts of India and Pakistan, (Bombay: 1957), p. 83.

শুঙ্গ, কুষাণ আমলের রমণীদের মধ্যে পূর্ণ হাত যুক্ত ব্লাউজ এবং ঘাঘরা ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রচলিত প্রথা। ঘাঘরার পাশাপাশি শাড়ী পরিধান করা ছিল একটি বিশেষ ধরণের রেওয়াজ। এ সময়ের সূক্ষ্ম কাপড় প্রাচুর্যপূর্ণ সমাজের ইঙ্গিত দেয়। এ ধরণের কাপড়ে নারীত্বের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হত। শাড়ী কোমর পর্যন্ত সংবেদনশীলভাবে আবদ্ধ করা এবং নাভির অবশিষ্ঠাংশ কখনো অনাবৃত রেখে শাড়ীর সূচীকর্মের অংশ বিশেষ সামনে অথবা পেছনে ঝুলিয়ে রাখা হত, যা বাতাসে প্রলুব্ধকর সৌন্দর্য সৃষ্টি করত।

সামাজিক ও ধর্মীয় নির্দেশনায় অলঙ্কারের প্রচলন ঘটলেও যুগ পরম্পরায় গহনার ব্যবহার নারীর রূপচর্চায় প্রধান অবলম্বন হয়ে পড়ে। অলঙ্কার ধারনের বিধি নিষেধগুলি এমন ছিল যা উচ্চ বর্ণের জন্য প্রযোজ্য না হলেও নিম্ন সমাজের জন্য প্রচলিত থাকত। যেমন, রাজ পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউ পায়ে সোনার নূপুর বা অন্য গহনা পরার নিয়ম ছিলনা। মুকুট পরার ক্ষেত্রেও এ ধরনের বিধি বিবাহিত, অবিবাহিত রমণীর জন্য প্রযোজ্য ছিল। তদ্রূপ বিবর্তমান সমাজের সংস্কার সংস্কৃতির আলেখ্য ছিল রমণীর পরিধেয় শাড়ী। বৈদিক যুগে শাস্ত্রীয় নির্দেশানুযায়ী শাড়ী ছাপান হত। মেয়েদের সমাজে মূল্যায়নের উপর শাড়ীর নকশা বিবৃত হত। প্রাচীনকালের শাড়ীতে হাঁস, মাছ, হাতি, ময়ূর, শঙ্খ এসব নকশা চিত্রায়িত হয়েছে। মঙ্গলচিহ্ন সূচক শাড়ী পরার যেমন নির্দিষ্ট সময় থাকত, তেমনি নির্ধারিত ছিল পরার জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান। নববধুর শাড়ীর রং হত লাল। নারীর দেহের বিকাশের সঙ্গে লাল রংয়ের যেন নিবিড় বন্ধন আছে। নারীর সাজসজ্জায় তাই লাল রংয়ের প্রাধান্য আদি থেকেই। যেমন সিঁদুর, অলক্তক, কুমকুম দিয়ে সাজতো নারীরা। রমণী মা হলে প্রিয়জনেরা শাড়ী উপহার দিত লাল। আবার ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ অভিসারিকা রাধাকে গীত গোবিন্দ কাব্যে নীল বসন পরিহিতা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বিরহের প্রতীক হিসেবে মেঘ রং শাড়ীর উল্লেখ কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে সুস্পষ্ট। রমণীর জীবন সঙ্গী স্বামীর বেঁচে থাকার অবস্থায় ভালবাসার আচ্ছাদন রঙিন শাড়ী, স্বামীর মৃত্যু ঘটলে নারীর জন্য এ পোষাক হয়ে উঠতো রংবিহীন সাদা বসন। মঙ্গল অর্থে নব বধুকে পরান হতো দুমাথাযুক্ত মৎস ও ফুলের নকশা তোলা মৎস পুষ্পখচিত শাড়ী। পোষাকের মধ্যে

মানব অনুভূতির সার্থক প্রতিফলন হয়েছে যুগ কাল নির্বিশেষে তা শাড়ীর বিচিত্রমুখী ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এক কালের রমণীদের পরিধেয় দু টুকরো কাপড়ের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে সভ্যতা, সংস্কৃতির সংস্পর্শে সৌন্দর্য সৌকর্যে পরিপূর্ণ হয়ে রমণীর বেশ ও ভূষণ নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে বিকশিত হয়েছে। রমণী হয়ে উঠেছে শ্রীময়ী।[১] জানা যায় বিশেষ আশীর্বাদ বা মঙ্গলের চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হত নবরত্ন বা নয়টি রত্নের সমাহার, যেমন, মুক্তা, চুনি, গোখরাজ, হীরক, পান্না, নীলকান্তমণি, প্রবাল নীলকান্তমণি, পাথর এবং গোমেদ।[২] এক একটি পাথর বিশেষ গুণাগুণের প্রতীক হিসেবে কাজ করত। বিভিন্ন শুভ, অশুভ ভাগ্যাদর্শের প্রতিকার বা উপকার অর্থে প্রাচীনকালে রমণীদের চাহিদা ছিল এ সমস্ত পাথরগুলির এমন কি পুরুষদেরও কর্মক্ষেত্রে, চলাফেরায় বিশেষ সহায়ক হিসেবে এগুলি পাথর ছিল অতি মূল্যবান।

এছাড়া শিরোভূষণের ব্যবহার তৎকালে সমাজে একটি বৃহৎ অংশের রমণীদের রেওয়াজ বা ফ্যাশন হিসেবে প্রচলিত ছিল বলাই স্বাভাবিক। দেবী প্রতিমার শিরোভূষণ দেখে অনুমান করা যায়, তা বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে পরিধান করা হত। সমাজের ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের মাঝেও এর ব্যবহার দেখা যায়। আর সাধারণ জনগণের জন্য শিরোভূষণ ধর্মীয় পবিত্রতা বলে গণ্য হত। বর্তমানকালে দেখা যায় রমণীরা ধর্মীয় উৎসবে অবগুন্ঠন দিয়ে শিরোভূষণ রক্ষা করে থাকে। তবে শিরোভূষণের তুলনায় বাঙালী রমণীর সুশোভিত কেশ বিন্যাসের ব্যাপক ও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়।[৩] একদিন আদিম মানুষ কেশে মাটির প্রলেপ লাগাত এবং তাদের বীরত্ব ও গুণের জন্য অর্জিত জয়চিহ্ন ও তকমা পরিধান

---

১ হোসনে আরা শাহেদ, <u>প্রাগুক্ত</u>, পৃ. ৯২-১০৪।

২ Jourage Bardwood, <u>Industrial Art of India</u>. (London, Daublo, Chapman and Hall Lim, 1972), pp. 185-186.

৩ S. Sahay, <u>op.cit.</u>, p. 86.

করত। মেয়েদের মধ্যে চুলকে চক্ষু হতে সরিয়ে রাখবার জন্য ব্যবহৃত বন্ধনী বর্তমান ফিতার পূর্বসূরী। প্রাচীন কালের কেশবিন্যাস অনেকটা আনুষ্ঠানিক, ঐতিহ্যগত ও সামাজিক ছিল। অসভ্য সমাজে পালক গুচ্ছ, শঙ্খ মুকুট পরিধান, মাথায় চাঁদি কামানো পুরুষের যেমন রীতি ছিল, তেমন কুমারীর চুলগুচ্ছ দোলানো, বিবাহিতা স্ত্রীর চুল বাঁধা বা বেণী করা হত। আলুলায়িত চুল অনেক দিন পর্যন্ত শোকের চিহ্ন হিসেবে প্রচলিত ছিল। চুলে তৈল মাখানো ও সজ্জিতকরণ আনন্দের প্রতীক হিসেবে মনে করা হত। অতি প্রাচীন হতে চুলকে রঙিণ করা, সাদা করা, কোঁকড়ানো, চুলের খোঁপা করা, চুলে মোম লাগানো, স্বর্ণ বা অন্যান্য পদার্থের গুঁড়ো মাখানো, চুল কাটা, আসল চুলের সঙ্গে নকল চুল মেশানো, চুলে সুগন্ধি দেয়া, পরচুলা দ্বারা মাথা ঢাকা, গুটিকা, অলঙ্কার, গুচ্ছ, ফিতা, চিরুণী, কাঁটা, জালিকা এবং আসল বা নকল ফুল দিয়ে কেশ সজ্জিত করার রীতি সর্বকালেই প্রচলিত ছিল।[১]

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক উৎস থেকে মনে হয় শিরোভূষণ ছিল সমাজে মান সম্মান-সূচক এবং পরিধান হিসেবে এর তাৎপর্য ছিল। তবে উল্লেখ করতে হয় যে, মৌর্য, শুঙ্গ আমলে দু'ধরনের শিরোভূষণ দৃষ্ট হয়, যথা সাধারণ পাগড়ী এবং ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট পাগড়ী। অনেক সময় রমণীরা কেবল পুরুষের মতই শিরোভূষণ পরিধান করত না বরং এগুলি ছিল অনেক বিস্তৃত। এই প্রকার শিরোভূষণ দৃষ্ট হয় ভারহুত ভাস্কর্যে। কতকগুলি রমণীকে দেখা যায় তারা রুমাল দ্বারা কিংবা আধুনিক রমণীদের মত ওড়না দ্বারা মাথাকে আবৃত করতে। মতিচন্দ্রের মতে সাধারণতঃ রমণীরা লম্বা বস্ত্র খন্ড দ্বারা মস্তককে আবৃত করত এবং কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা পাগড়ী পরিধান করত।[২]

কিন্তু গান্ধার শিল্পকর্মের রমণী চিত্রে দেখা গেছে প্রায়ই শিরোভূষণ বিহীন, স্বল্প সংখ্যক ঘোমটা, পাগড়ী, চারিদিক দিয়ে মণিখচিত মুকুট দৃশ্যমান হয়। এ ধরণের

---

১ বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫), পৃ. ১৭৩-৭৪।

২ Motichandra, Prachina Bharatiya Vesabhusan, p. 69.

শিরোভূষণের মধ্যে মুকুট অপেক্ষা ঘোমটা বা পাগড়ীর প্রচলন বেশী মনে হয়। তবে মুকুট সম্ভবতঃ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পরিধান করা হত। যেমন, বিবাহ অনুষ্ঠানে মুকুটের ব্যবহারের কথা জানা যায়। অতএব বলা যায়, কুষাণ বা তৎপরবর্তীকালে আমরা বিভিন্ন প্রকার শিরোভূষণ যেমন পাগড়ীর পাশাপাশি টুপি, মুকুট প্রভৃতি ব্যবহারের তথ্য পেয়ে থাকি। তবে এ সময়ের পোষাক পরিচ্ছদে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, শাসকদের ভূমিকার কারণে। তাই পোষাক পরিচ্ছদে পাজামা, টুপি বা হেলমেট প্রভৃতির ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যায়। কুষাণ শাসনামলের মুদ্রা উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায়। এগুলিতে রাজা-রাণী এবং দেবীর চিত্র উৎকীর্ণ হয়েছে। দেব-দেবীর মস্তকে প্রায় একই প্রকার শিরোভূষণ পরিহিত দেখা গেছে। দেবীর মস্তকের উপর দিয়ে ওড়না এবং রাজার মস্তকে রাজ মুকুট পরিহিত দেখা যায়। অতঃপর বলতে হয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত যখন গুপ্তরা মগধে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং উত্তর পূর্ব ভারতে তাদের রাজ্য বিস্তার করেন, সেই সময় কাল অবধি কুষাণ আমলের ধাঁচের পোষাক পরিচ্ছদ সমন্বিত শিল্পকলা প্রচলিত ছিল। গুপ্ত আমলে তাই পূর্ববর্তী শিল্প ধাঁচই উচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্টপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ধারাবাহিকতার পাশাপাশি সমাজ জীবনের উন্নত রূপের প্রভাব পড়েছিল শিল্প কলায়।[১] এ সময়ের পোষাক পরিচ্ছদের তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানা যায়। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও আবহাওয়ায় নারীরা বিভিন্ন রংয়ে রংয়ে পোষাক -পরিচ্ছদ ব্যবহার করত। এ সময় কালের ভাস্কর্য, পোড়ামাটি ফলক এবং চিত্রকর্মে কয়েক প্রকার রমণীদের শিরোভূষণের তথ্য লাভ করা যায়। কিন্তু সমকালীন সাহিত্যকর্ম এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদিতে শিরোভূষণ অপেক্ষা কেশবিন্যাসের উপর অধিক গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যিক তথ্য থেকে জানা যায়, কেবলমাত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিশেষতঃ বিয়ে উপলক্ষ্যে শিরোভূষণ পরিধান করা হত। অনেক সময় রাণীর মাথায় রাজ মুকুট পরিধানের বর্ণনা পাওয়া যায়। কালিদাস তার সাহিত্যে শিরোভূষণ হিসেবে অবগুণ্ঠন এর উল্লেখ করেছেন।[২] এটি সম্ভবতঃ

---

১ Fa-Hian, Record of Buddhistic Kingdom, . p. 43. Motichandra, op.cit., pp. 29-37

২ কালীদাস। রঘুবংশ। (কলিকাতাঃ ১৩৮৫), পৃ. ১২৬

একখন্ড কাপড় যা মস্তককে আবৃত করা বোঝায়। রঘুবংশে বিবাহের সময় শিরোভূষণের কথা জানা যায়। নববধূর মুখ মন্ডলের উপর দিয়ে ঘোমটা দিয়ে রমণীর লজ্জাকে আড়াল করার কথাও বলা হয়েছে। এমন শিরোভূষণ বিবাহকালে বাধ্যবাধকতা স্বরূপ ছিল।[১] এ সমস্ত সাহিত্যিক উৎসের সমার্থক সূচক এই আমলের প্রচুর ভাস্কর্য এবং মুদ্রাগুলি থেকে তথ্যের ধারাবাহিকতা উপলব্ধি করা যায়।[২] এগুলি তথ্য থেকে রমণীর শিরে শিরোভূষণ হিসেবে ঘোমটা অথবা মুকুটের কথাই জানা যায়। তবে পোড়ামাটি ফলকে রমণীর শিরো-ভূষণ বিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত উপাত্ত পাওয়া যায়। তবে এ কথা নিশ্চিত যে শিরোভূষণ দৈনন্দিন জীবনের নিয়মিত পরিধেয় ছিলনা বরং বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অথবা উচু বংশের বা ধনী পরিবারের রমণীরা শিরোভূষণ হিসেবে মুকুট ব্যবহার করত। বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে উল্লেখ করেছেন, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা বিশেষ অনুষ্ঠানে, বিবাহে এবং বাইরে চলাচলের সময় ঘোমটা দিত।[৩] কাদম্বরীতে বাণভট্ট লাল, নীল এবং গাঢ় লাল বর্ণের ঘোমটা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। দৃশ্যতঃ বিভিন্ন রংয়ের ঘোমটা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিধানের রীতি ছিল। যেমন বিবাহকালে রমণী লাল অথবা কমলা রংয়ের ঘোমটা পরিধান করত কিন্তু কোন পূজা পার্বন উৎসবে গাঢ় লাল বর্ণের ঘোমটা দেয়ার রেওয়াজ ছিল। সম্ভবতঃ প্রেমিকের কাছে কোন যুবতী চুপিসারে গমনকালে নীল রংয়ের ঘোমটা দিত, উক্ত সাহিত্যকর্মে কুষাণ এবং গুপ্ত আমলের রমণীদের মুকুট, টুপির ব্যব-হারের মত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[৪]

---

১ G.S. Ghurye. Indian Costume, (Bombay, 1957), p. 251.

২ A.S.I.A.R. 1915, p. 72.

৩ Harscharita, ed., Fuhrer, A.p. 149.

৪ Kadambari, ed., Pansikar, W.L. 21.192, p. 259.

স্মরণাতীতকাল থেকে ভারত রমণীরা তাদের কেশদামকে বিভিন্নভাবে আবৃত করেছে। যুবতী মেয়েরা বিনুনীকে আকর্ষণীয় করার জন্য সাদা রুমাল দ্বারা আবৃত করত। বয়ঃসম্মুখ এবং যুবতী রমণী উভয়েই টুপি ও পাগড়ী পরিধান করত।[১] সম্ভবতঃ অপদেবতা, ডাইনী, ভূত প্রেত বা যাদু থেকে আত্মরক্ষার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হত। কখনো অশরিরি শক্তি থেকে রক্ষার জন্য তারা টুপিতে মাদুলী বা কাঁচ জাতীয় জিনিস সংযুক্ত করত। জানা যায়, শিরোভূষণ ব্যবহারের প্রারম্ভকালে এটি ছিল অতি সাধারণ এবং ক্রমান্বয়ে তার অলঙ্করণের শোভা বর্ধনের জন্য প্রসার ঘটে। রমণীর শিরোভূষণের তথ্য প্রথম পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায়ঃ হরপ্পা মোহেনজোদড়ো খনন কার্যের ফলে এ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য মেলে। এ এলাকায় প্রাপ্ত অধিকাংশ রমণী দেহ ভঙ্গীমায় বিভিন্ন বৈশিষ্টপূর্ণ শিরোভূষণ দৃষ্ট হয়। মস্তকের পেছনে পাখা জাতীয় শিরোভূষণ পরার রেওয়াজ ছিলো সে সময়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সরাসরি মাথার উপর পরিধান করতে দেখা যায়। উপজাতীয় রমণীদের ব্যবহৃত ভারী এবং বৃহৎ শিরোভূষণের নমুনা সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া গেছে। মোহেনজোদড়োতে মাতৃদেবীর মস্তকে যে শিরোভূষণ (চিত্র-৬৫খ) দৃষ্ট হয় তা ঝুড়ির চূপড়ির মত। এই প্রকার শিরোভূষণের সম্ভবতঃ কোন ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। কতগুলি মৃৎফলকে রমণীরা আঁটসাঁট টুপি পরিহিত ছিল। এ প্রাচীন রীতি অনুসারে অন্যান্য অঞ্চলের রমণীদেরও শিরোভূষণ পরিধানের রীতি সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। যেমন গুপ্তযুগের অজন্তা চিত্রে রমণীদের মুকুট ও টুপি ব্যবহার করতে দেখা যায়।[২]

বাঙালী রমণীর বেশ ভূষণে সামাজিক তাৎপর্য যেমন লক্ষণীয় তেমন ব্যক্তিস্ব শিল্পরুচি ও শিল্পবোধের কারণে এর মধ্যে সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এই সৌন্দর্যবোধ মানুষের বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মূলতঃ যে কোন সৌন্দর্য চর্চাই ব্যক্তিস্ব প্রতিভা আর তার দক্ষতার নৈপুন্য দ্বারা সৃষ্টি। সুতরাং বাঙালী রমণীর বেশ ভূষণের মধ্যে মানুষের শিল্প সৃষ্টির এক প্রাথমিক উৎসের সন্ধান লাভ করা যায়। কেননা প্রাগৈতিহাসিক

---

১ A.S. Altekar, op.cit., p. 336.

২ S. Sahay. op.cit., p. 86.

কাল থেকে মানুষের এই সৌন্দর্য প্রীতি স্বাভাবিক বা জন্মগত। বেশ ভূষণের নন্দনতত্ত্ব দিকটি শুধু অর্থের শ্রীবৃদ্ধি নয়, বেশ ও বাসের সামাজিক মর্যাদা অধিক অর্থবহ। মানুষের জীবন ও সমাজ পরস্পর পরিপূরক সুতরাং তাদের বসন ভূষণ একটি মানবিক চর্চা হিসেবে গণ্য। সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশে বেশ বাসের কায়দা কানুন সর্ব্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের বাস্তব জীবনের সৃজনশীল অভিব্যক্তির পরিচয় তার বেশ বাস এবং এর নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সৌন্দর্য এ বেশ ভূষণকে শৈল্পিক করে তোলে। এক্ষেত্রে এ সূত্রটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে, " To express some idea aesthetically is an art" যা কিছুতেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাই-ই শিল্প।[১] তাই বাঙালী রমণীর বেশ ভূষণের মাঝে প্রাচীন যুগের উন্নত মানসিকতা, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতি চর্চার প্রতিফলন ঘটেছে একথা অনস্বীকার্য।

বেশ ও ভূষণ পারফরমিং আর্ট (performing art) এর অন্তর্ভুক্ত। এর মাঝে শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করা সম্ভব। এই বেশ ভূষণের সাথে ফ্যাশন, নৃত্য,নাট্য, উৎসব আনন্দ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এতে মানুষের শৈল্পিক রুচি, আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা, কারিগরী কুশলতা ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় লাভ করা যায়। বেশ ভূষণের নান্দনিকতা পোষাকের রকম ফের, নকশা রংয়ের বিভিন্নতা, উজ্জ্বলতা, সূচীকর্মের নিপুনতার উপরই নির্ভর করে। যা ভিন্ন বেশ ভূষণ আকর্ষণীয় হতে পারে না। বেশ ভূষণে দেহ অলঙ্করণ করা শিল্পী মনেরই পরিচায়ক।

বেশ ভূষণে স্টাইলের গুরুত্ব সর্বাধিক। কেননা, যে কোন মানুষ মাত্রেরই তার আচরণে ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে একটি ঢং বা স্টাইল থাকে। এই স্টাইল বলতে আমরা ফ্যাশনও বুঝি। এই ফ্যাশন বা স্টাইলের উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তদ্রূপ স্টাইলে নান্দনিকতাবোধ ও স্বকীয় চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। বেশ ভূষণের স্টাইলের সাথে অনুকরণের প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ববর্তী রীতি বা রেওয়াজকে অনুকরণের মধ্যে দিয়ে একটি নিজস্ব রীতির মৌলিকতা অর্জন করা যায়। নতুন ধাঁচের সৃষ্টি হয়, তাতে সৌন্দর্য বা নান্দনিক গুণ বাড়ে বৈকি কমে না।

---

১ নির্মাল্য নাগ, <u>শিল্প চেতনা</u>, (কলিকাতাঃ ১৯৮৭), পৃ. ১১-১৬।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে অনুকরণের বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। আদান-প্রদান, গ্রহণ বর্জন সমগ্র মানব সভ্যতার একটি স্বাভাবিক রীতি। এভাবে যুগ পরম্পরা মানুষ অনুকরণ, অনুসরণের মাধ্যমে যুগের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। ফলে প্রাচীন বাংলার জন জীবনের নানান কর্ম কান্ড ছাড়াও নারীদের পোষাক, সৌন্দর্য চর্চা, অঙ্গ শোভার বৈশিষ্টগুলি আধুনিক যুগেও প্রচলিত আছে। তবে যা কিছু অতীতের ঐতিহ্য তার সবটাই ভাল বা গ্রহণযোগ্য একথা পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। ঐতিহ্যের চর্চায় মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায় এবং যে বিষয়ই হউক না কেন সৃষ্টির যুগ উপযোগী অগ্রগতি ঘটে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় রমণীর বেশ ভূষণের ঐতিহ্যিক পরিচয় তুলে ধরা যায়। আর্য সভ্যতা বিস্তারের প্রাথমিক যুগে রামায়ণ ও মহা-ভারতের মহা-কাব্যিক বর্ণনা থেকে পুন্ড্রনগরের এবং বঙ্গের মত বাংলার সমৃদ্ধিশালী সমাজের কথা জানা যায়। ৪র্থ শতাব্দী খৃষ্ট পূর্বাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সাহিত্যে গঙ্গা বদ্বীপ এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি উন্নত জাতির কথাও তাদের উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও কৃষ্টির কথার উল্লেখ আছে।[১] ধাতুর তৈরী বাঘের থাবার নকশার ব্যবহার অনুশীলন করে সৌন্দর্য চর্চার চেষ্টা হয়েছে প্রাচীন কালে। বিভিন্ন যুগের ভাস্কর্যে তা লক্ষ্য করা যায়। যা দ্বারা মানুষের চিন্তা ও দৈহিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হত। বাঘের থাবার আকৃতি থেকে পর্যায়ক্রমে নানান নকশার রূপান্তর ঘটেছে। এই নকশার চিহ্ন হিসেবে আমরা কোলকা নকশা গহনায়, কাপড় চোপড়ের ডিজাইনে, অন্য কিছু সংস্কার বস্তুতে দেখতে পাই। মহাস্থানগড়ে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের শুভ্রমায়ার (Subramaya) দেহাকৃতিতে বাঘের থাবার নকশার অলঙ্কারের অনুরূপ নকশা দেখা যায়।[২]

প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য মূর্তি, পোড়ামাটির ফলকে চিত্রিত মূর্তিগুলি সৌন্দর্যের নিদর্শন। ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিতে রমণীর পোষাক ও অলঙ্কার উচ্চ সম্ভ্রান্ত এবং

---

১ R.C. Majumdar, op.cit., p. 7-9.

২ Zulekha Haque, Gahana, Jewellery of Bangladesh, (Bangladesh small and Cottage Industries, Co., 1984), p. 25-26.

মর্যাদা সম্পন্ন রমণীদের বলে বিবেচিত হয়েছে। গোলাকার কুন্ডল, অনন্ত, কোমরবন্ধনী, বালা, হার, আংটি, কটিবন্ধনী এবং মল তাদের অঙ্গে শোভিত থাকত। এ থেকে পোষাকের চেয়ে গহনায় তাদের আগ্রহ বেশী ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। দেবদেবীর আকৃতিতে অথবা নারী মুর্তিগুলিকে বিচিত্র নকশা এবং সুচারুভাবে বিন্যাসিত অলঙ্কার বাহুল্যে ভারগ্রস্থ দেখা যেত। রমণীদের শিরোবিন্যাস দেহ সজ্জার একটি বিশেষ দিক ছিল। চুলের অলঙ্করণের জন্য রাজমুকুট এবং টায়রার ব্যবহার তাদেরকে রুপবতী এবং আকর্ষণীয় করত। বিভিন্ন আকৃতির ফুলের নকশায় রুপা অথবা ধাতব গহনা কেশে সংযুক্ত করত তারা। নানা ভঙ্গিতে খোঁপা, বেনুনী রমণীদের মোহিত করেছে সর্বকালেই, যা কবিদের বর্ণনায় প্রতিভাসিত হয়েছে। মণিমুক্তা খচিত কুন্ডল, কানদুল, মাকড়ির ব্যবহার রমণীদের শোভা বৃদ্ধি করত। বর্তমান যুগের রমণীর কানের মাকড়ি আদিকালেরই ঐতিহ্যের নিদর্শন। তদ্রুপ সেকালের গলায় ব্যবহৃত হার এ যুগের রমণীদের সাজসজ্জার এক অনুপম গহনা স্বরুপ। মুক্তা বসানো পুষ্প হার, সীতা হার, গ্রীবাদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত বুকের উপর ব্যাপ্ত হয়ে প্রাচীন বাঙ্গালী রমণীদের করত অপূর্ব ও অতুলনীয়। গ্রীবাপত্র অন্য আরও এক প্রকার মালা যা রমণীরা গলার সাথে সংযুক্ত করে কলারের বা গলবন্ধের মত ব্যবহার করত। প্রাচীন মৃৎফলক ও মুর্তি দৃশ্যে এই গলবন্ধনীর ন্যায় গহনা প্রায়শঃই দেখা গেছে। রমণীদের বাহুমূলে ব্যবহৃত অনন্ত ছাড়া তাগা একটি ফিতার সাথে সংযুক্ত করে এক ইঞ্চি সমান গুরু ছোট স্বর্ণের খন্ড সম্ভবতঃ অনন্তের উপর বাহুমূলে বেঁধে পরা হত। অতি প্রাচীন অলঙ্কার কেয়ূর নারীরা পরত বাহুর উপরিভাগে, মধ্য যুগেও এ গহনার প্রচলন ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে কেয়ূরের চল বা ফ্যাশন উঠে যায়। অপর একটি গহনা মাদুলী ফুলের কিংবা অন্য নকশায় সুন্দর রুপে রমণীরা অঙ্গে ব্যবহার করত। এটা তারা পবিত্র শক্তি বলে মনে করত, যা ব্যবহার করলে অশরীরি আত্মা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত বাঙ্গালী রমণীরা বিচিত্র অলঙ্কার, পুরুবালা, নকশী চুড়ি, কঙ্কন ব্যবহার করে ফ্যাশন রক্ষা করেছে। প্রাচীন রমণীদের অতি প্রিয় অলঙ্কার ছিল কোমরবন্ধনী বা মেখলা এবং কিঙ্কিনী। পোড়ামাটি

ফলক সাক্ষ্যে রমণী দেহে এর ব্যবহারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নবসনকে কোমরে আঁটকাবার জন্য কটিবন্ধের ব্যবহার অতি প্রারম্ভিক সভ্যতারই বসন ভূষণের নিদর্শন।

উপমহাদেশের প্রাচীন নিদর্শনাদি থেকে বাঙালী রমণীদের অলঙ্কার ব্যবহারের চিরন্তন রীতি ও অলঙ্কার প্রিয়তা সম্বন্ধে আলোকপাত করা যায়। কিন্তু বাংলার আর্দ্র জলবায়ু, বহু নদী প্রবাহ, প্লাবন, জল বিভাজিকার গতি পথের পরিবর্তন, ভূমির ভাঙ্গন প্রভৃতির কারণে প্রাচীন নিদর্শন সমূহের ব্যাপক সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। অতীতের যা কিছু প্রাপ্ত সাক্ষ্য, সাহিত্যিক উৎস থেকে এদেশের উন্নত সমাজ ও সমৃদ্ধি, দক্ষ কলা নৈপুণ কারিগরী ব্যবস্থার সুচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়। মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে রমণীদের অলঙ্কার, পোষাক, প্রসাধন সাংস্কৃতিক ধারায় বিশেষত্ব দান করে। সামাজিক রীতিনীতির নন্দনতাত্ত্বিক দিকটি প্রস্ফুটিত হয়।

বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের নন্দনতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ, "বাঙালী মেয়েরা যে শাড়ী পরে তা সনাতন কাল হতে একভাবে চলে আসছে। একখানি বস্ত্রে শরীরের সকল দিক এরূপ সুন্দরভাবে আচ্ছাদন করা অতি চারুশিল্পের পরিচায়ক। এর সারল্যের মধ্যে শিল্প জ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে। বাঙালীর শাড়ীর সুকুঞ্চিত, কুসুম স্তবকাকৃতি কোঁচা এবং শাড়ীর সর্ব শরীর ব্যাপী অনুপম পরিধান ভঙ্গীতে একটি মনোরম সুবাতন্ত্র্য"। তিনি আরও বলেছেন, "বাঙালার প্রত্যেক নারীর কাপড় পরিবার ভঙ্গিতে একটি মৌলিক কলা শিল্পের পরিচয় দিয়া থাকে, সেইভাবে ধুতি বা শাড়ী পরা বিদেশীরা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। অথচ প্যান্ট বা ট্রাউজার কতকটা বালিসের খোলের মত, দরজীই সমস্ত কাজ করিয়া দেয়, যিনি পরিবেন তিনি পা দুটি ঢুকাইয়া দিলেই তাহার কাজ শেষ হয়। বাঙালী রমণীর শাড়ী পরার যে কত মনোজ্ঞ ভঙ্গি তা প্রদত্ত প্রাচীন-কালের প্রত্নসাক্ষ্যের চিত্রগুলিতে বুঝা যাইতে পারে"। এদেশের আবহাওয়ার গুণে এদেশী পরিধানই অধিকতর উপযোগী। কেশবিন্যাসে যে কত কৌশল এদেশের মেয়েরা জানিতেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এ বিষয়ে চীন, তিব্বত, নেপাল ও ব্রহ্মদেশের মেয়েরা

সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহাদের অনুকরণে ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, আসাম, মণিপুর প্রভৃতি দেশের মেয়েরা এই বিদ্যায় বিশেষ পটুত্ব লাভ করিয়াছিলেন"।[১] তদ্রূপ মানুষের মনের সৌন্দর্য্যের প্রক্রিয়া থেকে দেহে অলঙ্কার বা গহনা ব্যবহারের সূচনা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে ভিন্নতর রুচি ও ধাঁচ এবং নকশার বিশদ বিস্তৃতি। মূল্যবান পাথর খচিত নকশা বহুল হাতে তৈরী নিখুঁত গহনা সভ্যতার আদি যুগ থেকে বাংলার রমণীদের সুন্দরী, স্নিগ্ধ, রমণীয় করে তুলেছিল। নারীত্বের সৌন্দর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোন যুগেই এমন কোন রমণী পাওয়া যাবে না যে সে অলঙ্কার প্রিয় ছিল না। মানুষের স্বভাব জাত ধর্ম হল সুন্দরকে ভালবাসা। সুপ্রাচীন কাল থেকে সৌন্দর্য সৌকর্যকে মানুষ গভীরভাবে বা তাৎপর্য্যের সাথে দেখেছে। এ কারণেই ব্যক্তিক প্রয়োজনের তাড়নায় সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে রংয়ের ব্যবহার তথা প্রকৃতি থেকে রং নিয়ে মানুষ নিজ দেহকে অলঙ্কৃত বা শোভিত করেছে এবং নিজের নান্দনিক দিকটি তুলে ধরেছে। মূলত মানুষকে যেমন সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হয়েছে জীবনের প্রথম থেকে, তেমনি প্রতিটি কর্মে নান্দনিকতা ও সৌন্দর্যবোধের বিষয়টি মানব চরিত্রের অতি স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক। বেশ ও ভূষণের মাধ্যমে মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য তার অন্তরের সৌন্দর্য্যেরই অভিব্যক্তি। আর সৌন্দর্য্যের যে কোন প্রকার অভিব্যক্তিই শিল্প হিসেবে গণ্য হতে পারে।[২] কাজেই রমণীর সুসজ্জিত করণের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এবং অস্তিত্বের গভীরতম চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

---

১ শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩।

২ লিও টলস্টয়। শিল্পের স্বরূপ, অনুঃ দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১), পৃ. ৩৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

মানব ইতিহাসের আদিপর্বে মানুষ যখন পশুত্বের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, অসংস্কৃত জীবনধারার গন্ডি পেরিয়ে যখন শ্লীলতার সীমানেও পৌঁছাতে পারেনি, তখনো দেখা গেছে সেই আদিম মানুষের মনে সৌন্দর্য পিপাসার প্রতিক্রিয়া। দেখেছি গুহাগাত্রে তারা চিত্র-কর্মের প্রয়াস পেয়েছে। শিল্পকলার পর্যায়ে হয়তো তা উন্নীত হয়নি কিন্তু তার মধ্যে অবচেতন মনের সুপ্ত সৌন্দর্য পিপাসার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। দেখা গেছে নিজেকে সুন্দর করে তোলার পেছনে তাদের কি আন্তরিক প্রচেষ্টা। বিভিন্ন বর্ণাঢ্য লতা বেঁধেছে বাহুমূলে, কটিদেশ সাজিয়েছে পশুচর্ম অথবা বিবিধ পত্র সম্ভারে। পাখীর বিচিত্র রঙিণ পালক সংগ্রহ করে মুকুট পরেছে। শুধু তাই নয় সর্বাঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের প্রলেপ আর উল্কি এঁকে নিজেকে সুন্দর করে তুলতে চেয়েছে। জলের দর্পনে নিজেকে দেখেছে আর আশ্চর্য হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে। নিজেকে সুন্দর করে তোলার এই আকাঙ্খা শুধু আদিমকালে নয় আধুনিক কালেও আছে। এমন সূক্ষ্ম শিল্প বিচার বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে অনেক সুন্দর এবং শোভন করে তুলেছে।[১]

বেশ ভূষণ তথা পোষাক-পরিচ্ছদ, কেশবিন্যাস, অলঙ্কারের বৈশিষ্ট নির্ভর করে প্রথমতঃ দেশের জলবায়ু, সে দেশের শিল্প উপাদান ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতার উপর। দ্বিতীয়ত মনস্তাত্বিক ও সামাজিক কারণে, তৃতীয়ত অর্থনৈতিক উপাদান যা পোষাক ও পরিচ্ছদ উন্নয়নের জন্য কম নগন্য নয়। চতুর্থত বৈদেশিক প্রভাব যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ ও ভূষণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর কারণে হালকা বা মোটা কাপড়ের বসন এবং পোষাকের ডিজাইন, গঠন বৈশিষ্ট নির্ভর করে থাকে। তদ্রুপ অলঙ্কারের ব্যবহারও জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতার উপর নির্ভরশীল। যে দেশে স্বর্ণ পর্যাপ্ত পরিমাণ

---

১ রণজিত মিত্র, অর্ঘ রচনার রূপ রীতি ও প্রয়োগ, (কলিকাতাঃ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭৯ বাং), পৃ. ১-৫।

পাওয়া যায় স্বভাবতই সে সব দেশের অধিবাসী স্বর্ণ অলঙ্কার পরিধান করে। যেখানে রৌপ্য, রত্ন, মণি প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায় সেখানের লোক অলঙ্কারে রুপা ও রত্ন মণির ব্যবহার করেছে বেশী। আবার যে দেশে তুলোর উৎপাদন বেশী সেখানকার মানুষ সুতোর কাপড় পরিধান করেছে। দেখা যায় রেশম ও উলের পর্যাপ্ততা যেখানে, সেখানে রেশম ও উলের কাপড় পরিধানের রেওয়াজ বেশী প্রচলিত ছিল। মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক দিকটি হচ্ছে মানুষের আদর্শ ও সৌন্দর্য চেতনার বিষয়। যা রুচি বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বেশ ভূষণের ভালমন্দ, সৌন্দর্য অবশ্যই মানুষের রুচি ও সঙ্গতির উপর ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে থাকে। সামাজিক বৈসম্যের কারণে সমাজে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীর পোষাকে বিভিন্নতা দেখা যায়। পোষাকের স্টাইলে স্বাতন্ত্রতা প্রকাশ পায়। নারীর অলঙ্কার প্রীতিও পুরুষের নিকট নিজকে আকর্ষণীয় করে প্রদর্শনের জন্য গহনার এবং মূল্যবান মণি-মুক্তখচিত অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি নারী সমাজে বহুল প্রচলিত হয়েছে। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক কারণে বেশ ভূষণের তারতম্য ঘটে থাকে বলা যায়। আর্থ-সামাজিক কারণে বিবাহিতা, অবিবাহিতা রমণী, বিধবা, ধনী, দরিদ্র, রমণীর বেশ ভূষণে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে থাকে। সামাজিক আচার, বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে শুভ, অশুভ গুণাগুন বিচার করে, পাথর, আংটি বলয়, মাদুলী, তাগা, কটিবন্ধনী পরিধানের প্রচলন হয়েছিল একদিন। সর্বোপরি দৈহিক সৌন্দর্য্য বিকাশের জন্য বেশ ভূষণের সমাদর হয়েছে আদিকাল থেকেই। বলতে হয় প্রথমে মস্তকাবরণের কথা মস্তককে আবৃত করে বিভিন্ন কৌশলে অলঙ্কৃত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল আদিকাল হতেই। পরবর্তীতে কর্ণে, গলায়, কটিতে হরেকরকম অলঙ্কার পরিধানের রীতি সৌন্দর্য চেতনা থেকেই মানুষের মনে জাগরিত হয়েছিল। উল্লেখিত কারণ ছাড়া বলতে হয় পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার মানুষের সংস্কৃতির একটি স্বীকৃত উপাদান।[১]

প্রাচীনকাল থেকে বাঙালী নারীরা নিজ রূপ রচনায় নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসামান্য পরিচয় দিয়েছে। এ দেশীয় সংস্কৃতিতে সুন্দরী সুসজ্জিতা রমণীরা আদর, ভালবাসা ও

---

১ S. Sahay, op.cit., pp. XIX-XX.

মর্যাদা পেয়েছে চিরকালই। তাই বাঙালী ও ভারত রমণীদের সাজসজ্জা করার আকাঙ্খাও চিরনুন। প্রটো-প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই নারীর সাজসজ্জার জন্য অলঙ্কার, প্রসাধনীর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে হরপ্পা, মোহেনজোদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে। সেই প্রসুর যুগের পর থেকেই বাঙালী রমণীদের খন্ডিত বস্ত্র পরিধানের প্রচলনের কথা জানা যায়। এই সেলাই-বিহীন একটি বস্ত্রকেই শাড়ী বলা হয়ে থাকে। এ থেকে বয়ন শিল্পের উৎপত্তির সাথে নারীর বসনের একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সেলাই করা কাপড় পরার রেওয়াজ আদিমকালে ছিল না"।[১] বৈদিক যুগ থেকেই এই উপমহাদেশের সর্বত্রই সেলাইবিহীন কাপড় পরার রীতি ছিল প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী। তখন সেলাই করার ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না। যদিও আর্যরা এদেশে আগমনের পর সেলাই করার চল শুরু হয়। সুতরাং রমণীর পরিধেয় বস্ত্র ছিল শাড়ী যা দু'টুকরো কাপড়। প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদে কার্পাস চাষের ও তাঁতি বৃত্তিজীবীর সন্ধান পাওয়া যায়। চর্যাপদে মেয়েদের ফুলের ও ধাতুর নানা রকম অলঙ্কার ব্যবহারের কথা জানা যায় যে, শবর বধূরা গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা, কর্ণে কুন্ডল পরত। এ থেকে আদি রমণীদের সাজসজ্জার কিছুটা তথ্য আমরা পেয়েছি। ডঃ শাহানারা হোসেনের গবেষণা গ্রন্থে রমণীদের বেশ ভূষণের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়। তিনি লিখেছেন, "The females of the higher classes usually wore the sāri in the Vikaccha fashion. But Kaccha mode of wearing also seems to have been used .... Sometimes they wore the sāri in the modern Bengali way with one end going diagonally from the right waist to the left shoulder and then fallingon the back".[2] আবার রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙালী রমণীর পোষাক

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৮।

২ S. Hussain, E.L.P.E., pp. 182-183.

সম্পর্কে বলেন, "তখন মেয়েরা আংটি, দুল, হার এসবের সঙ্গে পায়ের গোছা পর্যন্ত শাড়ী পরেছে। উপরের অংশে মেয়েরা কখনো ওড়না ব্যবহার করেছে। কদাচিৎ চৌলি বা সুনপট্ট এবং বডিসের ন্যায় জামা ব্যবহার করেছে"।[১] প্রাচীন প্রত্নস্থান মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতী ও চন্দ্রকেতুগড়ে আমরা পর্যাপ্ত প্রত্নসাক্ষ্য পেয়েছি যা থেকে বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের তথ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হই। এ সমস্ত এলাকায় খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতকের বাঙালী সমাজের চিত্র তথা বেশ ভূষণের পরিচয় পাওয়া যায়। আদিমতম পর্যায় থেকে মানুষ বস্তুজাত অভিজ্ঞতা, অনুভব, আবেগ, সুখ, দুঃখ সংগ্রামের কথা এই শিল্প মাধ্যমের সাহায্যে প্রকাশ করেছে। শিল্পকলার অপর একটি মাধ্যম পোড়ামাটির ফলকেও যুগের জীবন বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। তেমনি একটি যুগের ভাস্কর্য কলা দেখলে মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করতে পারি সেই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারা কোন সুরে ছিল। দেখা যায় বাংলার পাহাড়পুর ও ময়নামতীতে ফলকগুলির খোদিত চিত্রে সাধারণতঃ সেকালের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী ও কথার রূপ চিত্রিত হয়েছে। নৃত্যের চিত্রগুলিতে রমণীদের নানা লোকায়ত রূপ ফুটে উঠেছে সমসাময়িক প্রস্তর ফলকে। যারা নৃত্যপরা দেবী, অপ্সরা, গন্ধর্ব নারী মন্দির নর্তকীর রূপায়ণ এসব ভঙ্গিমায়।

মৌর্য আমলের আগে থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় শিল্প নিদর্শনাদির সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, কিন্তু বাংলায় খ্রীস্টীয় ২য়, ৩য় শতকে অর্থাৎ গুপ্তপর্বের কিছু পূর্বে কিছু কিছু শিল্পকলার তথা পোড়ামাটির বা পাথরের টুকরোতে উৎকীর্ণ চিত্রের সন্ধান আমরা পেয়ে থাকি। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় ২য় ৩য় শতক পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে পোড়ামাটির এক ধরণের শিল্পশৈলী প্রচলিত ছিল। পাটলীপুত্র থেকে আরম্ভ করে মথুরা পর্যন্ত এগুলিতে চিত্রিত হয়েছে অধিকাংশই যৌবন সমৃদ্ধ নরনারী। দেখা যায় এই নারী মূর্তি কেশবিন্যাসে এবং মস্তকাভরণে সমসাময়িক রীতি বৈশিষ্ট সম্পন্ন। কিন্তু বাংলায় তামলুক, মহাস্থানগড়, ময়নামতী, পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক চিত্রের নারী

---

১ শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

মূর্তির পরিহিত অলঙ্কার, বেশ বিন্যাসের নানান ভঙ্গি, আকার, সমসাময়িক রুচি মোতাবেক। এখানে নারীর বসন কখনো কখনো স্থূল হলেও তা রুচি ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। মূর্তিগুলি উত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিশেষ একটি সুরের প্রতীক।[১] শক্-কুষাণ শিল্পশৈলীর কালগত স্বাভাবিক পরিণতি গুপ্তপর্বের তক্ষণশৈলীতে। এর প্রধান কেন্দ্র সারনাথ, কিছু মথুরায় দেখতে পাওয়া যায়। গুপ্তশৈলীর কিছু নিদর্শন আমরা পেয়েছি বাংলার উত্তরবঙ্গে বা প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন হতে। পরবর্তী পাল আমলের নবতর রীতি ও রুপাদর্শের সূচনাও বাংলায় দেখা যায়, যার ঐতিহ্য এখানকার প্রত্নস্থানগুলিতে প্রাপ্ত শিল্প সাক্ষ্য সমূহ। বাংলার নানা জায়গায় প্রাপ্ত সপ্তম অষ্টম শতকীয় মূর্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মূর্তিগুলি সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়, কিছুটা শাস্ত্রীয় নির্দেশে কিন্তু অর্চনার জন্য নয়। প্রাচীর বা ভিত্তিগাত্র অলঙ্করণের জন্য মূলত চিত্রগুলি রচনা হয়েছিল। পাল আমলের খ্রীস্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারত ও বাংলার পাল ও সেন আমলের সংস্কৃতির একটি ধ্রুপদী পর্বের প্রতিফলন এখানকার তক্ষণশিল্পের মাঝেই চিত্রায়িত। কুষাণ আমলে বাংলায় বিভিন্ন প্রকার মস্তকাবরণের তথ্য পাওয়া গেছে। এক প্রকার পাগড়ী, শঙ্কুকার অতিরেকপযুক্ত মস্তকাবরণ যা মস্তককে মোহিত করত। এছাড়া পাখা আকৃতির মস্তকাবরণ সে আমলের রমণীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ব্যাপক বিস্তৃত না হলেও গুপ্ত আমলের মৃৎফলক হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ এ ধরণের কেশবিন্যাস দৃষ্ট হয়। এগুলি সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীদের মস্তকেই দেখা যায়। এছাড়া মস্তকের উপরে লম্বা কুঞ্চিত কেশ, ঘাড়ের উপর মনোরম পতিত কেশগুচ্ছ গুপ্তআমলের বিশেষ ধরণের খাঁজের মস্তকাবরণও পরিলক্ষিত হয়। এ ধরণের নমুনা বাংলার মহাস্থানগড়ের একজন রমণীর মস্তকে দেখা গেছে যা রত্নখচিত মুকুটের মত।

অলঙ্কার বা গহনা রমণীকুলের দৈহিক সৌন্দর্য্যের বর্ধক বা পরিপোষক তাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত অলঙ্কার যে সৌন্দর্য বিকাশে সাহায্য করে, তা সকলেই স্বীকার করে থাকবে। রুচি ও সভ্যতার স্তরভেদে মানব জাতির ভিতরে যেমন সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে মতের বিভিন্নতা আছে তেমনিই গহনার আকৃতি ও উপাদান সম্বন্ধেও বিস্তর

---

১ নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৬-৬৪৭।

বিভিন্নতা রয়েছে। তাই বিভিন্ন প্রকার গহনার ব্যবহার রমণীদের মাঝে প্রচলন আছে, তার সংখ্যা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। প্রাচীনকালের রমণীদের বহুবিধ অলঙ্কারের মধ্যে কতিপয় অলঙ্কার যেমন, সিঁথি, বেশর, কুন্ডল, চত্রশবলী, হার, গ্রীবাপত্র, অঙ্গদ, রতনচুড়, শঙ্খ, খাড়ু, উজ্ঝটিকার নাম জানা যায়। সিঁথি হচ্ছে, পাতের সমন্বয়ে তৈরী মস্তকাবরণ, বেশর নাসিকার উপর পরার অলঙ্কার, কুন্ডল হচ্ছে কর্ণাভরণ, চত্রশবলী কানবালা বিশেষ, প্রাচীন সাহিত্যে তিন প্রকার গলার হারের নাম জানা যায়, শতেশ্বী সাতেশরী, একাবলী হার, গ্রীবাপত্র বর্তমানকালের চিক ও হাঁসুলির স্থানে প্রাচীনকালের বঙ্গনারীগণ স্বর্ণ নির্মিত গহনাটি গলদেশে আঁট করে পরিধান করত। অঙ্গদ ব্যতীত উভয় হাতের উপরের দিকে কনুই পর্যন্ত অংশের বহু অলঙ্কারের নাম ছিল কেয়ুর, বাজু, মাদুলি ইত্যাদি। রতনচুড় উভয় হস্তের কব্জির উপর পরিধান করবার এক প্রকার সুন্দর কারুকার্যময় হস্তাভরণ। কঙ্কণ ও বলয় স্বতন্ত্র গহনা হিসেবে গণ্য। চুড়, বলয় ও কঙ্কন পরিধান করবার রীতি রমণীদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রচলিত। শঙ্খ বা শাখের ব্যবহার খুব প্রাচীন। উজ্ঝটিকার অপর নাম 'উপজ্বট', বর্তমান নাম 'পাশুলি' বা চুটকি। এটি পায়ের আঙ্গুলি সমূহে পরিধেয় অলঙ্কার বিশেষ। এক সময় চুটকির ব্যবহার নারী সমাজে খুব সমাদর ছিল।[১]

নানা রূপ মূল্যবান প্রস্তর বা রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তা প্রভৃতি নির্মিত বঙ্গের কারুকার্যময় এইসব প্রাচীন ও মনোরম অলঙ্কারের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকচিত্রে ও দেব মূর্তির গাত্রে এ সমস্ত অলঙ্কারের আমরা কতকটা পরিচয় পেয়ে থাকি। এইসব অলঙ্কার বাংলার প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতিরই আভাস। প্রাচীন সাহিত্যে নানা মূল্যবান তথ্যের মধ্যে সেকালের রমণীর অলঙ্কার সম্বন্ধেও উল্লেখযোগ্য বিবরণ পেয়েছি।

ঋগবেদে দেবতাদের গহনার অনেক বর্ণনা আছে। রুদ্রের বর্ণনায় উজ্জ্বল স্বর্ণাভরণের জ্যোতির্যুক্ত পিঙ্গল দেহকান্তি, সুন্দর সমাহার শোভিতা ইত্যাদি কথা পাওয়া যায়। অসুরদিগের বিষয়েও বর্ণনা আছে যে, তাদের মণিকাঞ্চনের গহনা প্রচুর ছিল। রামায়ণ মহাভারতে

---

১ শ্রী তমোনাশ চন্দ্র দাসগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪-১১১।

কুন্ডল, কবচ, কিরীট, বলয় ইত্যাদির ছড়াছড়ি আছে। তবে এ সকল গহনার উপাদান ও নাম কি ছিল, তাই কেবল জানা যায়, আকৃতি বা আয়তন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অধিকাংশ নাম অনেক কাল পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল ও তাদের আকৃতি ইত্যাদি আমরা প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি ও বিগ্রহে , অজন্তা, ইলোরা, বাগ ইত্যাদি স্থানের প্রাচীর গাত্রে, বাংলার প্রাচীন বিভিন্ন প্রত্নস্থানে প্রাপ্ত ভাস্কর্যে ও মৃৎফলক চিত্রে কিংবা গহনার সাক্ষ্য প্রমাণে দেখতে পাই। এছাড়া সেকালের মেয়েদের বেশভূষার উল্লেখ সম-সাময়িক সাহিত্য থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাজান্তঃপুরে মহিলারা সম্ভবত উত্তরাপথের মেয়েদের মতোই বেশভূষা করতেন। সাধারণ ভদ্রমহিলারা এবং নিম্ন-সমাজের স্ত্রী লোকেরা একবস্ত্র পরে থাকত। কুল নারী মাথায় ঘোমটা দিত। লক্ষ্মীধরের একটি কবিতায় কুল-মহিলার যে বর্ণনা আছে তা এখনো বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানের মধ্যবিত্ত ঘরের আদর্শ। ঘোমটা-ঘেরা মাথা স্বতই লজ্জাবনত, চলন ধীর, চোখ পায়ের দিকে নিবদ্ধ, বাক্য স্বল্প এবং মৃদুমধুর-- এই দিয়ে যেন এই মহিলারা উচ্চ সুরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করছে। অধরে অলক্তরাগ আর কবরীতে পুষ্পগুচ্ছ সেকালের তরুণীর বিলাস-বেশের অঙ্গ ছিল। শাঙ্গধরের একটি শ্লোক থেকে একথা জানা যায় তখনকার মেয়েরা নীচের হাতে পরত শাঁখা, উপরের হাতে 'বাহুখড়', গলায় 'সাতসর' বা 'দেবচ্ছন্দ' হার, মাথায় 'হংসপদিকা', আর কানে সোনার 'তাড়ঙ্গ' অথবা কচি তালপাতার অবতংস 'তালীপত্র'। রাজপরিবার এবং রাজানুগৃহীত ব্যক্তি ছাড়া কেউ কানে সোনার কুন্ডল পরতে পেত না। রাজা খুশি হলে মেয়েদের সুবর্ণ কঙ্কণ পুরস্কার দিতেন। কচি তালপাতার মাকড়ি রাঢ়দেশে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের মেয়েরাও কানে দিত। রমণীরা চোখে দিত কাজল। কপালে চন্দনের পত্রলেখা, তার মাঝে 'কালিআ' অর্থাৎ হলদে রঙের ফোটা। নীচু করে চুল বাঁধলে হত 'খোপাক' অর্থাৎ খোঁপা, আর মাথার উপর উঁচু করে বাঁধলে হত, 'ঘোড়াচুড়' বা ঘোড়াচুলা।

---

১ শ্রী সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩।

একদিকে বিলাসের এই ছবি অন্যদিকে দরিদ্র গৃহিণীর বাস্তব চিত্র। সেকালের বিলাস-বাসনের ছটা কবে বিস্মৃতির অন্তরালে লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের পল্লী নারীদের মধ্যে দারিদ্র্যের সনাতন রূপ এখনও অটুট রয়েছে।[১]

প্রাচীনকালে দেহকে সৌন্দর্যমন্ডিত করবার জন্য পত্র, পুষ্পের ন্যায় অল্প ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যগুলি ব্যবহার করে যে সাজসজ্জা করা হত, তা ভূষণ বা অলঙ্কার নয়। যে বস্তুকে বারংবার দীর্ঘকাল ধরে অঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে তাকে অলঙ্কার বলা হয়। কোন দ্রব্য ভাল লাগলে তা সংগ্রহ করে সম্পত্তি হিসেবে রাখবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত, তদুপরি দ্রব্যটি ব্যবহারে ভালমন্দ ফলাফল বিচার করে দ্রব্যটি সংগ্রহ করে বা ধারণ করা স্বাভাবিক রীতি। আদিম মানব প্রথম এমন চিন্তাধারা থেকে অঙ্গে পরেছিল নানান জিনিস। তবে আদিম কাল থেকে এবং সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে নারী পুরুষের মধ্যে অলঙ্কার ব্যবহারের প্রবণতা দেখা গেছে। কিন্তু সেই সময়ের গহনায় কারুকৌশলের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। একথা বলা যায়, কারুশিল্প দক্ষতা অবশ্য প্রস্তর যুগ থেকে মানুষ অর্জন করেছিল। সাধারণ পদার্থকে শিল্প কৌশলের দ্বারা অসাধারণ রূপ দিবার প্রয়াস তখনো করা হত। প্রস্তর যুগের পর তাম্র বা কংস্য যুগে অলঙ্কার শিল্পের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এ যুগে শিল্পীরা ধাতু খন্ডকে, বিশেষ আকৃতি দান করে বা পাতের উপর চিত্রাঙ্কন ফুটিয়ে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেয়। এই যুগেই প্রস্তর কর্তন, ধাতুর উপর প্রস্তর সংযোজন, ইত্যাদির কৌশল উদ্ভাবিত হয়। কাঁচ বা মিনার কাজ প্রভৃতি পদ্ধতির আবিস্কারের ফলে অলঙ্কারের রূপ আকার ও বর্ণের বৈচিত্র্য ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২] শ্রী কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, দেহের শোভাবৃদ্ধির কৃত্রিম উপায় বসন ও ভূষণ। ভূষণের মধ্যে গহনা সর্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এটি প্রামাণিত সত্য যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ ভূষণ হিসেবে

---

১ শ্রী সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

২ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১।

গহনার ব্যবহার করে আসছে "।[১] অতি প্রাচীন লুপ্ত ঐতিহাসিক যুগের মোহেনজোদড়োতে যেসব গহনা পত্র পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায় যে, স্বর্ণকার ও মণিকারের কারুকৌশল তখনই এদেশে বেশ অগ্রসর হয়েছিল। অলঙ্কার বা গহনা সভ্যতার আদি থেকে যুগ যুগান্তর ব্যাপী মানুষের জীবনে বিশেষতঃ রমণীদের সাজ-পোষাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে প্রাচীন যুগের বাঙ্গালী রমণীর বেশ ভূষার সঙ্গে বিংশ শতকের বাঙ্গালীর বেশ ভূষার কোনও মৌলিক প্রভেদ নাই। কখনো কখনো নতুন নতুন রাজনৈতিক পটভূমিকায় উচ্চস্তরের নারী সমাজ নতুন নতুন পরিধান গ্রহণ করেছে। তবুও যুগে যুগে বাঙ্গালী রমণীর বেশ ও ভূষণের মধ্যে একটি বিশেষ চিরায়ত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালী রমণীর পরিধেয় শাড়ী রয়েছে অবিকৃত। বেশ ভূষণ মানব সংস্কৃতির নির্ঘন্ট। কারণ একজন সভ্য সমাজের সদস্য মাত্রই উত্তম বা সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদের চাহিদা তার মৌলিক অধিকার। বেশ ভূষণের ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। প্রাচীন বাঙালী রমণীর বেশ ও ভূষণের চিত্রগুলিতে ফুটে উঠেছে সমকালীন বাঙালী সংস্কৃতির বিশেষ একটি দিক ও প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা।

---

১ শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'অলঙ্কার', প্রবাসী, ৪র্থ সংখ্যা, ২৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৩৩৪, পৃ. ৫৪৫-৫৪৬।

গ্রন্থপঞ্জী

১। প্রাথমিক উৎস :

(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক (ইংরেজী ও বাংলা)

Ahmed, Nazimuddin. Mahasthangarh. Karachi, 1964.

__________. Mahasthan. A Preliminary Report of the recent Archaeological Excavations of Mahasthangarh , Reprint, Dacca, 1984.

__________. Bangladesh Archaeology, No. 1. Dhaka; 1980.

__________. Discover the Monuments of Bangladesh, Dhaka, 1984.

Alam, A.K.M.S. Mainamati. Dacca, 1975.

__________. Sculptural Art of Bangladesh, Dhaka, 1985.

Allan, J. Catalogue of the Gupta Coins of the Gupta Dynasty and Sasanka, King of Gauda, London. 1914.

Archaeological Survey of India, Annual Reports. Relevant Volumes.

Benerji Rakhal Das. Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya, Sahitya Parishad. Calcutta,1911.

Bhattasali, N.K. Iconography of Buddist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum. Dacca, 1929.

Biswas, S.S. Terracotta Art of Bengal. Delhi, Agam Kala Pakistan, 1981.

Cunninghum, A. The Stupa of Bharhat, London, 1879.

__________.Tour in Bihar and Bengal,A.S.I.R.,Vol.XV,Calcutta,1882, p. 265.

Dani, A.H. Indian Archaeology Today, Bombay, 1962.

DasGupta, C.C. Remarks on a few early Indian Terracotta figurines. Berlin, 1937.

DasGupta, P.C. Excavations at Pandu Rajar Dhibi,.Director of Archaeology, West Bengal, 1964.

Dhavalikar. M.K. Terracotta Art of Ancient India, 1977.

Dikshit, K.N. Excavations at Paharpur. M.A.S.I., No-55, Director General of Archaeology in India, Delhi, 1936-38.

Fabri Charles, L. Discovering Indian Sculpture. New Delhi, 1970.

French. J.C. The Art of the Pala Empire of Bengal. Oxford, 1928.

Ganguly, M.M. Handbook to the Sculptures in the Museum of Bangiya Sahitya Parisat. Calcutta, 1922.

Ganguly, O.C. & Goswami, A. Indian Terracotta Art. Delhi, 1959.

Ghosh, A. ed., Indian Archaeology, A Review, 1958-59. Dept. of Archaeology Govt of India, New Delhi, 1959.

Ghosh, D.P. Archaeological Discoveries in Lower Gangetic Valley. Calcutta, 1957.

Ghosh, S.P. Terracottas of Bengal. Delhi, B.R. Pub.Co., 1986.

Gupta. C.D. Paharpur and Its Monuments. Calcutta, Firma K.L. 1951.

Havell, E.B. Indian Sculpture and Painting. London, 1928.

Heringham, Ajanta. Oxford University Press. London, 1915.

Hussain, S. "The Terracotta Palques from Paharpur", J.A.S.P. Vol. VIII, No. 2, Dacca, 1963.

__________. "Paharpur and its Material Contents", J.A.S.P. Vol. VI, 1961.

__________. "Terracotta Find Spots of Pre-Muslim Bengal", J.A.S.P. Vol. XV, No. 2, 1970.

Kala. S.C. Terracotta Figurines from Kausambi, Allahabad, 1950.

Khan. F.A. Mainamati, Karachi, 1963.

__________. "Mainamati Excavations, - An Interpretation," Pakistan Quaterly, Vol. VII, No. 3, 1955.

Kramrisch, S. Indian Sculpture. Calcutta, 1933.

__________. Pala and Sena Sculptures. Calcutta, Rupam, 1929.

Krishna Murthy, K. Glimpses of Art, Architecture and Buddhist Literature in Ancient India. New Delhi, Abhinav Pub., 1987.

Marshall & Others. Bagh Caves. London, 1927.

Morrison, Barrie M. Lalmai: a Cultural Center of Early Bengal. Seattle, 1974.

Pakistan Archaeology, The Department of Archaeology, Pakistan Relevant Volumes.

Qudir, M.A.A. A Guide to Paharpur. Department of Archaeology Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, 1980.

Rai. G.C. Studies of Indus Valley Terracottas. Varanasi Bhartiya Publishing House, 1973.

Ramachandra, T.N. "Recent Archaeological Discoveries Along the Mainamati and Lalmai Ranges", B.C. Law Vol. II. ed., D.R. Bhandekar. Calcutta, 1946.

Rashid, M. Harunur. Paharpur, Dept. of Archaeology and Museums, Dacca, 1980.

__________. "Bangladesh a Profile in the Light of recent Archaeological Discoveries," Bangladesh Historical Studies, Vol. III, 1978.

Sahai, B. & French, J.C. The Art of the Pala Empire of Bengal. New Delhi, 1983.

Saraswati, S.K. "Early Sculpture of Bengal", Journal of the Department of Letters, Vol. XXX, Calcutta, 1938.

__________. Early Sculpture of Bengal. Calcutta, 1962.

__________. A Survey of Indian Sculpture, Calcutta, 1957.

Sivaramamurti, C. Indian Sculpture. New Delhi, 1961.

__________. Amaravati Sculptures in the Madras Govt. Museum. Madras, 1947.

Van. J.E. Lohuizen-de-Leeuw. An Ancient Buddist Monastery of Paharpur, Reprinted from Antiquity and Survival, Vol. II, The Hague Netherlands, 1957.

বাংলা

আহমেদ, নাজিমুদ্দীন। মহাস্থান, ময়নামতী, পাহাড়পুর। ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশন, ১৯৬৬।

----------। পাহাড়পুর, ঢাকাঃ ১৯৭৫।

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার। বাংলার ভাস্কর্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭।

গোস্বামী, কুঞ্জগোবিন্দ। প্রাগৈতিহাসিক, মোহেনজোদড়ো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬।

ঘোষ, আশুতোষ। মন্দির ভাস্কর্যে দক্ষিণ ভারত। কলিকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯ বং।

যাকারিয়া, আ.কা.মোঃ। বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ। ঢাকাঃ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।

সরস্বতী, সরসীকুমার। পালযুগের চিত্রকলা। কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮।

সাঁতরা, তারাপদ। বাংলার ভাস্কর্য। হাওড়া, ১৯৮৩।

স্যান্যাল, নারায়ণ। অপরূপা অজন্তা। কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮।

হালদার, অসিতকুমার। অজন্তা। কলিকাতাঃ ভট্টাচার্য এন্ড সন্স, ১৩২০ বং।

দাসগুপ্ত, চারুচন্দ্র। পাহাড়পুরের বিবরণ। কলিকাতাঃ ফার্মা কে, এল মুখোপাধ্যায়, ১৯৬১।

খ) সাহিত্য

Ain-i-Akbari, tr. by H.S. Jarret and H. Blochmann. Calcutta, 1873, 91, 94.

Bagchi Probodh Chandra ed., Dohākosa, Part I, Calcutta, 1938.

Beal, Samuel tr. Travels of Hiuen Tsang. Vol. IV. Calcutta, 1881.

Benerji Sures Chandra ed., Saduktikarnamrta, Calcutta, 1965.

Chakravarti Chintaharam ed., Pavandūte of Dhoyī. Sanskrit Sahitya Parishad, Calcutta, 1926.

Cowell E.B. & Thomas F.W. ed., Harsha-Charita of Bānabhatta, London, 1897.

Das. S.C. ed., Pag-Sam-Jon-Zañg of Sumpa Mkhanpo. Calcutta, 1908.

Delal C.D. and Shastry R.A.K. ed., Kāvyamimāmsā of Rajśekhara. G.O.S. No. 1, 1925.

Dutt, Manmatha Nath ed. and tr. Viṣnu Purāna, Calcutta, 1958.

Durgāprasād, Pandit & Others ed., Āryasaptaśatī of Govardhanacarya. Bombay, 1934.

Dvivedi, S.ed., Bṛhat-Saṁhitā of Varāhamihira, Benaras, 1895-97.

Ghosh Chandra Mohana ed., The Prakṛtapaingalam. of Pingala Acharya, Calcutta, 1902.

Jayadeva. Gītagovinda. Sanskrit Text and Hindi Trans by Amritalala Bhattacharya, Bombay, 1984.

Jīmūtavāhana. Dāyabhāga. Trans. by H.T. Colebrooke. Calcutta, 1868.

Kane, P.V.ed., Kadambarī, Bombay, 1921. Ed. K.P. Parab and W.L. Pansikar, Bombay, 1932.

Kate (ed), Dasakumaracarita, Bombay, 1926.

Majumdar, R.C., Basak, R.G, and Benerji, Nanigopal ed., Rāmacharita of Sandhyakāra Nandi., Rajshahi, 1939.

R. Shama Sastri ed. and tr. Arthaśāstra of Kautilya. Mysore, 1909 & 1929.

Raghuvamsa. Nirnya Sāngara Press, ed., Bombay, 1892.

Sharma, Ramavatara ed., Saduktikarnamrta of Sridharadasa. Banarasi Das, Lahore, 1933. Also ed. by S.C. Banerjee, Calcutta, 1965.

Sen P.C. ed., Karatoya Mahatmya. V.R.M. Monograph No. 2. Rajshahi,

Stein Sir Areel. Rajatarangini of Kalhana. London, 1900.

Tarkabhusana, Pandita Pramathanatha ed., Kālaviveka of Jimutavahana. Bibliotheca Indica, Calcutta, 1905.

Thomas, F.W. ed., Kavindravacanasamaccaya. Bibliotheca Indica, Calcutta, 1912.

V.V. Gokhale and D.D. Kasambi ed., Subhasitaratnakosa of Vidyakara. H.O.S., 42, Cambridge, 1957.

Vedantatirtha, Girish Chandra. Prayaścitta Prakaranam of Bhatta Bhavadeva. Rajshahi, 1927.

W.H. Schoff tr., Periplus of the Erythraean Sea. London, 1912.

Watters and Thomas. On Yuan Chwang's Travels in India. Two Vols. London, 1905.

বাংলায় অনূদিত

কালীদাস। রঘুবংশ। কলিকাতাঃ ১৯৮৫।

গোবর্ধন আচার্য। আর্যাসপ্তশতী। বাংলা অনু., শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌরবঙ্গ। কলিকাতাঃ ১৩৭৮ বং।

চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। ভারত নাট্যশাস্ত্র। কলিকাতাঃ নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০।

ঠাকুর প্রবোধেন্দুনাথ অনূদিত। বাণভট্টের হর্ষচরিত, কলিকাতা, ১৩৮৫ বং।

ফজল, আবুল। আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী। সম্পাঃ ও অনু পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়। কলিকাতাঃ বসুমতি কার্যালয়, ১৩০৬ বং।

বসাক, রাধাগোবিন্দ সম্পাঃ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। কলিকাতাঃ কে, বি, প্রিন্টাস, ১৯৫০।

বসু, মণীন্দ্র মোহন সম্পাঃ। চর্যাপদ। কলিকাতা, কমলা বুক ডিপো, ১৯৪৩।

বসু, রাজশেখর অনূদিত, বাল্মীকি রামায়ণ। কলিকাতা এম. সি. সরকার এন্ড প্রাইভেট লিঃ, ১৩৫৩ বং।

বিদ্যাবিনোদন, অযোধ্যানাথ সম্পা, শ্রী সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিত। কলিকাতাঃ দিবাস্মৃতি সমিতি, ১৩৪৪ বং।

মজুমদার, বিজয়চন্দ্র, গীতগোবিন্দ (মূল ও তাহার পদ্য অনুবাদ), ৩য় সং। কলিকাতা, চারুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩৩২ বং।

মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ, সম্পাঃ। বৈষ্ণব পদাবলী। কলিকাতাঃ সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬১।

-----------। কবি জয়দেব ও শ্রী গীতগোবিন্দ। ৪র্থ সং, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩৭২ বং।

সদরুদ্দীন অনূদিত, গীতগোবিন্দ। ঢাকাঃ জয়বাংলা প্রকাশনী, ১৯৮০।

সেন, সুকুমার। চর্যাগীতি পদাবলী। কলিকাতাঃ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৫৬।

দেব শ্রীহর্ষ। নৈষধচরিত। কলিকাতাঃ ১৯১৯।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। সম্পাঃ বৃহদ্ধর্ম পুরাণ। কলিকাতা, ১৮৯৫।

শ্রীমণি, ভরতচন্দ্র। মনুসংহিতা, কলিকাতা, ১৯২৩।

(গ) লিপিমালা

Maitreya, Akshaya Kumar, Gauda-Lekha-Mala (Containing Inscriptions of Pala Kings) Rajshahi, 1319.

EPigraphia Indica, Delhi, Relevant Volumes.

Majumdar, N.G. Inscriptions of Bengal, Vol. III, (Containing Inscriptions of the Chandras, the Varmans and the Senas) Rajshahi, 1929.

R. Mukherji and S.K. Maiti. Corpus of Bengal Inscriptions bearing on History and Civilization of Bengal. Calcutta, Firma, K.L., 1967.

Sircar, D.C. (ed.). Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization, Vol. I, University of Calcutta, 1965.

২। সহায়ক উৎস ঃ (ইংরেজী গ্রন্থাবলী)

Alteker. A.S. The Position of Women in Hindu Civilization. Banaras, 1956.

Bardwood, Jourage, T.M. Industrial Arts of India. London, Daublo, Chapman and Hall Lim, 1972.

Basham, A.L. The Wonder that was India. London, Sidgaick and Jackson, 1954.

Berenson, Bernard. Aesthetic and History, Constuble Publishers, London, 1950.

Bhattacharya, Amitabha. Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal. Calcutta, Sanskeit Pustak Bhandar, 1977.

Bhattacharya, D.C. A Chronology of the Pala Dynasty of Bengal, India, 1920.

Brijabhasan, J. Indian Jewellery, Ornament and Decorative Designs. First ed., Bombay, 1958.

__________. The Costume and Textiles of India. Bombay, 1958.

Chandra Moti. Costume, Textile, Cosmetics and Coiffure in Ancient and Medieval India. Delhi, India Oriental Pub., 1973.

__________. Trade and Trade Routes in Ancient India, New Delhi, 1977.

Chandra. R.P. Studies in the Development of Ornaments and Jewellery in Proto-Historic India. Varanasi, 1964.

Chatterjee S.P. Bengal In Maps, 1949.

Chowadhury. A.M. Dynastic History of Bengal. Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1967.

Dani, A.H. Prehistory and Protohistory of Eastern India, Calcutta, 1960.

Darby, H.C. Approaches to History. London, 1962.

DasGupta, T.C. Aspects of Bengali Society from old Bengali Literature, Calcutta, 1946.

Francis, B. Jewellery of India. (Five Thousand Years of Tradition). Published by the Director, National Book Trast, India, 1972.

Ghose, Jogesachandra, Hindue Women in India. New Delhi, 1984.

Ghurye, G.S. Indian Costume. Bombay, 1957.

________. Bharata Natya and Its Costume. Bombay, 1951.

Haque, Zulekha. Gahana, Jewellery of Bangladesh. Bangladesh small and Cottage Industries, Co., 1984.

Horner, B. Women Under Primitive Buddism. London, 1930.

Hunter, W.W. A Statistical Account of Bengal. 20 Vols.,London, 1875-1877.

Hussain, Shahanara. Everyday Life in the Pala Empire. Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1968.

________. The Social Life of Women in Early Medieval Bengal. Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1985.

K. Bagchi. The Ganges Delta. Calcutta, 1944.

Majumdar, R.C. Ancient India. Delhi, 1944.

________. The History of Bengal, Vol. I. Dhaka University,1943.

________. History of Ancient Bengal. Calcutta, 1971.

Mackay and Earnest. Early Indus-Civilization. New Delhi, 1976.

________. Further Excavations at Mohenjodaro.2 Vols. London,1937.

Marshall, J.H. Mohenjodaro and Indus-Civilization, Vol.II, London, 1931.

Mitra Rajendralal. Indo-Aryans, Vol. I, Calcutta, 1881.

Sahay Sachidanand. Indian Costume, Coiffure and Ornaments. New Delhi, Munshiran Manoharlal Publishers, Pvt.Ltd.1975.

Saletore. R.N. Life in the Gupta Age. Bombay, 1943.

Sankalia, H.D. Prehistory and Protohistory in India and Pakistan. University of Bombay, 1962.

Saraswati, S.K. Architecture of Bengal. Calcutta, 1976.

Sen Benoy Chandra. Some Historical Aspects of Bengal Inscription. University of Calcutta, 1942.

Sen, S.N. Ancient History of Bangladesh, India & Pakistan. Dhaka, Academic Publishers, 1988.

Swarup. S. The Arts and Crafts of India and Pakistan. Bombay, 1957.

Tagore Rabindranath. On Art and Aesthetics. Calcutta, 1961.

Thomas, P. Indian Women Through the Ages. Bombay, Asia Pub. House, 1964.

Wheeler, Sir Mortimer. The Indus Civilization. Cambridge, University Press, 1968.

ইংরেজী প্রবন্ধাবলী

Chakravarty, Taponath. "Women in the Early Inscriptions of Bengal", B.C. Law. Vol., Part.II, 1946.

Chowdhury, A.M. "Geography of Ancient Bengal— An Approach to its Study", Bangladesh Historical Studies, Vol. II, 1977.

Ghosh, D.B. "The Copper Plate Engravings of Ancient Bengal and the Source of South East Asian Art", Bangladesh Lalitkala, No. 1, 1975.

Huntington, Susan. "Some Aspects of Bengal Stone Sculpture", Haque Enamul edi., Bangladesh Lalitkala, Vol.I, Dacca Museum, 1975.

Hussain, S."Dress, Coiffure and Cosmetics of Women of the Pala Bengal", Rahman Mukhlesur ed., J.V.R.M. Vol.V , University of Rajshahi, 1976-77.

Rashid, M. Harunur. "The Chandra Rules of Bangal", Mukhlesur Rahman ed., J.V.R.M., Vol.V, University of Rajshahi, 1976-77.

__________. "The Origin and Early Kingdom of the Chandras of Rohitagiri", Bangladesh Historical Studies, Vol. II, 1977.

Tarafdar, M.R. "Paintings of the Pala Period", J.A.S.B., Vol.XXII, No. 3, 1977.

বাংলা গ্রন্থাবলী

আনিসুজ্জামান (সম্পাঃ)। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আহম্মদ তোফায়েল। আমাদের প্রাচীন শিল্প। ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৪।

ইসলাম, মোস্তফা নুরুল (সম্পাঃ)। আবহমান বাংলা। ঢাকাঃ ১৯৯৩।

গুপ্ত, প্রদ্যোত সেন। বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, (কলিকাতাঃ সাহিত্য শ্রী, ১৯৭৬)।

গোস্বামী, নৃপেন্দ্র। বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি। কলিকাতাঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৫ বং।

ঘোষ, প্রদ্যোত। গৌরবঙ্গের স্থাপত্য, ১ম পর্ব। কলিকাতা, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৭৭।

ঘোষ, বিনয়। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ৩য় খন্ড। কলিকাতাঃ প্রকাশ ভবন, ১৯৮০।

__________। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস, ২য় খন্ড। কলিকাতা পুস্তক পরিষদ, ১৩৬৩ বং।

চক্রবর্তী, উৎপল। বিলুপ্ত রাজধানী। কলিকাতা, অমর ভারতী, ১৯৭৮।

চন্দ্র, রমা প্রসাদ। গৌড় রাজমালা। রাজশাহী, ১৩১৯ বং।

চক্রবর্তী, রজনীকান্ত। গৌড়ের ইতিহাস। কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৭ বং।

চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা। কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার। সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস। কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬।

চৌধুরী, আবদুল মমিন ও অন্যান্য। বাংলাদেশের ইতিহাস, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৭।

চৌধুরী, নীরদচন্দ্র। বাঙালী জীবনে রমণী। কলিকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৭৪ বং।

চৌধুরী, শ্রী ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতাঃ বুক ল্যান্ড প্রাঃলিঃ, ১৯৫৭।

যাকারিয়া, আ, কা, ম,। কুমিল্লা জেলার ইতিহাস। কুমিল্লা, ১৯৮৪।

টলস্টয়, লিও। শিল্পের স্বরূপ। অনুঃ দিজেন্দ্র লাল রায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পরিষদ, ১৯৮১।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ। বাংলার ইতিহাস। সামাজিক বিবর্তন, কলিকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩ বং।

দাসগুপ্ত, তমোনাশ চন্দ্র। প্রাচীন বাঙাঁলা সাহিত্যের কথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮।

নাগ, নির্মাল্য। শিল্প চেতনা। কলিকাতা, ১৯৮৭।

নন্দী, সুধীর কুমার। নন্দন তত্ত্ব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৭৯।

ফারুক, আব্দুল্লা। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস। ঢাকাঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩।

বন্দোপাধ্যায়, অমীয়কুমার। বঙ্কিমকীর ঝাঁপি। কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৩৮৬ বং।

বন্দোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ১ম খন্ড, কলিকাতাঃ মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৭০।

বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস। বাংলাদেশের ইতিহাস। ১ম খন্ড, কলিকাতাঃ নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৭৯।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙাঁলীর দান। কলিকাতাঃ ১৩৬৯ বং।

বসু, মীনেন্দ্রনাথ। বাঙাঁলী পরিচয়। কলিকাতাঃ ১৩৫২ বং।

বসু, নির্মলকুমার। হিন্দু সমাজের গড়ন। কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬।

ভট্টাচার্য, অরুণ। নন্দনতত্ত্বের সুত্র। কলিকাতাঃ উত্তর সুরী প্রকাশনী, ১৯৮১ বং।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র। বাংলাদেশের ইতিহাস। প্রাচীন যুগ, কলিকাতাঃ লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৭৪।

মিত্র, রণজিৎ। অর্থ রচনার রূপ রীতি ও প্রয়োগ। কলিকাতা, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭৯ বং।

মিত্র, সুধীর কুমার। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ। কলিকাতাঃ মিতালী প্রকাশন, ১৯৬২।

মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র। অলঙ্কার। ভারতকোষ, ১ম খন্ড। কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৬।

মুখোপাধ্যায়, সুভাষ। বাঙালীর ইতিহাস। কলিকাতাঃ ১৯৬০। (ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৬০)।

মুর্শিদ, গোলাম। সংকোচের বিহ্বলতা। বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার। গৌড়ের কথা। কলিকাতাঃ সাহিত্য লোক, ১৩৯০ বং।

----------। ভারত শিল্পের কথা। কলিকাতাঃ সাহিত্য লোক, ১৩৮৯ বং।

রায়, নীহাররঞ্জন। বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব। কলিকাতাঃ বুক এমপোরিয়ম লিমিটেড, ১৩৫৬ বং।

----------। বাঙ্গালীর ইতিহাস, ২য় খন্ড। কলিকাতাঃ ১৯৮০।

লাহিড়ী, দুর্গাদাস। বঙ্গের ইতিহাস। কলিকাতাঃ ১৩১০ বং।

শাহেদ, হোসনে আরা। শাড়ি। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা। কলিকাতা, ১৩২৩ বং

সুনীথানন্দ, ভিক্ষু। বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহার ও ভিক্ষু জীবন। ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

সুর, অতুল। বাঙলার সামাজিক ইতিহাস। কলিকাতাঃ জিজ্ঞাসা, ১৩৮৩ বং।

সেন দীনেশচন্দ্র। বৃহৎবঙ্গ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১ বং।

সেন, প্রভাষচন্দ্র। বাংলার ইতিহাস। কলিকাতাঃ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭০।

সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ১ম খন্ড, কলিকাতাঃ ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭০।

----------। বগুড়ার ইতিহাস। কলিকাতাঃ ১৩৭২ বং।

সেন, সুকুমার। বঙ্গ ভূমিকা। কলিকাতা, ১৯৭৪।

স্যান্যাল, শ্রী দুর্গাচরণ। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস। কলিকাতাঃ ১৩১৭ বং।

বাংলা বিশ্বকোষ। দ্বিতীয় খন্ড। নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

বাংলা প্রবন্ধাবলী

চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার। "আর্যাসপ্তশতীতে গৌড় বঙ্গের চিত্র"। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ।

চট্টোপাধ্যায়, কেদার নাথ। "গহনা"। প্রবাসী, ২৭শ ভাগ, ১ম খন্ড, ১৩৩৪ বং।

চৌধুরী, আবদুল মমিন। "পালযুগের একটি নূতন মূর্তিলিপি", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সং, ১৩৮১ বং।

দে গৌরী শংকর। "চন্দ্রকেতুগড়ের মুদ্রা", ইতিহাস অনুসন্ধান-৪। কলিকাতাঃ ১৯৮৯।

বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস। "চন্দ্রকেতুগড়", বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩০ বং।

বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র। "সংস্কৃতি সাহিত্যে বাঙালীর দান"। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩০৫ বং।

বিশ্বাস, সুরেন। "প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারঃ উৎস ও ক্রমবিকাশ", বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ২১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮৩ বং।

মুখোপাধ্যায় বাদলচন্দ্র। "প্রত্নতত্ত্বের আলোকে আদি ঐতিহাসিক পর্বের বঙ্গীয় সভ্যতা", ইতিহাস, ১১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকাঃ ১৩৮৪ বাং।

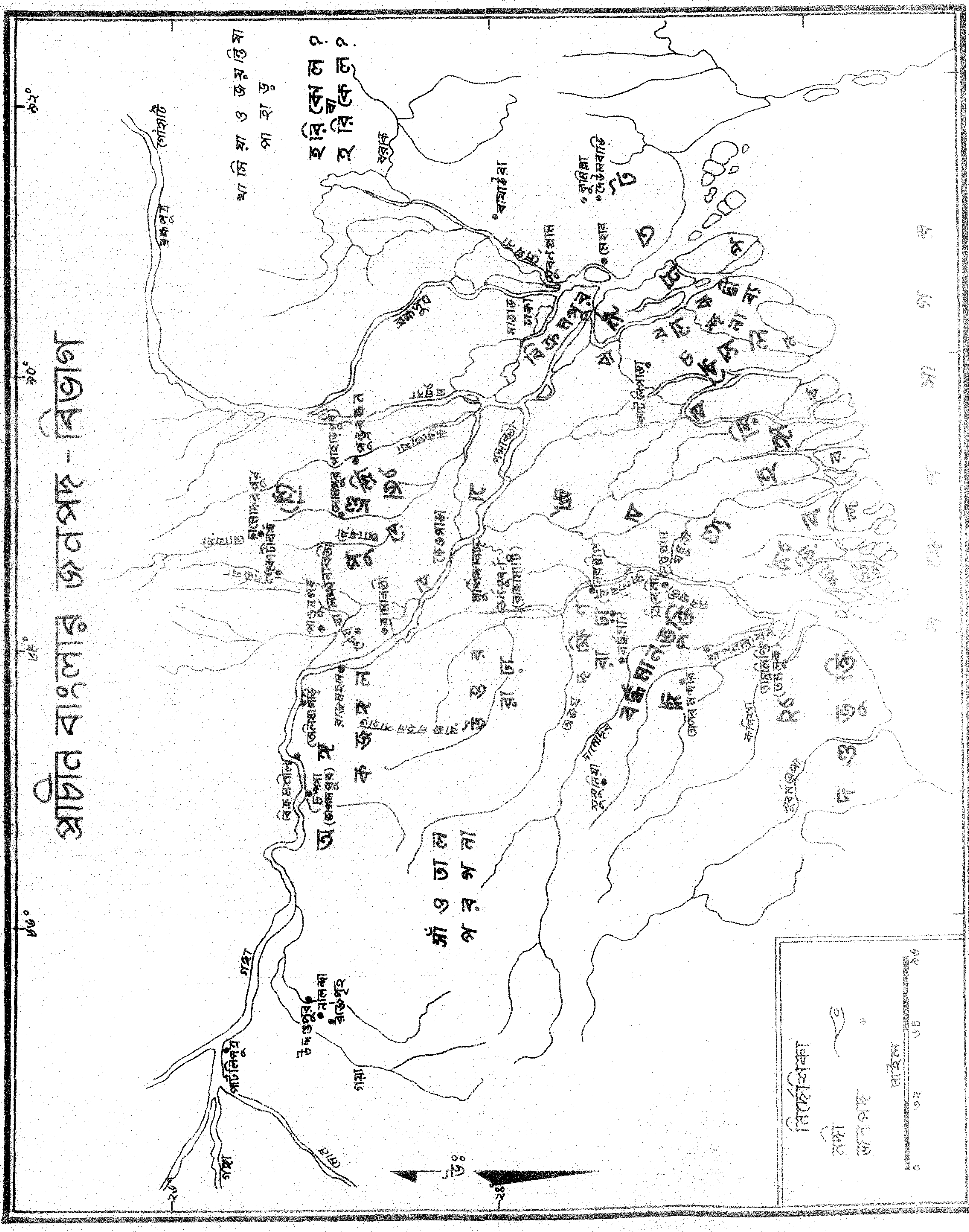
মুখোপাধ্যায় সোমা। "মথুরা শৈলীর স্ত্রমূর্তি", (কুষাণ যুগ)। ইতিহাস অনুসন্ধান-৬, ১৯৯১।

রায়, অমিতা। "ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা"। ইতিহাস অনুসন্ধান-৪, কলিকাতাঃ কে, পি, বাগচী এন্ড কোং, ১৯৮৯।

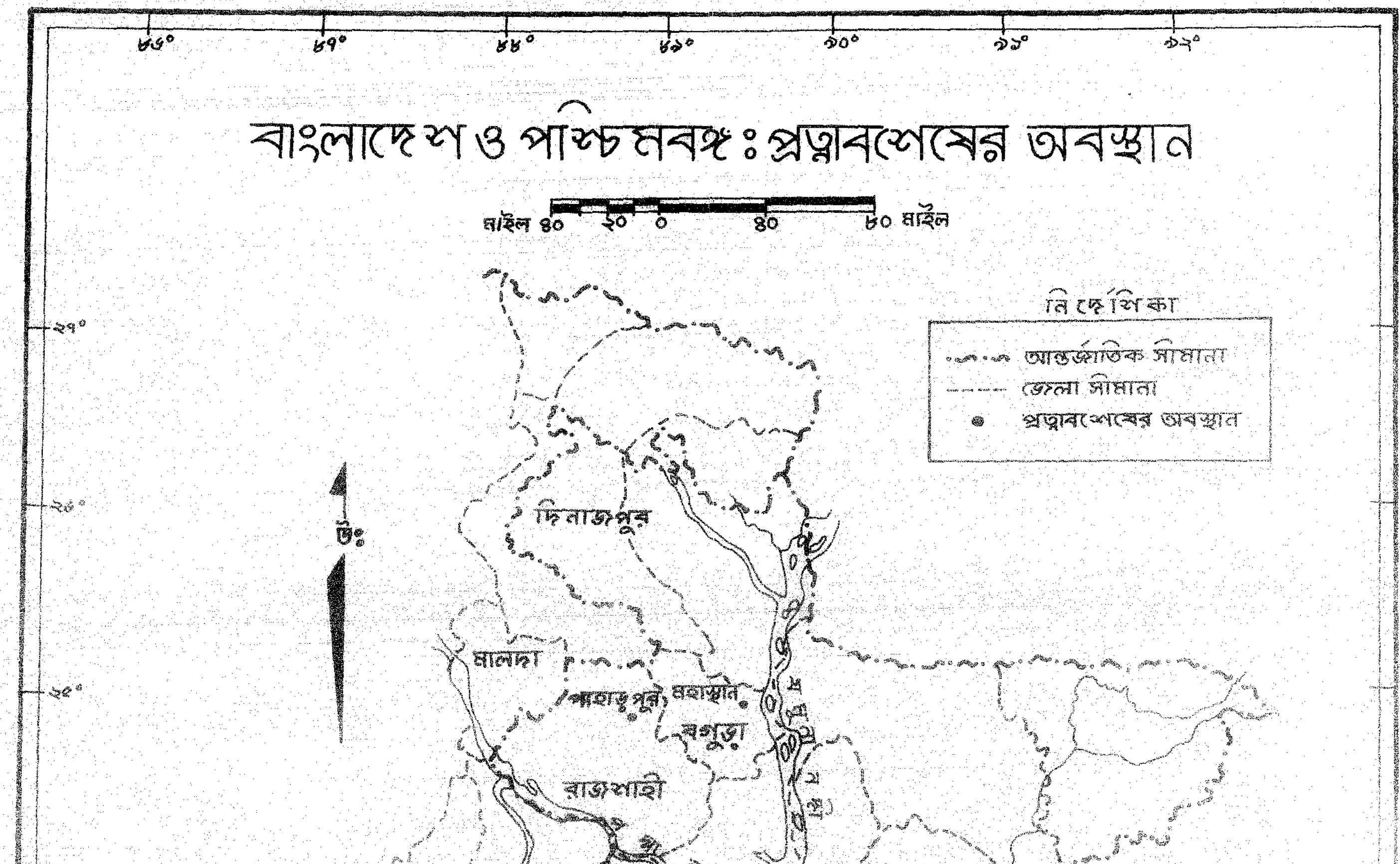
হোসেন, শাহানারা। "সদুক্তিকর্ণামৃতে বাংলার গ্রাম"। ইতিহাস, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা ১৩৮০ বং।

----------। "প্রাচীন বাংলার কবি শরণ"। সাহিত্যিকী, ১৭শ বর্ষ, ১৩৮৭ বং।

মানচিত্র - ক



মানচিত্র - খ



মানচিত্র-২

চিত্র নং- ১



চিত্র নং– ২



ক



খ

চিত্র নং— ৩



ক



খ

চিত্র নং- ৪



ক



খ

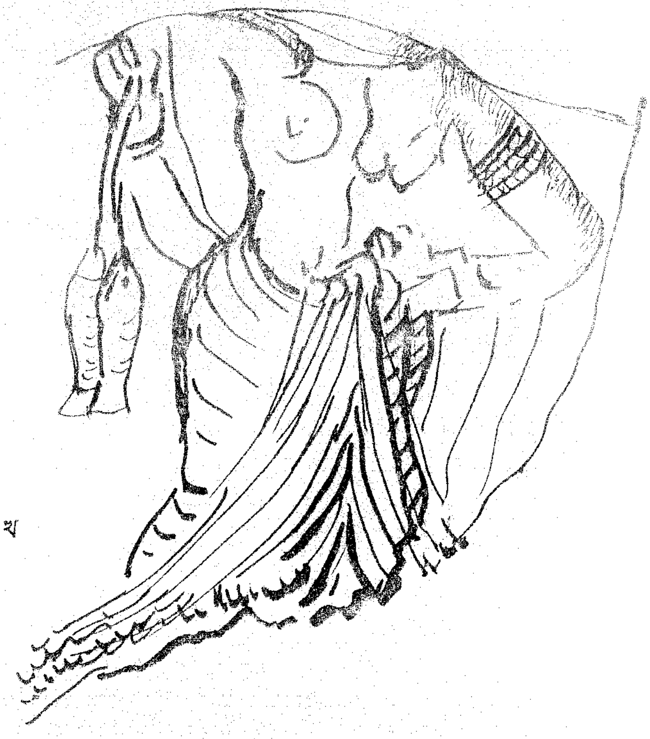


গ

চিত্র নং- ৫



ক



খ



গ

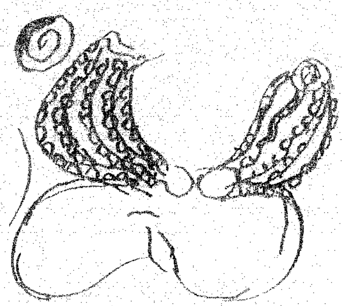
চিত্র নং- ৬



ক



খ



গ



ঘ

চিত্র নং- ৭



ক



খ



গ

চিত্র নং- ৮



ক



খ



গ

চিত্র নং- ১



—ক



খ

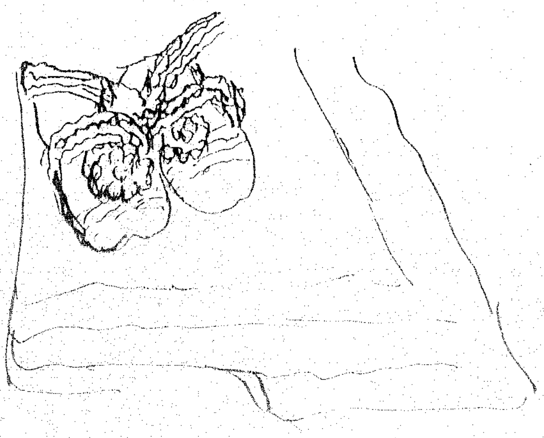


গ

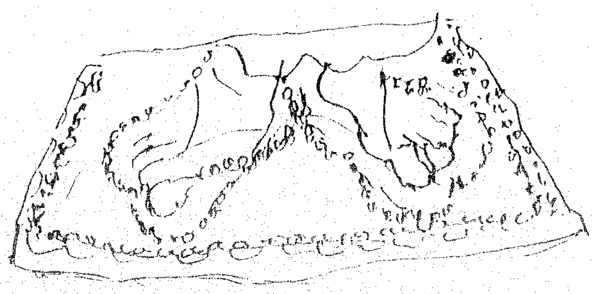


ঘ

চিত্র নং- ১০



ক



খ

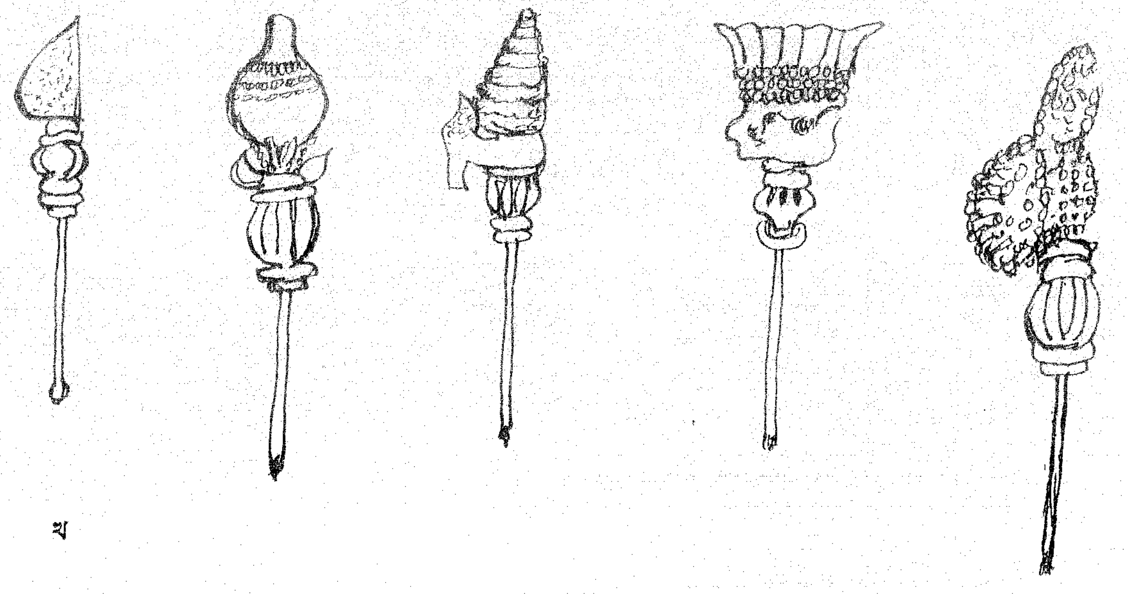


গ

চিত্র নং— ১১



ক

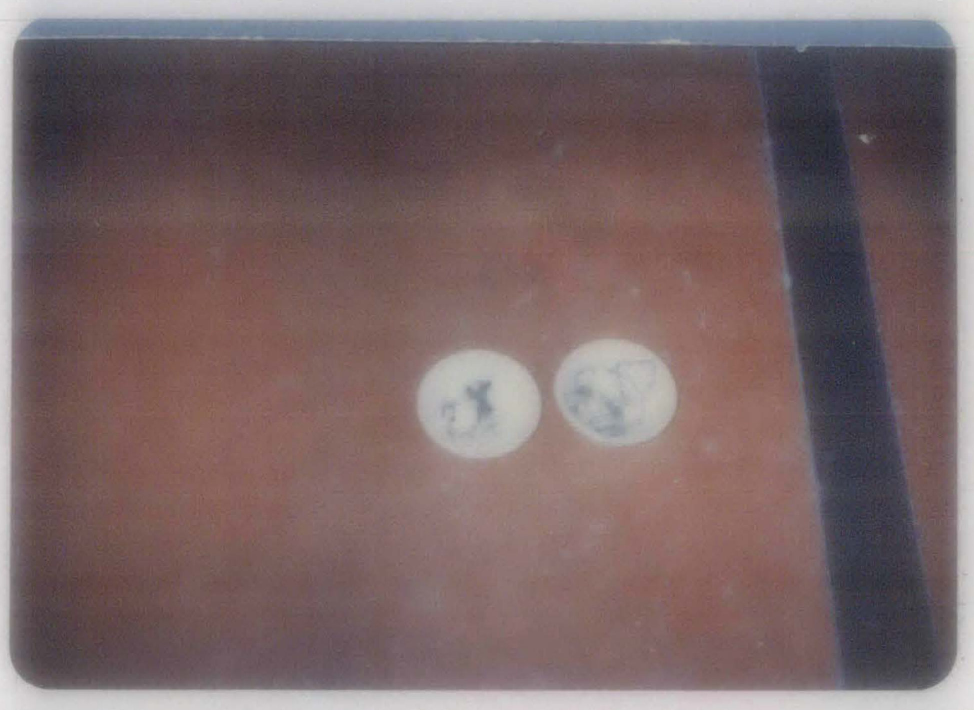


খ

চিত্র নং- ১২



চিত্র নং- ১৩



চিত্র নং- ১৪



চিত্র নং- ১৫



চিত্র নং- ১৬



চিত্র নং- ১৭



ক



খ

চিত্র নং- ১৮



চিত্র নং- ১৯



ক

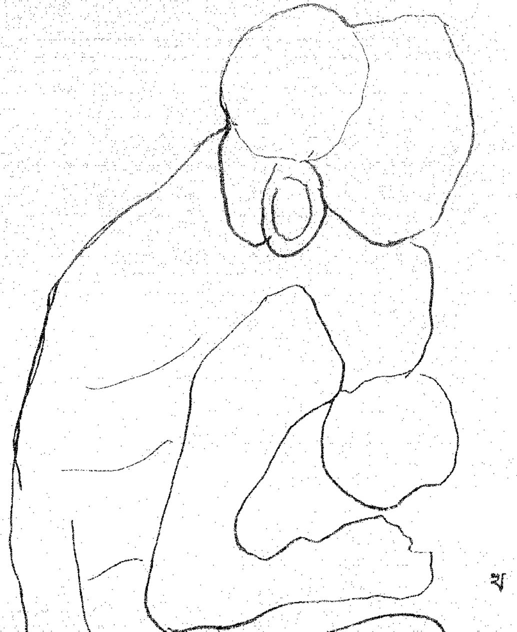


খ

চিত্র নং– ২০

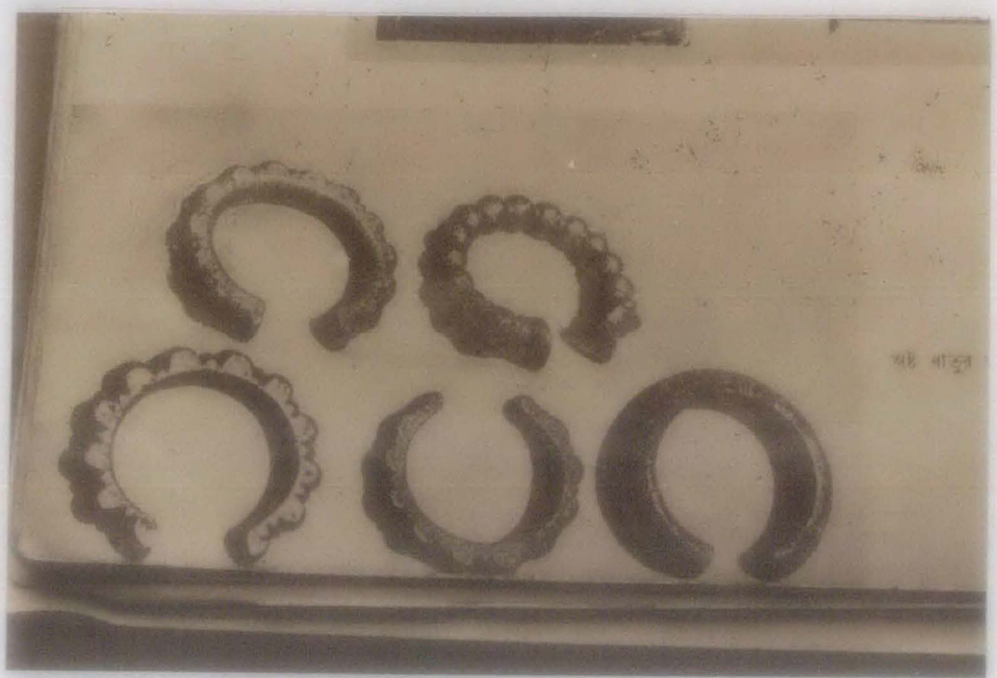


ক

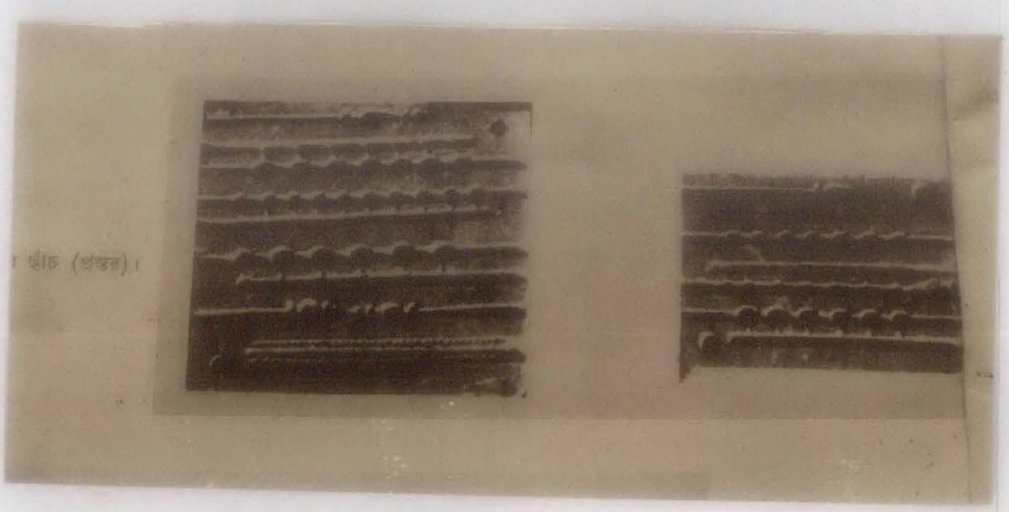


খ

চিত্র নং- ২১



ক



খ

চিত্র নং— ২২



চিত্র নং- ২৩



চিত্র নং- ২৪



চিত্র নং- ২৫



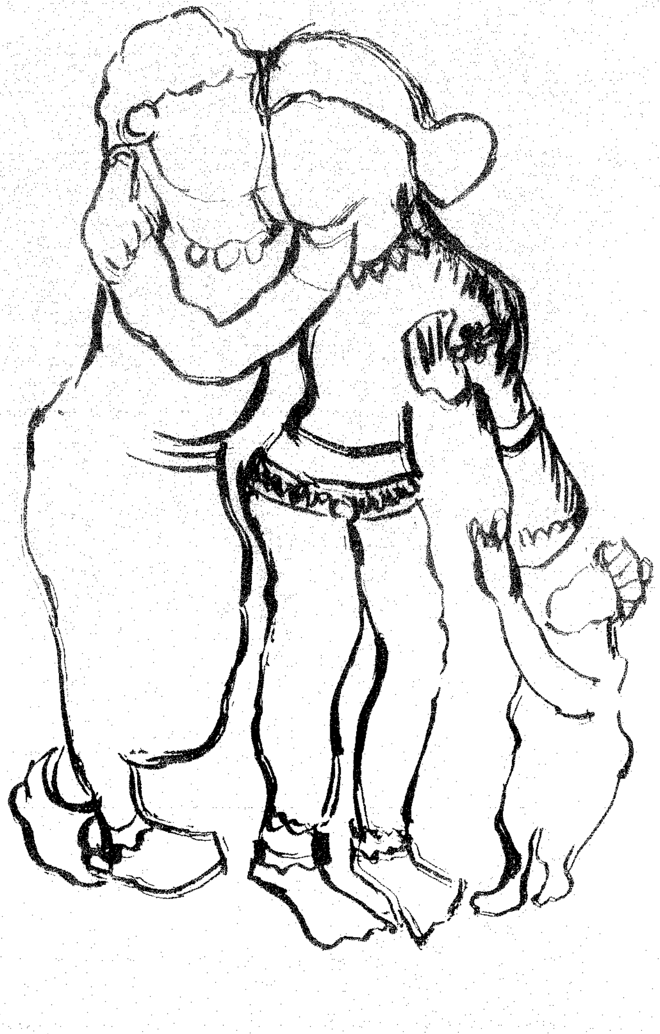
চিত্র নং- ২৬



চিত্র নং- ২৭



ক



খ

চিত্র নং- ২৮



চিত্র নং- ২৯



ক

খ



চিত্র নং- ৩০



চিত্র নং- ৩১

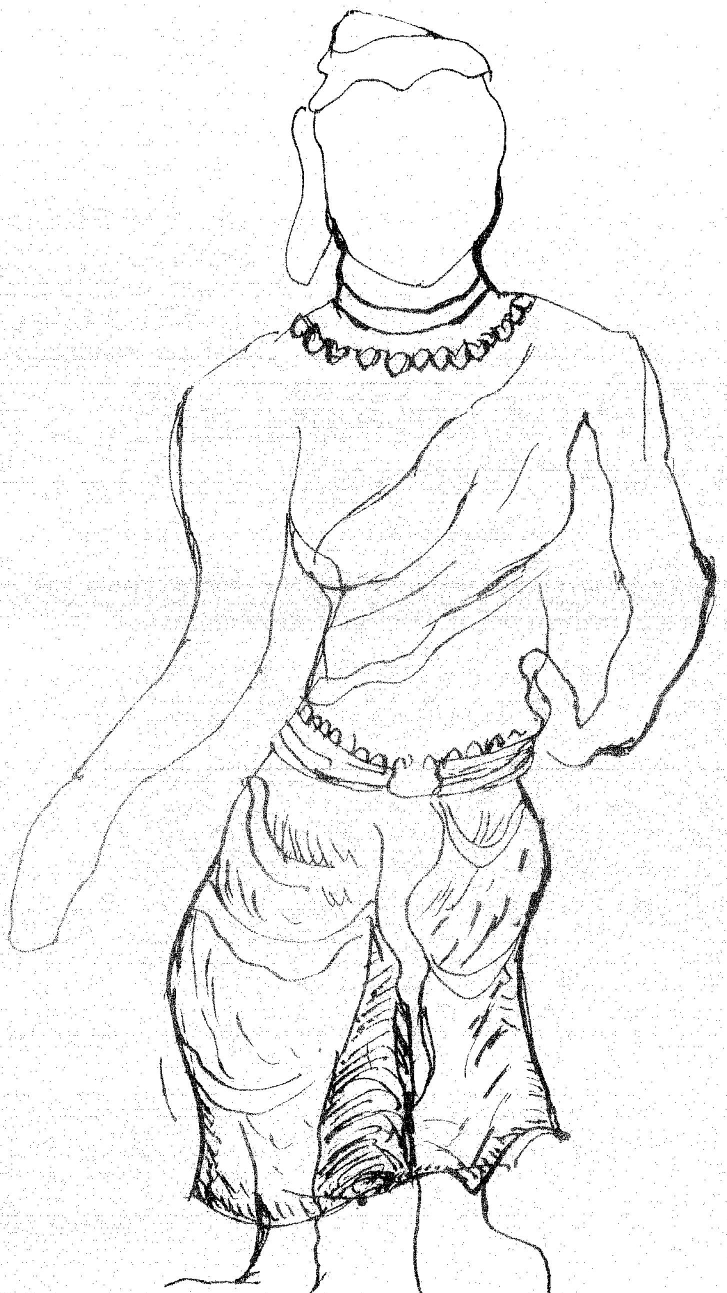


ক



খ

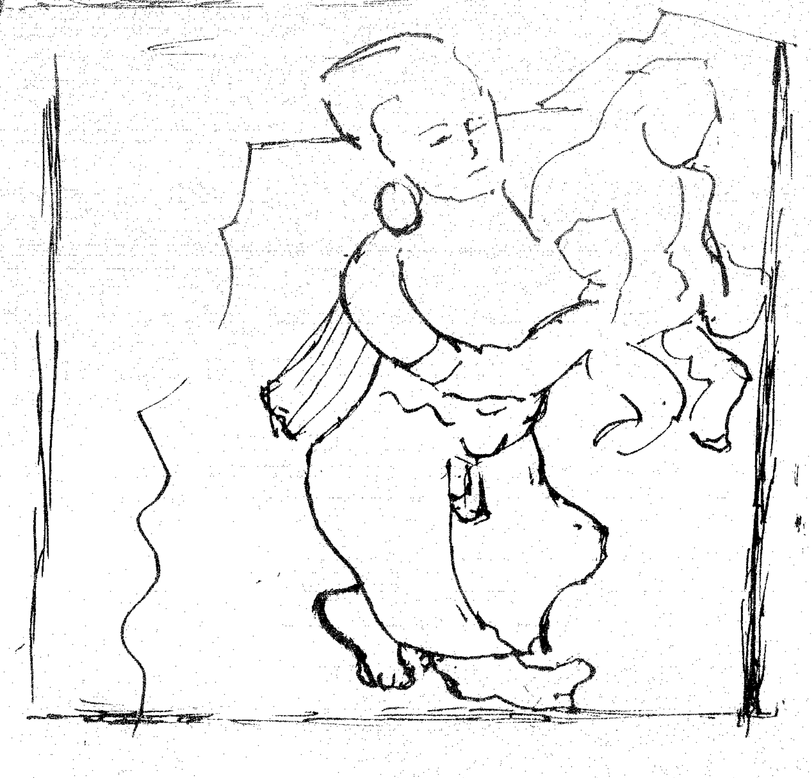
চিত্র নং- ৩২



চিত্র নং- ৩৩



ক

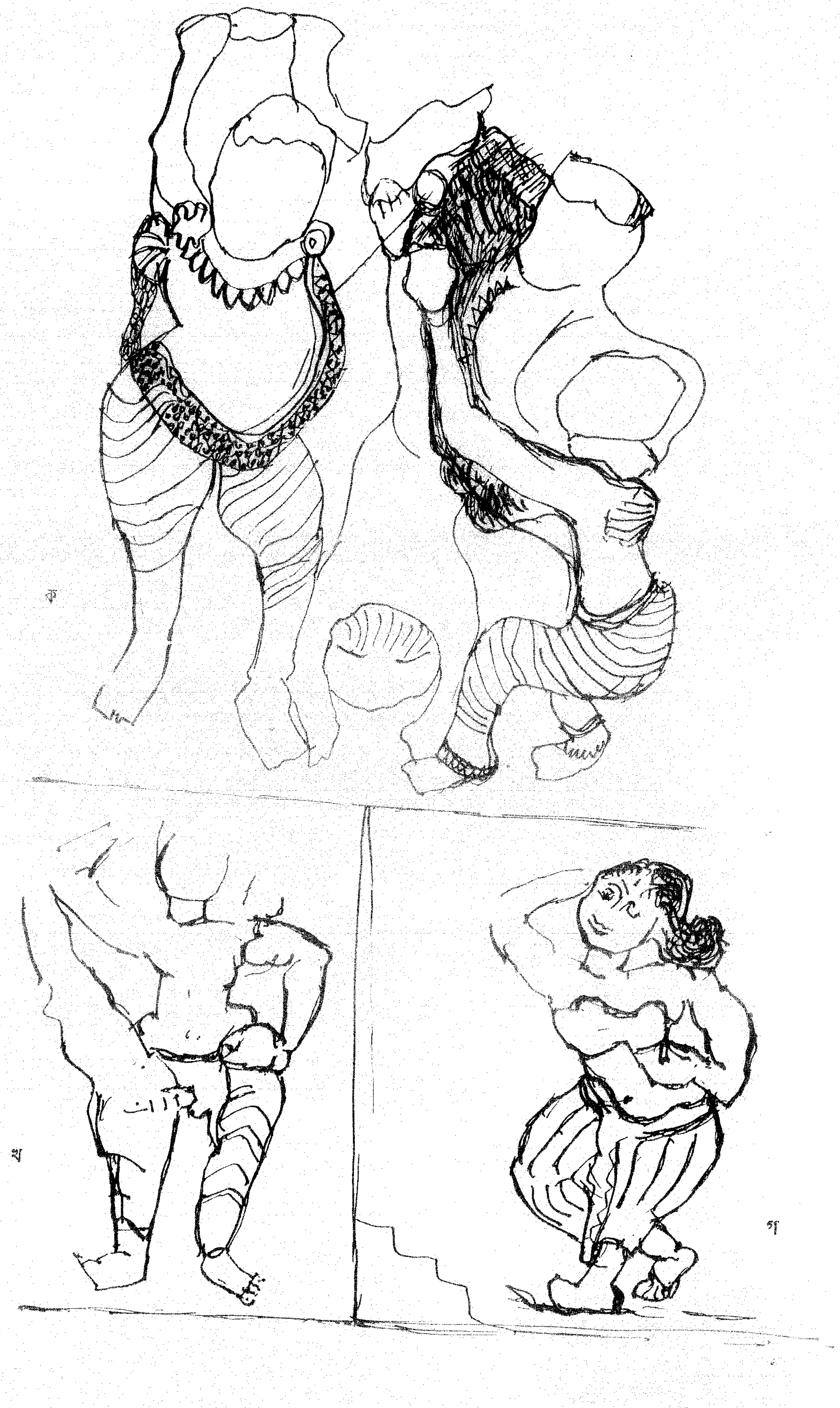


খ

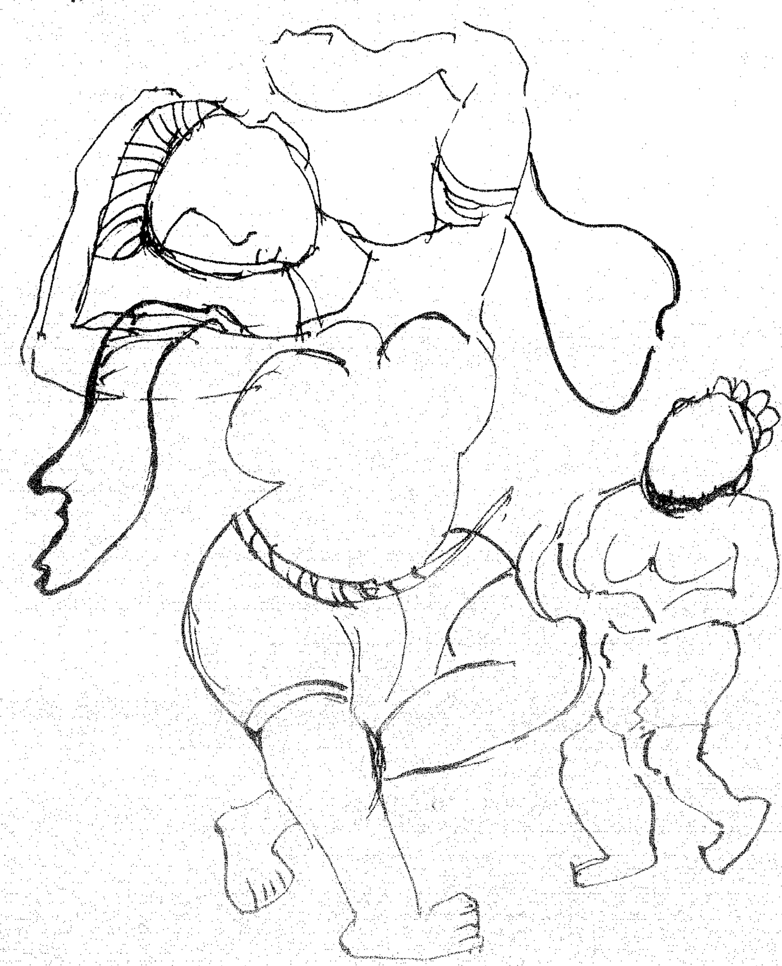
চিত্র নং- ৩৪



চিত্র নং- ৩৫



চিত্র নং— ৩৬



ক



খ

চিত্র নং- ৩৭



চিত্র নং- ৩৮



ক



খ

চিত্র নং- ৩৯



খ

চিত্র নং- ৪০



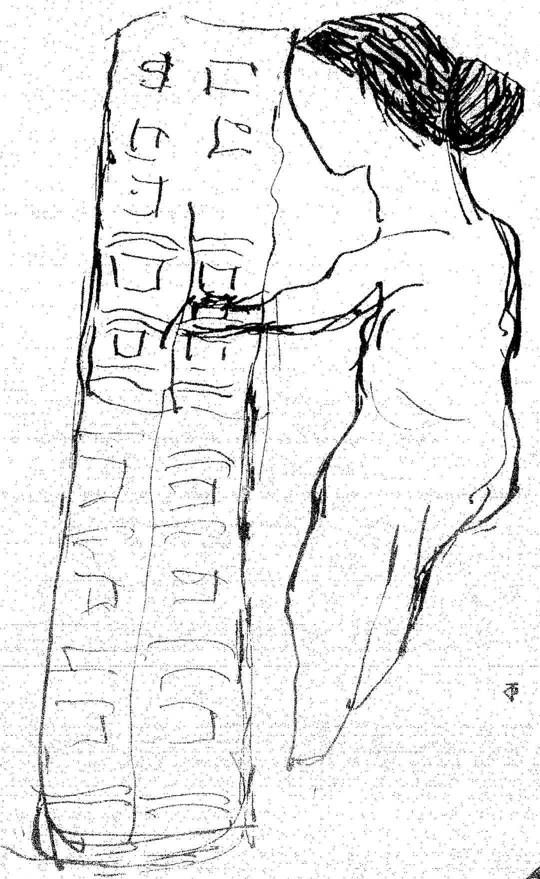
চিত্র নং-৪১



ক

খ

চিত্র নং– ৪২



ক

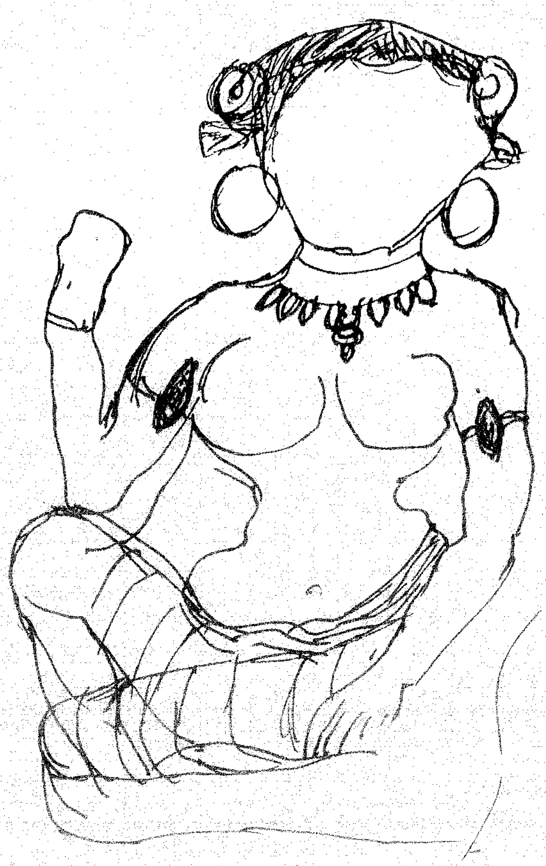


খ

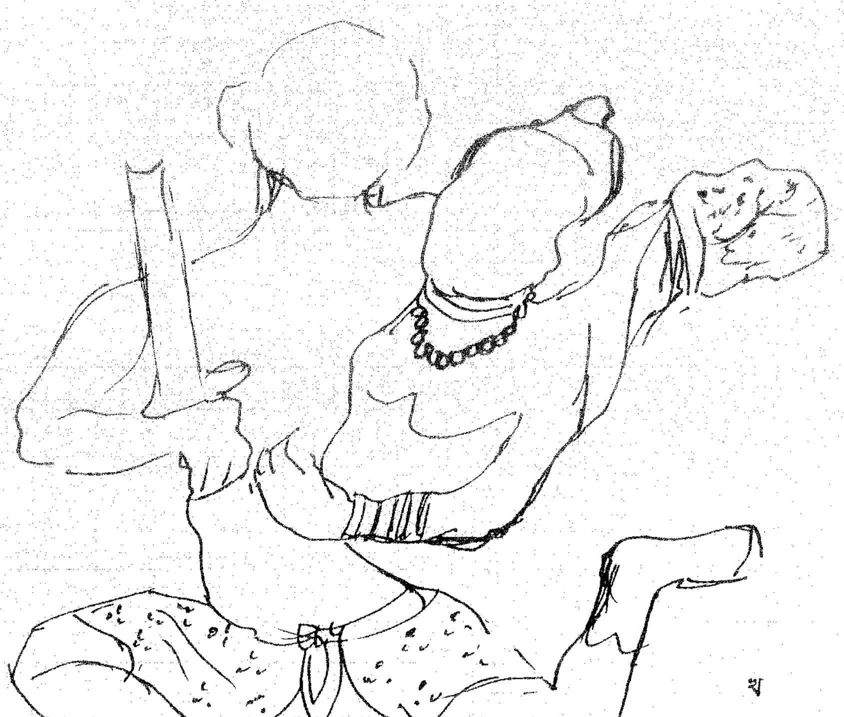
গ



চিত্র নং- ৪৩



ক



খ

চিত্র নং- ৪৪



ক



খ

চিত্র নং- ৪৫



ক



খ

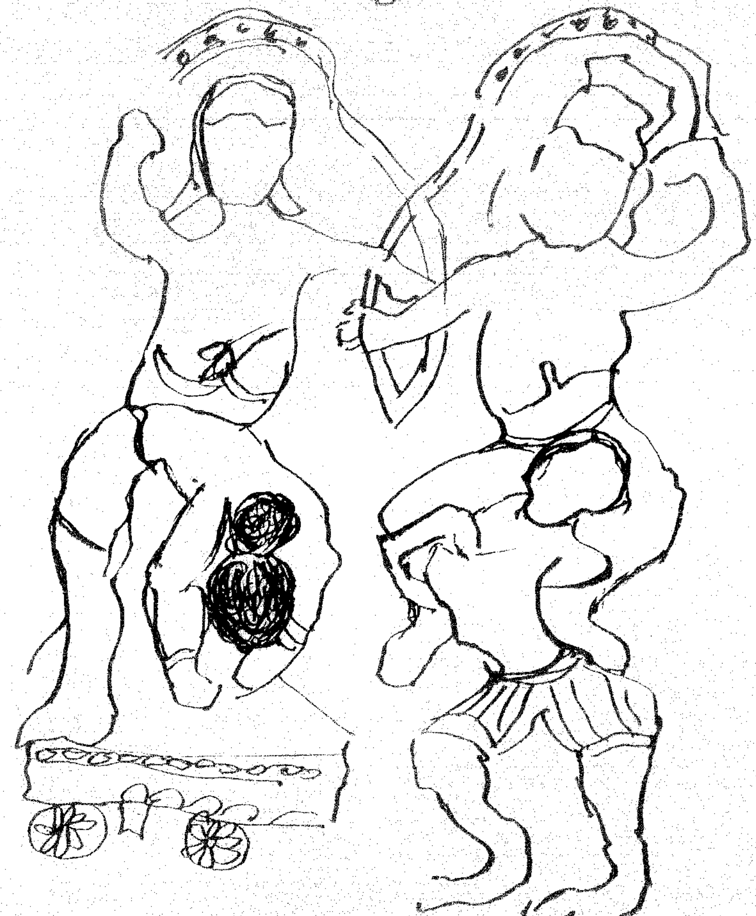


গ

চিত্র নং- ৪৬

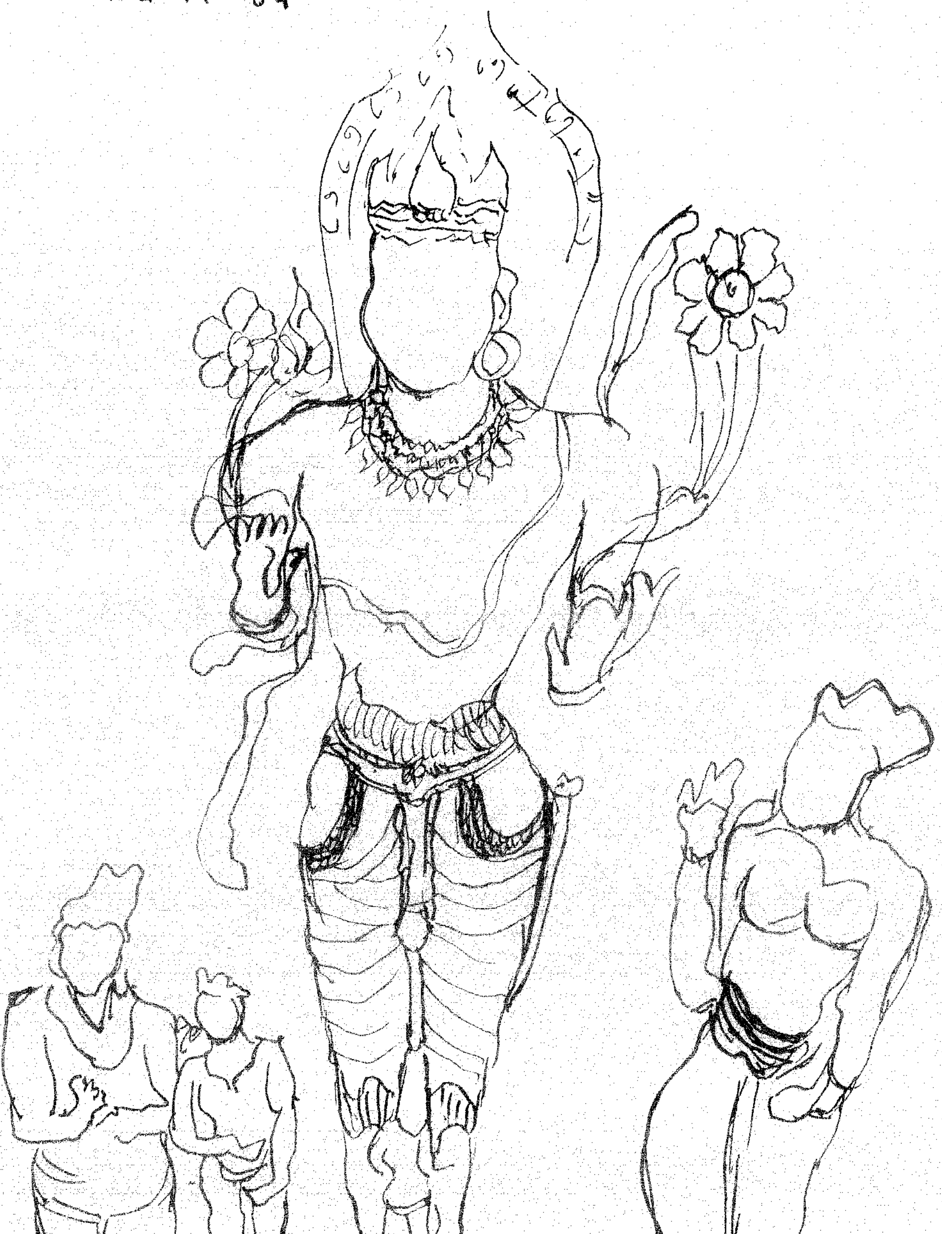


ক



খ

চিত্র নং- ৪৭

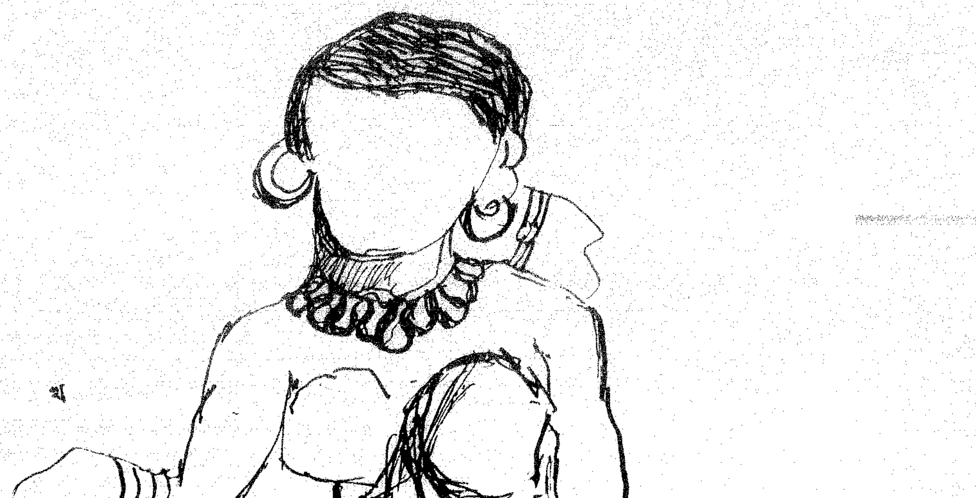


চিত্র নং- ৪৮



ক

খ



চিত্র নং- ৪৯



ক

গ



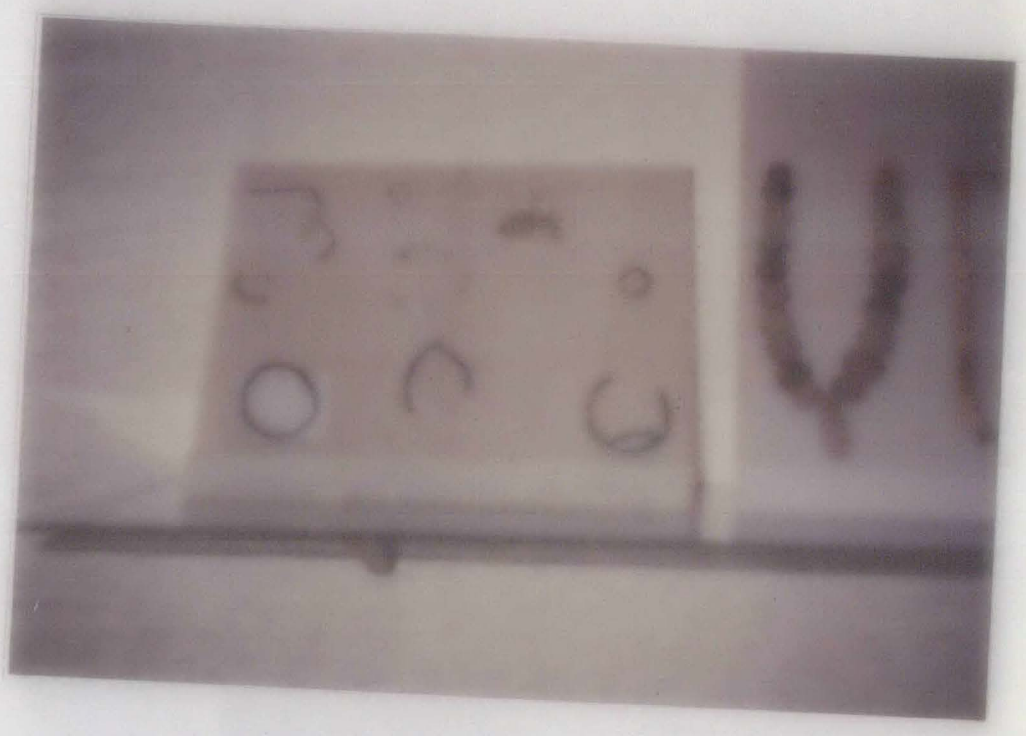


ঘ

চিত্র নং- ৫০



চিত্র নং- ৫৯



চিত্র নং- ৫২



চিত্র নং- ৫৩



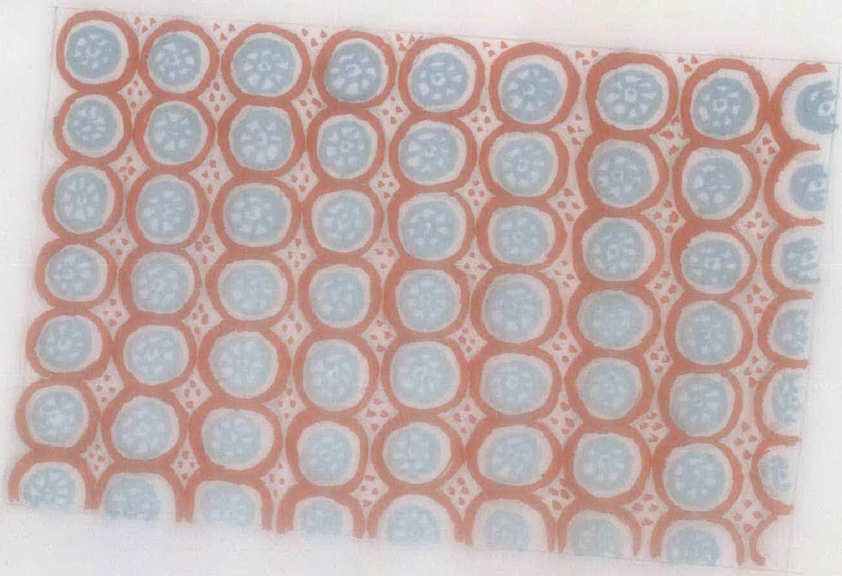
চিত্র নং- ৫৪



চিত্র নং- ৫৫



চিত্র সং- ৫৬





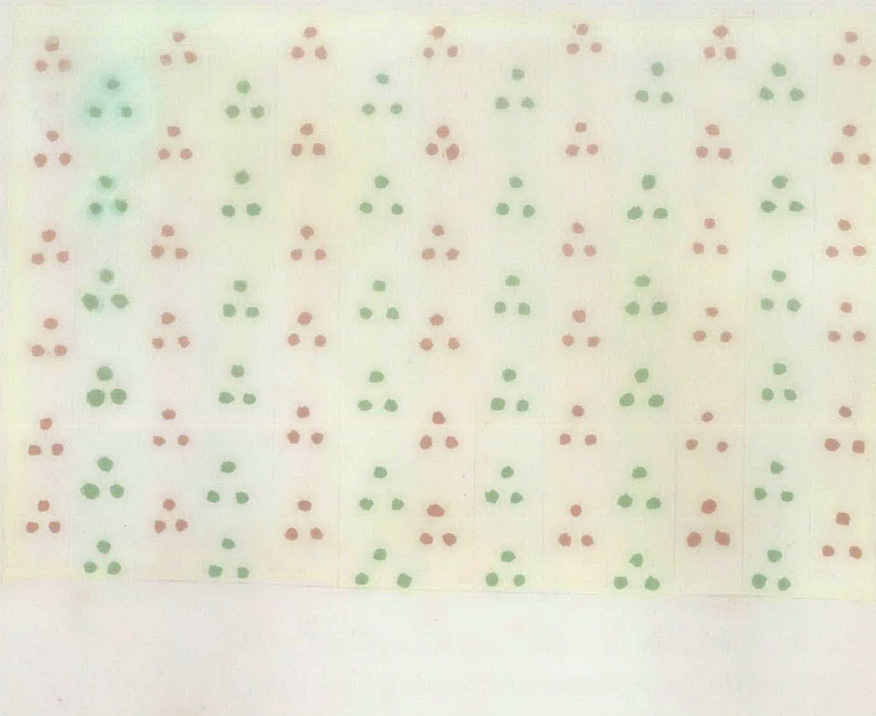


চিত্র নং- ৫৭



ক

খ

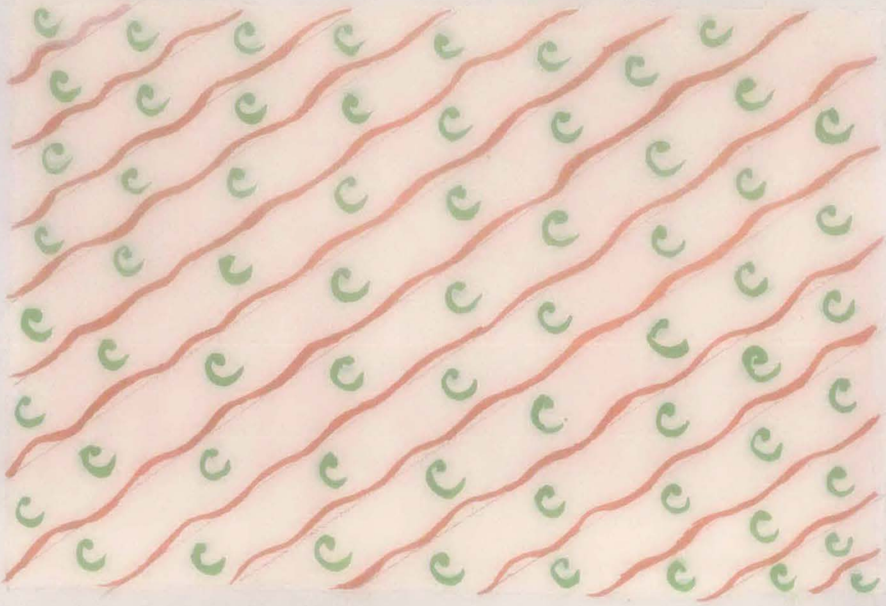


চিত্র নং- ৫৮

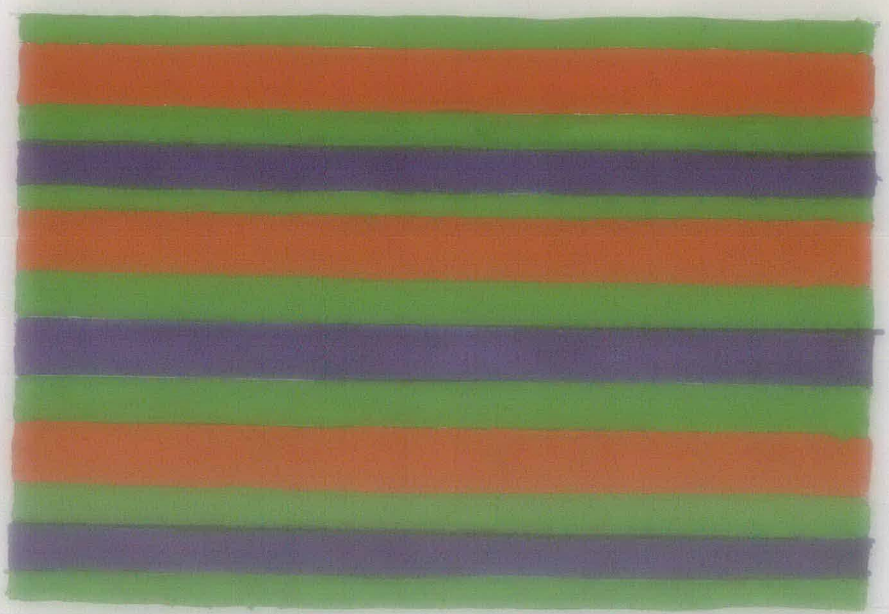


ক

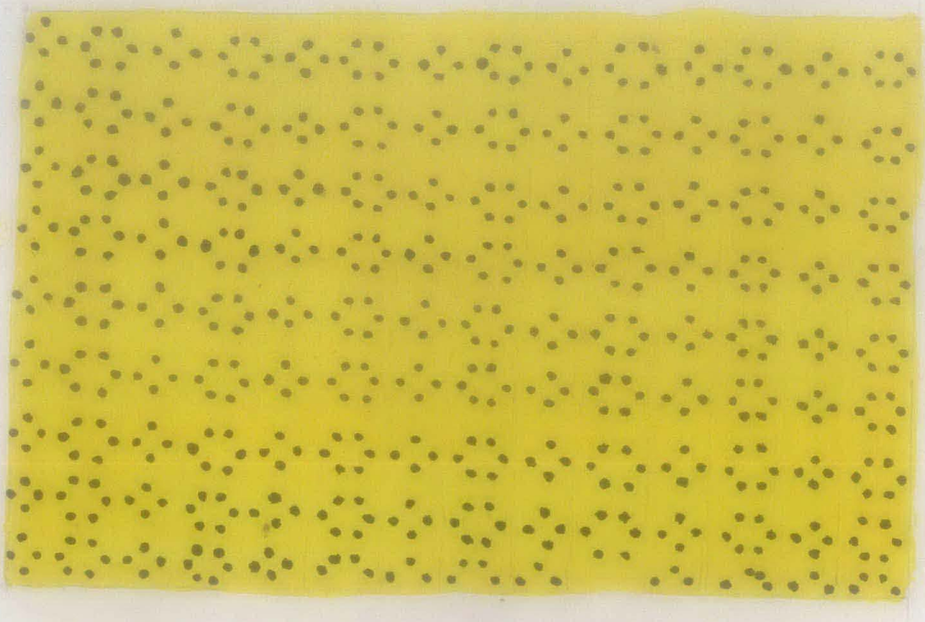
খ



চিত্র নং- ৫৯



ক

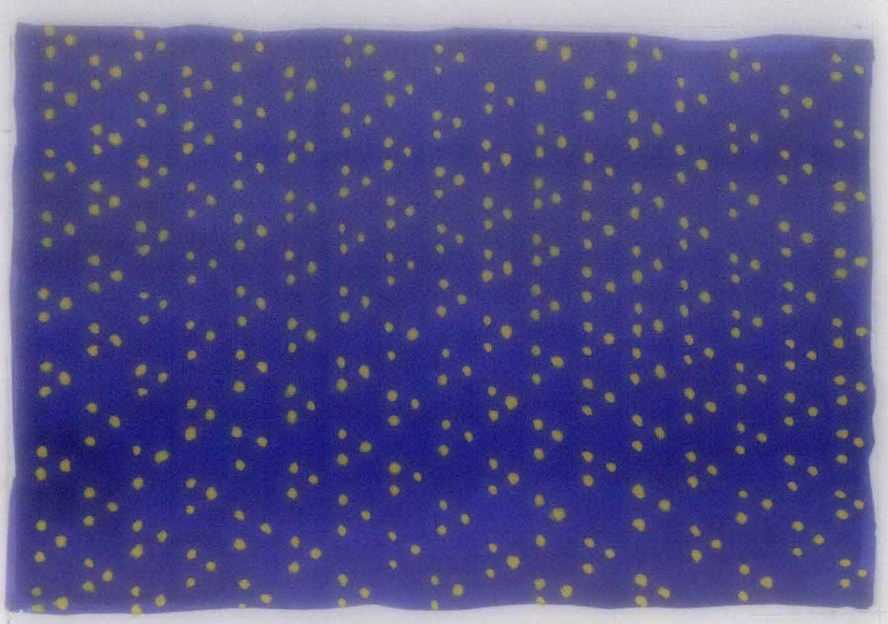


খ

চিত্র নং- ৬০



ক



খ

চিত্র নং- ৬১

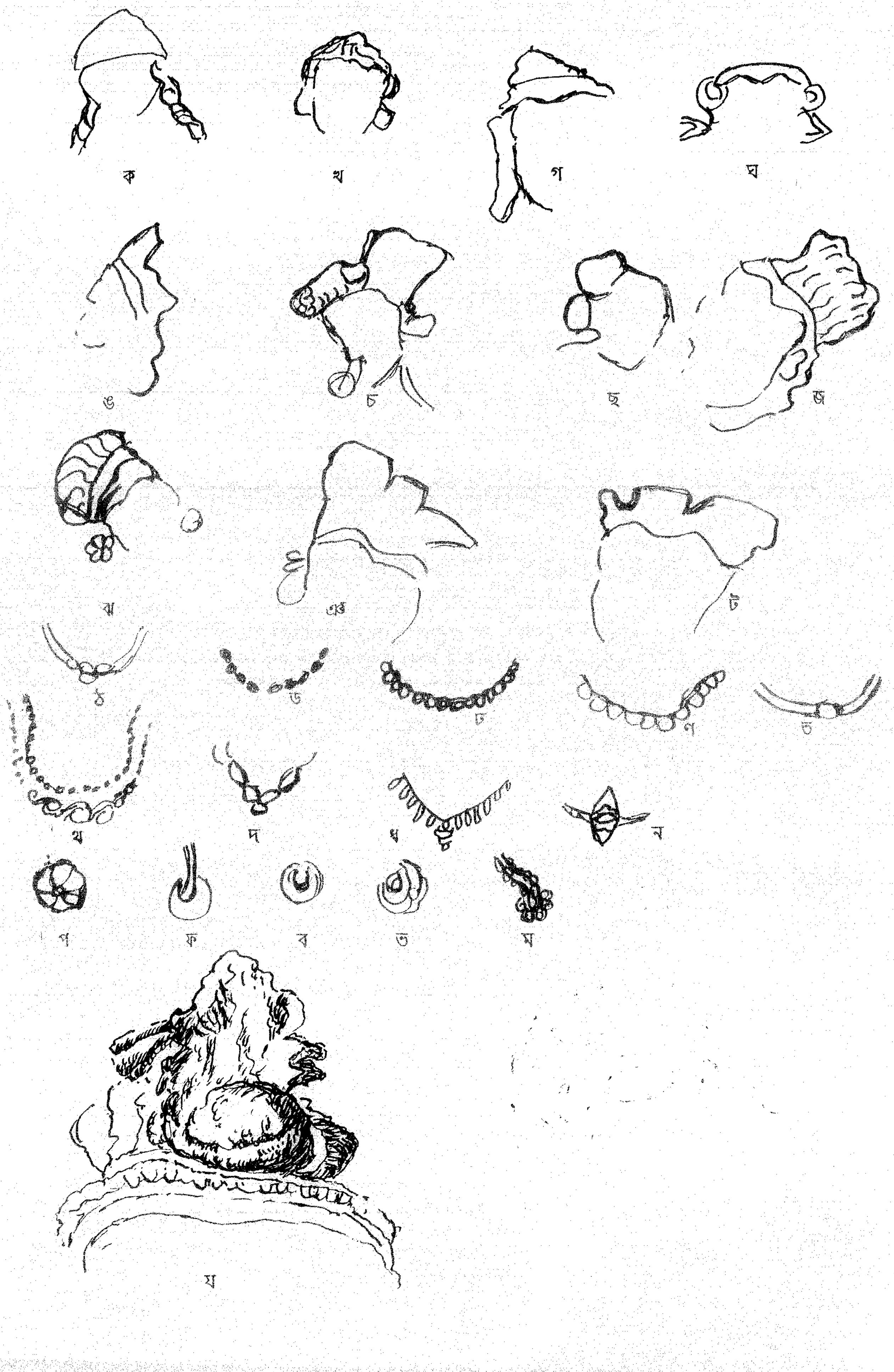
ক



খ



চিত্র নং- ৬২



চিত্র নং- ৬৩



ক



খ

চিত্র নং- ৬৪



ক

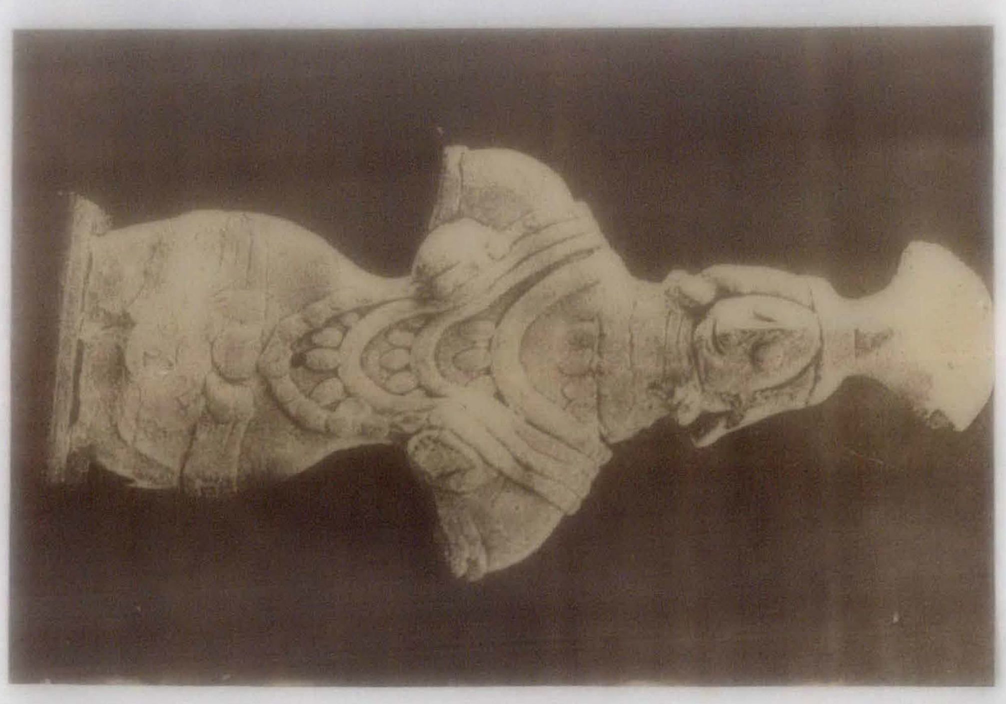


খ

চিত্র নং- ৬৫



ক



খ

চিত্র নং- ৬৬



ক



খ



ঘ



গ

চিত্র নং- ৬৭



ক



খ

চিত্র নং- ৬৮

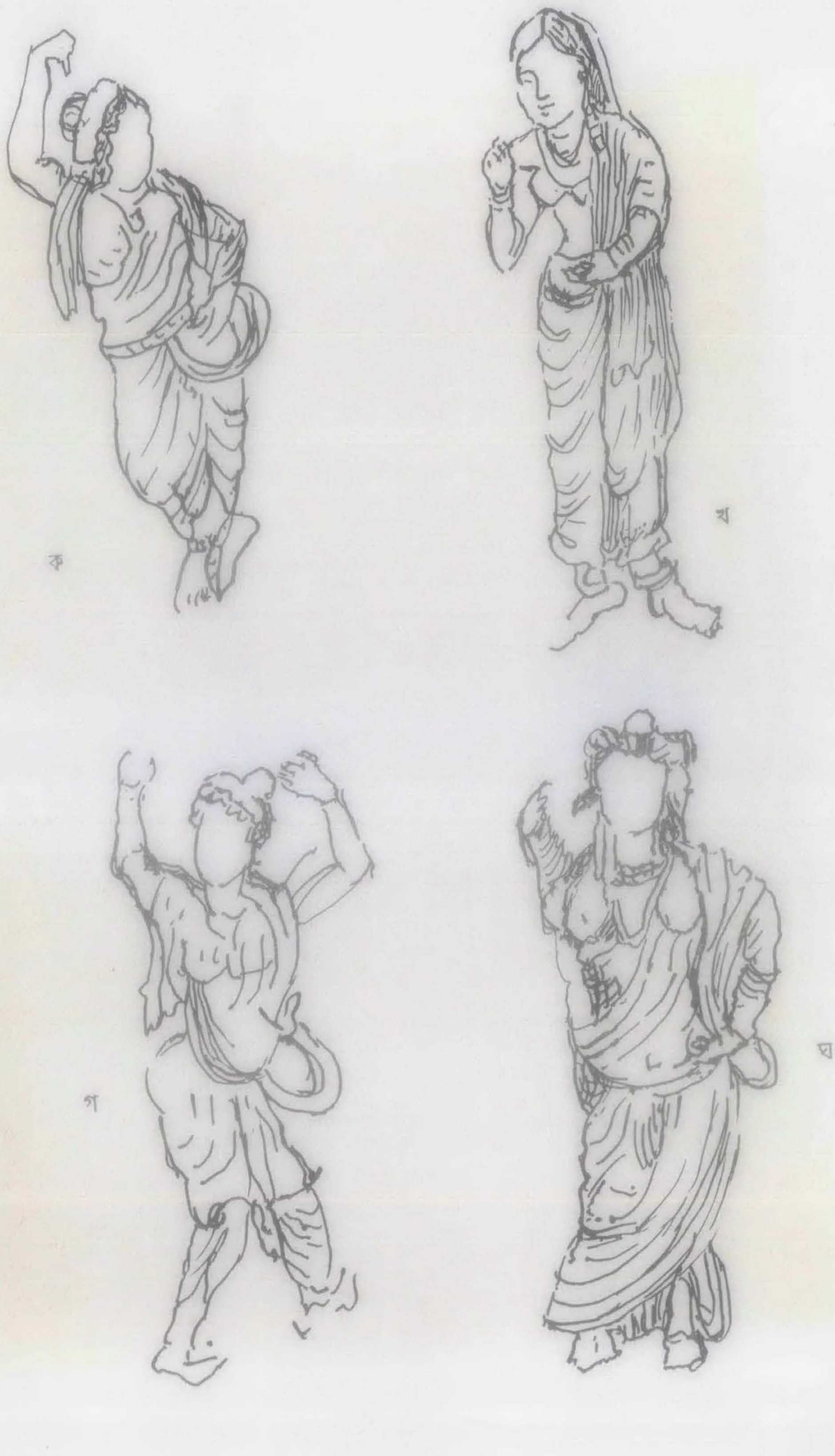


ক

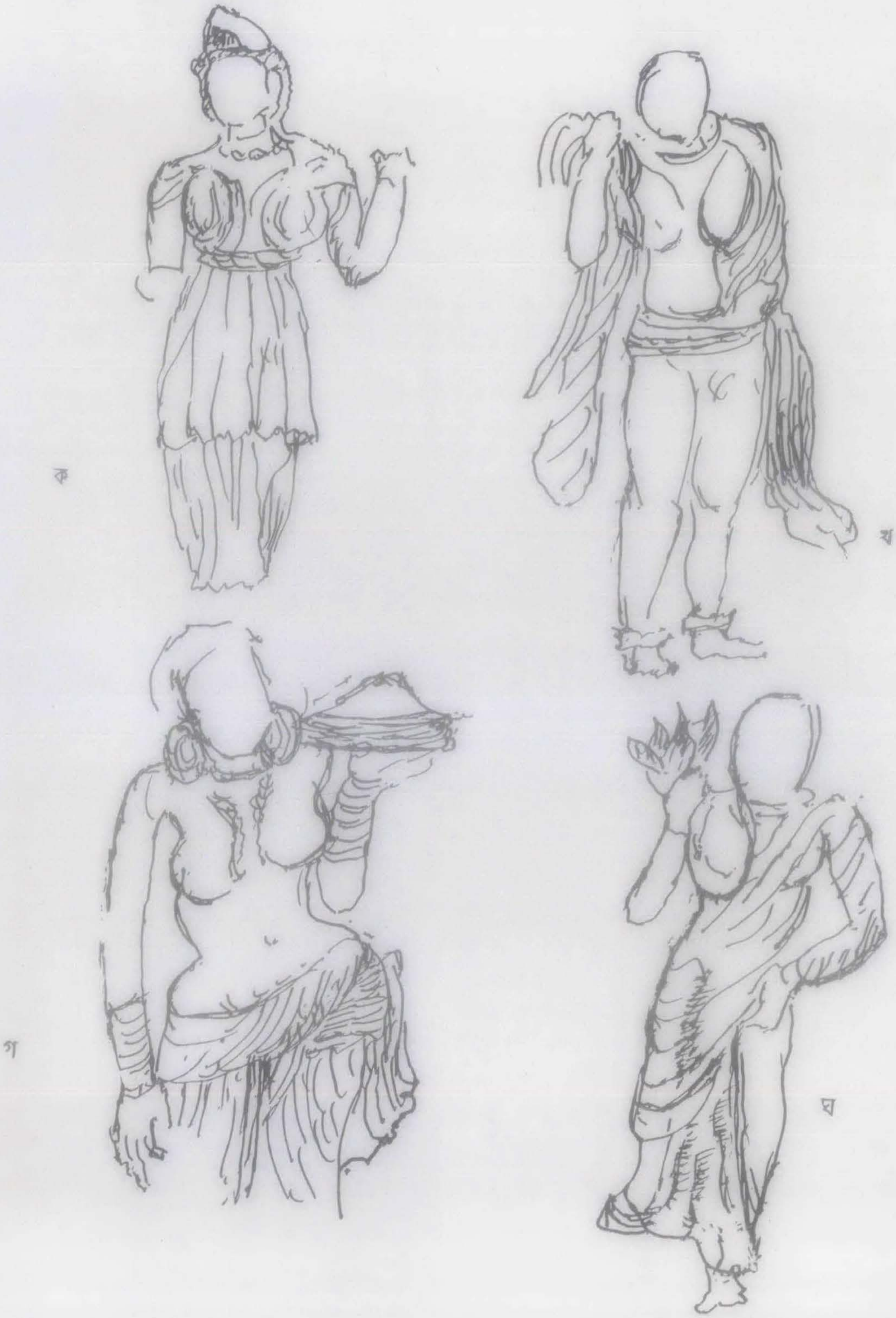


খ

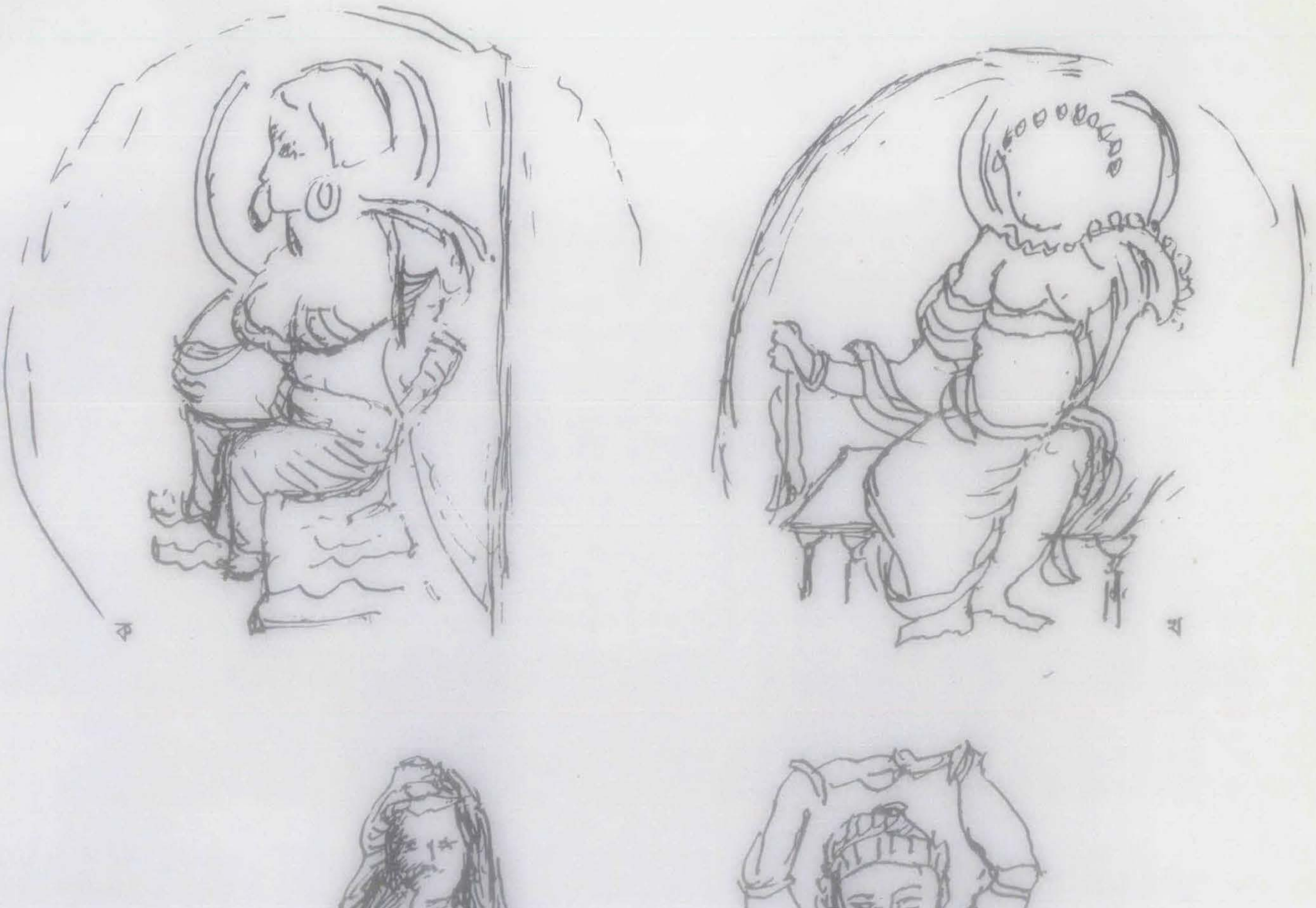
চিত্র নং- ৬৯



চিত্র নং- ৭০



চিত্র নং- ৭১



চিত্র নং- ৭২



ক খ গ ঘ

চিত্র নং- ৭৩



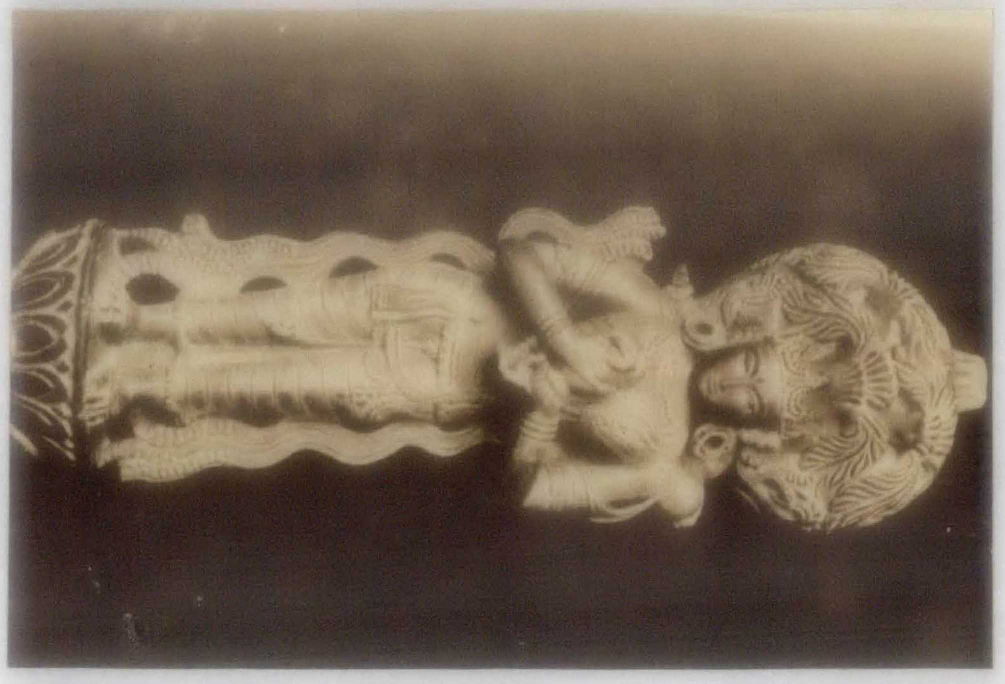
চিত্র নং- ৭৪



চিত্র নং- ৭৫



ক



খ

চিত্র নং- ৭৬



ক



খ

চিত্র নং- ৭৭



ক

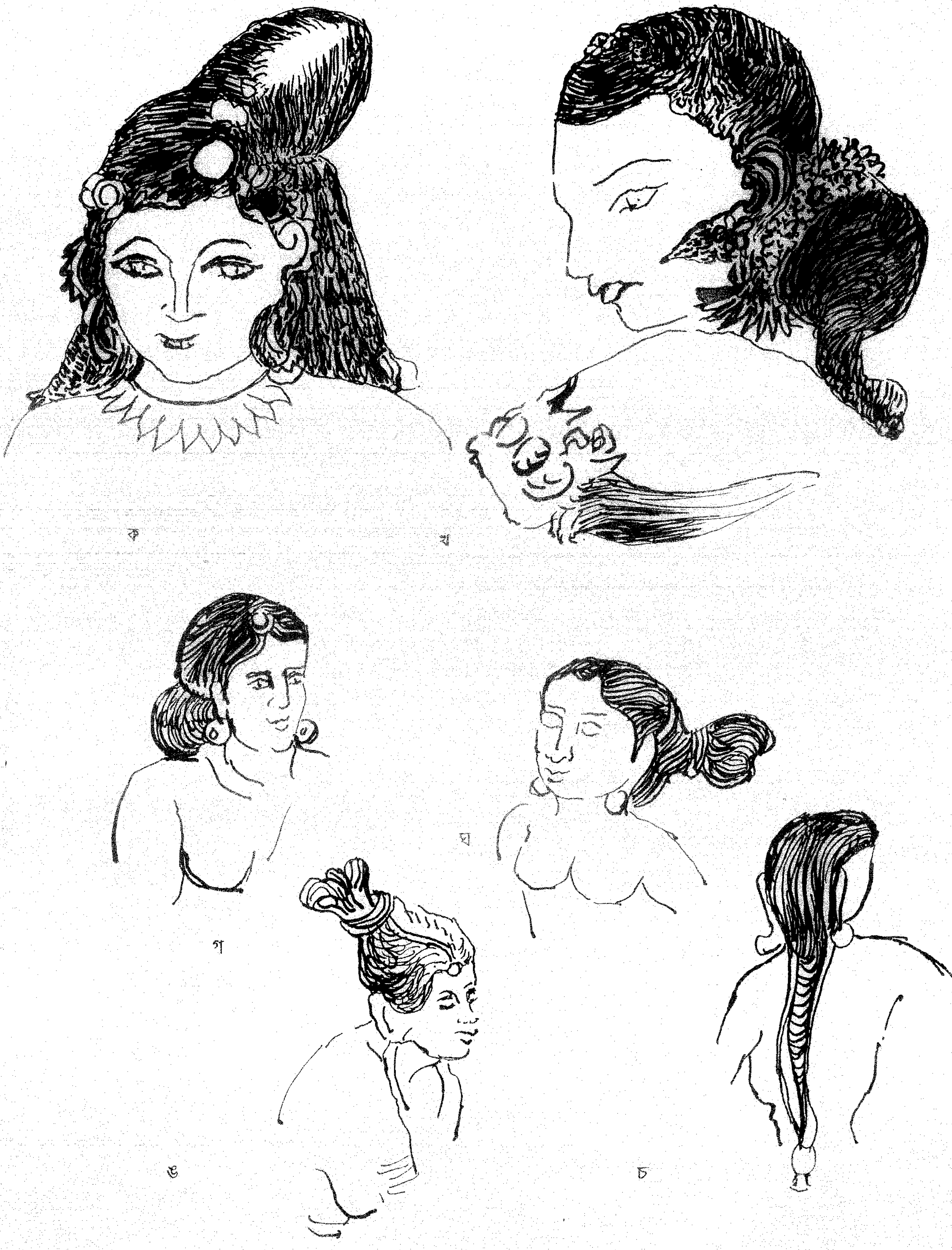


খ

চিত্র নং- ৭৮



চিত্র নং- ৭৯



চিত্র নং- ৮০



চিত্র নং- ৮১



ক

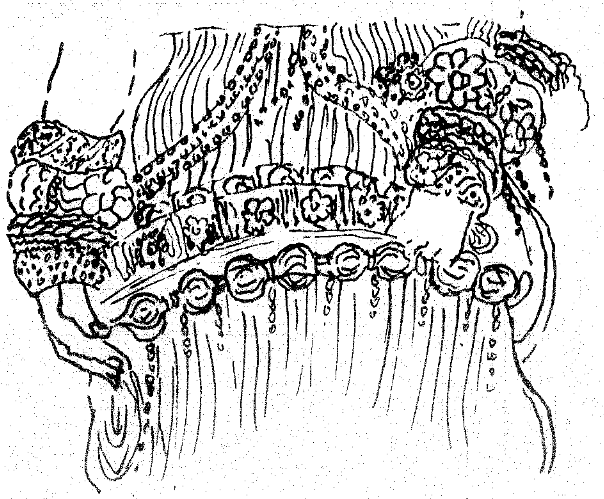


খ



গ

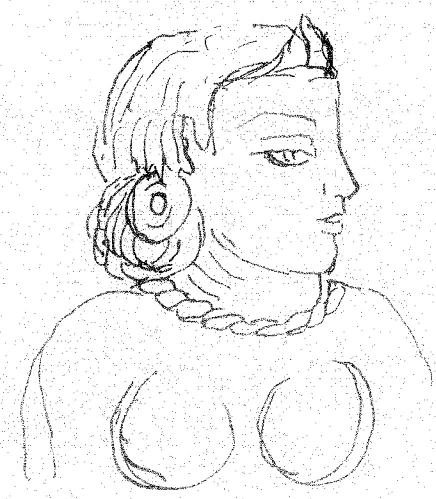
চিত্র নং- ৮২



ক



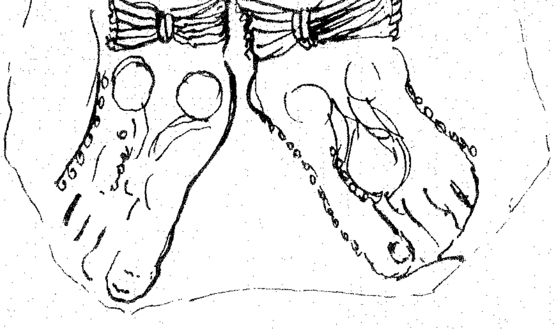
খ



গ



ঘ

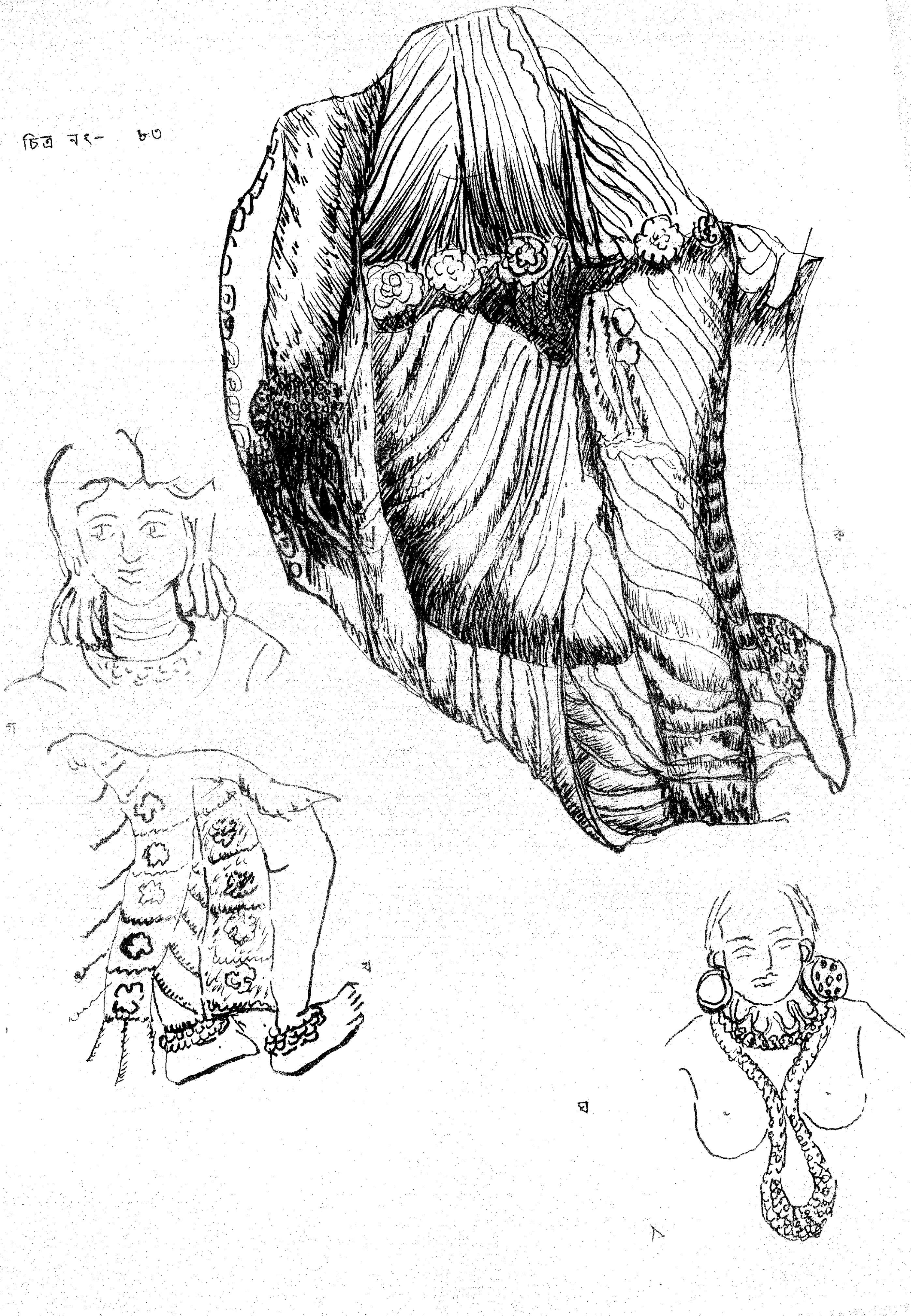


ঙ



চ

চিত্র নং- ৮৩



চিত্র নং- ৮৪

ক



খ



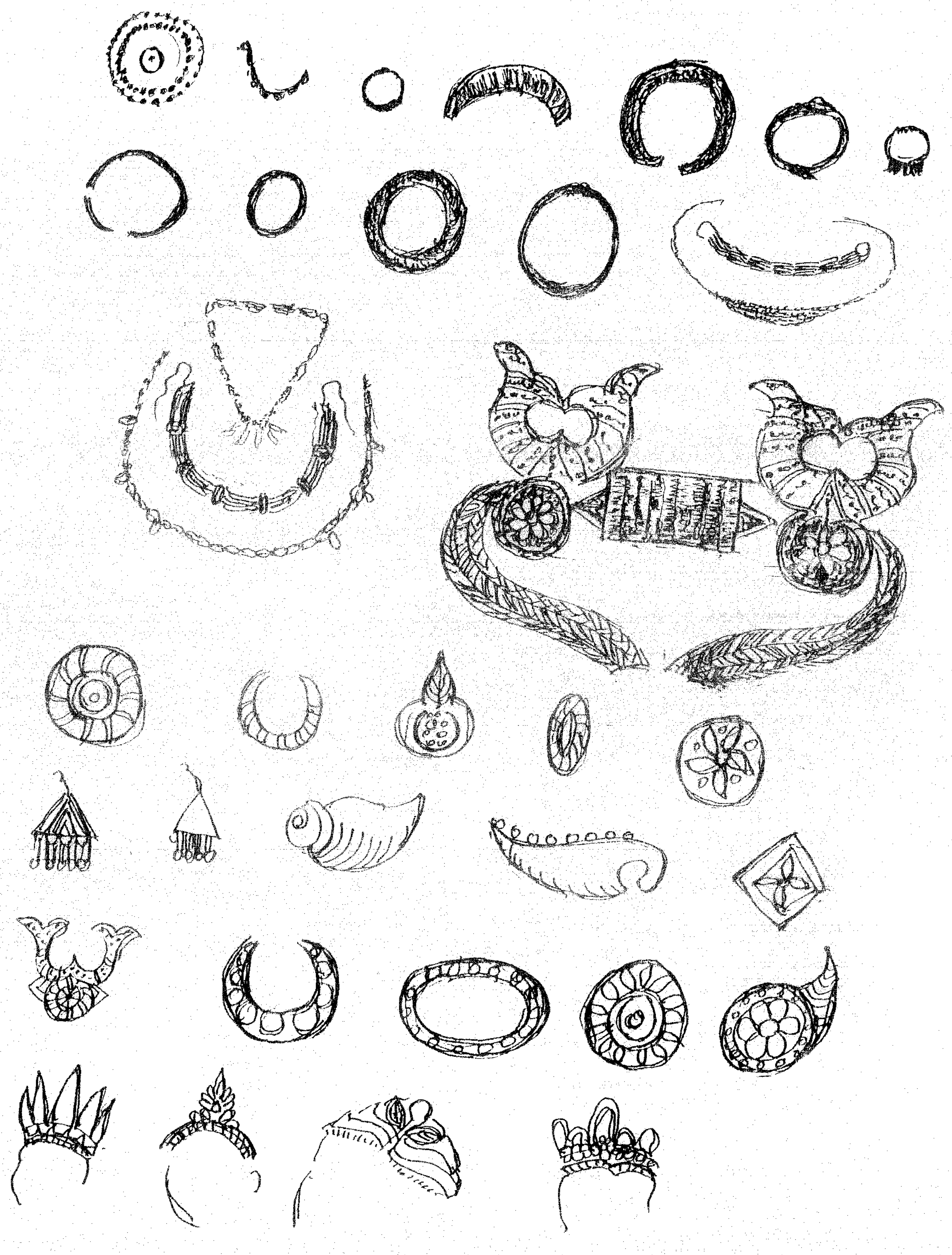
চিত্র নং- ৮৫



চিত্র নং- ৮৬



চিত্র নং- ৮৭



চিত্র নং- ৮৮

